কৃতান্তিকা

গ্রন্থ প্রয়োজন

যেখানে কৃতান্ত সত্যকে সম্যক ভাবে ব্যক্ত করেছে, সেখানে আর কনো গ্রন্থের আবশ্যকতা কি ছিল, তা নিয়ে দ্বন্ধ থাকতেই পারে। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক, সত্যের না তো ব্যাখ্যা সম্ভব আর না ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সত্য প্রত্যক্ষ করার বস্তু, সত্য বিলীন হবার বস্তু, সত্য মোক্ষলাভের বস্তু। সত্য অসীম, তাই কনো ব্যাখ্যাই সত্যের সম্যক ব্যাখ্যা হতেই পারেনা। আর সত্য বলতে সত্যের ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়।

বিচার করে দেখুন, যদি দক্ষ না থাকতো, তাহলে সতীর ভূমিকাও থাকতো না, আর সতীকে জানার অবস্থারও প্রজনন হতো না। একই ভাবে যদি তারকাসুর না থাকতো, যদি মহিষাসুর, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন, শুম্ভনিশুম্ভ না থাকতো, তাহলে আদ্যাশক্তি মাতা পার্বতীর ব্যাখ্যা করার পরিস্থিতিই জন্ম নিতো না। তেমনই অসত্যই সত্যের ব্যাখ্যাকে প্রয়োজনীয় করে তোলে আর যেই সত্যের ব্যাখ্যা সম্ভবই নয়, সেই সত্যেরও ব্যাখ্যাকে সম্ভব করে তোলে।

কৃতান্তকেও এবার একটু বিচার করুন। ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার কারণেই সর্বাম্বার উদয় ও কীর্তি। সত্যই তো তাই। ব্রহ্ম যে নিশ্চল, অবিবর্তনিয়, নির্বিকার। তাঁকে চলমান হতে না হলে, বিবর্তনিয় না হতে হলে, আর বিকারত্বের অধীনে না স্থিত হলে যে, তাঁর ব্যাখ্যা দেবার সুযোগও লাভ হয়না। তেমনই কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার কারণেই ব্রহ্মত্বের নিরবিকারত্বকে ত্যাগ করে ব্রহ্মময়ী সর্বাম্বা রূপে তাঁর আবির্ভাব। আর তাই কৃতান্ত ব্যক্ত করাও হলো সম্ভব।

কিন্তু কৃতান্তে অসত্যকেও অতিস্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে, এবং সেই অসত্যের নাশকেও অতি স্পষ্ট ভাবে, বিনা কনো রাখঢাক করে দেখানো হয়েছে। তাই সাধকদের অন্তিম গন্তব্য কৃতান্ত থেকে অতিস্পষ্ট হলেও, সেই গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানর পথ তাঁদের জন্য সুগম নয়। অর্থাৎ মূল অসত্যের বা সমস্ত অসত্যের বিকাশ যার থেকে, তাঁর বিনাশের পূর্বে, অসত্যের যে বিস্তার করা জগত, তার বিনাশ সম্ভব হবে, তবেই না সেই গন্তব্য পৌছাতে পারবে সাধক।

স্পষ্ট ভাবে বলতে, শোণিতপুরের বিনাশ হবে, তবেই না স্কন্ধ তারকাসুরের কাছে পৌঁছাবে! কৃতান্ত সেই তারকাসুরকে দমন করার রহস্য বলে দিয়েছে, কিন্তু শোণিতপুরের নাশ করার

রহস্যকে বলেনি। আর তা বলার জন্যই লিপিবদ্ধ হলো কৃতান্তিকা। কেন এমন দুই খণ্ডে রাখা হলো?

প্রায়শই, সম্যক কথাকে কাহানীর আকার বলতে গেলে, সাধকরা কাহিনীর মধ্যেই আসক্ত হয়ে পরেন, আর সেই আসক্তির ফলে, অন্তিম গন্তব্যকে ভেদ করার উপায়কেই সঠিক ভাবে ধারণ করতেই পারেন না। সেই কারণে, মূল গন্তব্যকে ভেদ করার সারকথাকে কৃতান্ত রূপে স্থাপিত করে দিয়ে, সেই গন্তব্য পর্যন্ত পৌছাতে না পারার কারণ আর সেই গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানোর মার্গকে স্পষ্ট করে বলা হলো কৃতান্তিকাতে।

এই দুই গ্রন্থের একত্রিত কর্মসূচি, পাঠন, বিচার ও ধারণ এক সাধককে সাধকরূপে পরিবর্তিত হয়ে ওঠার পূর্ব অবস্থা থেকে উন্নত করে, সম্যক মোক্ষপর্যন্ত লাভ করাবার জন্য অঙ্গীকারবধ্য।

গ্রন্থসূচিকা

গুপ্ত ইতিহাস

জগতপালনে জগন্মাতার কাণ্ড

ইতিহাস অভিযান

ব্রহ্মসনাতন পুত্রী দিব্যশ্রী একদিন তাঁর পিতার সম্মুখে এসে বললেন, “মা, আমি আপনাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম যে শক্তিপীঠ এবং তন্ত্রের সম্পর্ক এত গভীর কেন? আপনি উত্তরে বলেছিলেন, এর এক বিস্তর ইতিহাস আছে, যার সম্বন্ধে বর্তমান সভ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞ। আমি আপনাকে আপনার কথার উত্তরে প্রশ্ন করেছিলাম যে, কেন, অজ্ঞ কেন? ইতিহাস তো যা বলার বলেইছে, কিন্তু তাতেও এই যোগাযোগ ঠিক করে ব্যক্ত নয় কেন। আপনি কেবলই হেসেছিলেন কথার উত্তরে।

মা, আমি তারপর ইতিহাসের বহুগ্রন্থ পাঠ করেছি। আর দেখেছি যে, ইতিহাস অদ্ভুত ভাবে সত্য কথা বলে, আর সেই ব্যাপারে কনো দ্বন্ধ নেই। তবে যেমন প্রতিটি সত্য কথকের মুখ বন্ধ করার প্রয়াস হয়, শাম দাম দণ্ড ভেদের দ্বারা, তেমন ইতিহাসেরও মুখ বন্ধ করার সমস্ত প্রয়াস সর্বদাই চলতে থাকে, যেই প্রয়াস মূলত করে থাকে শাসকরা। এঁরা ইতিহাসের মুখ বন্ধ করতে গেলে যখন দেখে, সালের হেরফের হয়ে যাচ্ছে, তখন নতুন নতুন কাহানীর রচনা করে, ইতিহাসকে বিকৃত করার কনো প্রয়াসে চ্যুত হয়না।

এই প্রক্রিয়া বর্তমানেও যেমন চলছে, তেমন পূর্বেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে, এমনই অনুমানে আমি উপস্থিত হয়েছি। বর্তমানে যেমন বিশ্বযুদ্ধের কথা ইতিহাস বিবৃত করা হয়, অথচ

সমুদ্রগর্ভে স্থিত বিশ্বজ্বালানী তেলের উপর অধিকার স্থাপনের কারণেই সেই যুদ্ধ হয়েছিল, তাকে লুকিয়ে ফেলে শাসকরা; যেমন বর্তমানে মার্ক্সের দর্শনকে প্রকাশ করতে দেয় ইতিহাসকে, লিঙ্কনের দর্শনকে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় ইতিহাসকে, কিন্তু রাশিয়া ও আমেরিকা এই আরবের তেল কম অর্থ ব্যয় করে নিজের দেশে নিয়ে যেতে যেই ধনবণ্টনে সমস্যা হওয়ার জন্য এই দর্শন সম্মুখে আসে, তাকে মুছে ফেলা হয়; তেমনই কি হয়েছিল আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেও? মা, যা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, তার খবর যদি কেউ দিতে পারেন, তা একমাত্র আপনি। তাই কৃপা করে বলুন, ইতিহাসের গর্ভে তন্ত্র ও শক্তিপীঠকে কেন্দ্র করে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে?

মা, সেই ইতিহাসে কারচুপি সম্পূর্ণ ইতিহাসকেই পালটে রেখে দিয়ে, আমাদেরকে শিক্ষিত মূর্খ করে তুলতে ব্যস্ত! মা, শাসকরা যদি এই শক্তিপীঠ এবং তন্ত্রের যোগাযোগ সংক্রান্ত ইতিহাসের সেই পাতাগুলিকে জ্বালিয়ে দিয়ে বিকৃত করে থাকে, তাহলে সেই কথা আপনি ছাড়া আর কেউই বলতে সক্ষম নন। কৃপা করে আমাকে সেই কথা বলুন মা”।

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, “বেশ পুত্রী, আমি তোমাকে সেই বিশেষ কথা বলছি এবার সম্পূর্ণ বিস্তারে। হ্যাঁ, এই কথাকে ইতিহাসের পাতায় পাবেনা, আর তা না পাবার কারণ তুমি যেমন অনুমান করেছ যে শাসকরা ইতিহাসকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করে, সেটিই। এই কথা তোমাকে তন্ত্রের এবং শক্তিপীঠের আদ্যোপান্ত ব্যখ্যা করবে।

আর হ্যাঁ, তুমি যেমন বললে, যখন সময়ের সাথে মেলেনা বিকৃত ইতিহাস তখন বিকৃত কাহানী উপস্থাপন করে সেই ইতিহাসকে আজিবতকাল ঢেকে দেবার প্রয়াস করে, এই ক্ষেত্রেও সেই প্রয়াসের কারণেই আমাদের সম্মুখে সতীর দেহত্যাগের কথা পরিবেশন করা হয়েছে, যা তন্ত্রনির্মাতার তন্ত্রসারের কাহিনী, ইতিহাস নয়। বাস্তবে শক্তিপীঠের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং শাসকবিরোধীও। এবার শোনো তাহলে সেই ইতিহাস পূর্ণবিস্তারে”।

মগধীয় ইতিহাস

ব্রহ্মসনাতন বলতে থাকলেন, "সাল এই ১১০০ খৃষ্টপূর্ব হবে। মূর্তি পূজাকে সামনে রেখে পারশ্য উপকুলে পশ্চিম গান্ধার অঞ্চলের ধূর্ত শোষণকারী শ্রেণীকে বিতাড়িত করা হয়েছে, প্রায় ৩ হাজার সাল হয়ে গেছে। মিশরে গিয়ে তাঁরা সম্রাট হয়ে শোষণক্রিয়া অব্যহত রেখেছেন যেমন, তেমন রোমান হয়েও সেই একই প্রকার অর্ধমানব ও অর্ধপশুর মূর্তি স্থাপন করে, রাজকীয় ভঙ্গিমায় শোষণ করে গেছে তাঁরা, অতি সহজ ভাবেই।

কিন্তু সেই বিতাড়িত শ্রেণীর এক তৃতীয়াংশ জম্বুদ্বীপ, যা তৎকালীন ভারতবর্ষের নাম ছিল, সেখানে এসে স্বমহিমায় শোষণক্রিয়া চালাতে পারেননি। তিব্বতীয় চীন প্রায় ১০ হাজার বৎসর ব্যাপী ২৬টি বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটায়। সেখানেও যেমন উচ্চকটি দর্শনশাস্ত্র অর্থাৎ বৌদ্ধ ধারার বিকাশ ঘটেছে, তেমনই তা জম্বুদ্বীপেরও পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ আজ যাকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অসম বলা হয়, সেই চত্বরে বেশ প্রসার লাভ করেছিল।

এই তালিকায় বাংলার নাম না আসাই উচিত ছিল, কারণ বাংলাদেশ তখনও ঘন অরণ্যে আবৃত, প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত, এবং হিংস্র পশুদ্বারা পাহারাপ্রদত্ত অঞ্চল। তবুও বাংলার নাম নিতেই হয়, কারণ বাংলার দক্ষিণতম প্রান্তে কপিলমুনি এই বৌদ্ধধারার অধ্যায়ন করে দিগপাল হয়ে উঠে, সাংখ্যদর্শনের উপস্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁর এই বিশেষ কৃতিত্বকে কুর্ণিশ করার কালে বাংলার নাম নিতেই হতো।

বিহার, যাকে তদানীন্তনকালে মগধ বলা হতো, সেখানে বৌদ্ধ প্রভাবে জৈন দর্শনের বিস্তার ঘটে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল করে রেখেছিল মগধকে। আর জম্বুদ্বীপে মগধে যেই বৌদ্ধ দর্শনবাদের বিস্তার ঘটেছিল, তার আভাস মধ্যভারতেও বেশ ভালোই প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সমস্ত স্থানের মানুষরা বৌদ্ধধারায় স্নান তো করেননি, তবে তৃষ্ণার্ত হলে, তৃষ্ণা মেটাতে মগধাঞ্চলে প্রায়শই আসাযাওয়া করতেন।

আর সেই কারণেই, সেই বিতাড়িত শ্রেণী যতটা সহজে মিশরে বা রোমে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন, জম্বুদ্বীপে সেই কাজ ততটা সহজ হয়না। সুদীর্ঘকাল এঁদেরকে মাথা নামিয়ে সাধারণ মানুষ হয়েই বসবাস করতে হয়েছে এখানে। কিন্তু, এঁদের স্বভাবে, এঁদের লহুতে যে আধিপত্য করার ধারা রয়েছে। ছলে বলে অজুহাতে এঁরা যে একদিন না একদিন শাসক ও শোষক হবেনই।

তাই কিছু শতক বা এক সহস্র সাল জম্বুদ্বীপে সাধারণ মানুষ হয়ে থেকে, এঁরা বৌদ্ধধারার অধ্যায়ন করতে শুরু করেন, তবে শিক্ষা লাভ করা, বা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো এঁদের সেই অধ্যায়নের লক্ষ্য ছিল না। এঁদের লক্ষ্য ছিল, মার্গ অনুসন্ধান। বৌদ্ধ ধারা এখানের মানুষের লহুর কণায় কণায় অবস্থান করছে। তাই অন্য কিছু বলে এঁদেরকে তো বশে আনা যাবেনা। যদি বশে আনতেই হয়, তাহলে এই বৌদ্ধ কথাকেই সামান্য বঙ্কিম করে, তাকে নিজেদের কৃত্য করে স্থাপন করতে হবে। তবেই এঁদেরকে বশ করতে পারবে। আর এই মানসিকতা নিয়েই বৌদ্ধ গ্রন্থের অধ্যায়ন শুরু করেন এঁরা।

সফল হতে সময়ে লেগেছিল, প্রায় দুই থেকে তিন শতক সাল সময়ে লেগে গেছিল। অবশেষে এলো সাফল্য। বৌদ্ধধারার থেকে প্রকৃতিতত্ত্বকে অপসারণ করে, অহমিকা তত্ত্বকেই ভগবানের আসনে স্থাপিত করে, অহংকারের ত্রিগুণকে ত্রিদেব রূপে স্থাপিত করে, বেদ প্রতিষ্ঠিত করে বললেন – এই গ্রন্থ আমরা লিখি নাই, এই গ্রন্থে তো যা কিছু ছিল, তা আমরা সকলেই জানিতাম, মুখে মুখে প্রসারিত ছিল আমাদের মধ্যে। এই কথা যে কত প্রাচীন, তার ধারনাও আমাদের নাই। এই বৌদ্ধরা এই গ্রন্থের আধারেই সমস্ত কথা বলে। এই সমস্ত জ্ঞান আমাদের থেকেই বৌদ্ধরা পেয়েছে। তাই আইস, আমাদের কাছে আইসো। আমরা আর্য, আমরাই আদি, আমরা কেবল ভগবানের ব্যখ্যা দিই না বৌদ্ধদের মত, আমরা তো স্বয়ং ভগবান। আইস, আমাদের নিকট আইস।

মগধ প্রভাবিত হলো না, তবে সেই সমস্ত স্থানের মানুষ প্রভাবিত হলো, যারা বৌদ্ধধারার অমৃতরসধারায় স্নান করতেন না। সিন্ধু উপত্যকায় বেদচর্চা শুরু করালেন আর্যরা, ব্রহ্মকে

জানেন তাঁরা, এমন দাবি করে, ব্রাহ্মণ বলতে শুরু করলেন নিজেদের, এবং নিজেদের মিথ্যাকে মহাকৌশলে আবৃত করে, উত্তর জম্বুদ্বীপের মানুষদের অর্থাৎ তির্গত বা বর্তমান কাশ্মীর উপত্যাকার মানুষদের বশীভূত করে ফেললেন।

ক্রমে, এই বেদের প্রসার করার উদ্দেশ্যে, বেদের তত্ত্বকে কেন্দ্রে স্থাপন করে, রচনা করতে থাকলেন, ইন্দ্র পুরাণ, বরুণ পুরাণ, সূর্য পুরাণ, চন্দ্র পুরাণ, এবং অনেক কিছু। তবে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা অত সহজ নয়, বিশেষ করে যেখানে বৌদ্ধধারার ছিটেফোঁটা অন্তত পৌঁছে গেছে, সেখানের মানুষদের। কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হবে, বোঝাতে যে তাঁরা ভগবান। এই আকাশ, জল, বায়ু সকলে তাঁদের অধীনে স্থিত, এটি প্রমাণ করতেই হবে।

তাই, এঁরা হোমানুষ্ঠান করা শুরু করলেন, এবং ঘৃত, ফলমুলাদিকে অগ্নিতে দগ্ধ করে, প্রকৃতিকে পুষ্টি প্রদান করে, বর্ষা, রৌদ্র, ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করার চমৎকার প্রদর্শন করিয়ে বিশ্বাস অর্জন করা শুরু করলেন আর্যরা। যখন উত্তর জম্বুদ্বীপের, সিন্ধুনদ তটের নিবাসী সকলে তাঁদেরকে বিশ্বাস করা শুরু করলেন, তখন তাঁরা এবার বিস্তারের প্রয়াস করলেন।

বিহার মানে তখনকার মগধের নিকটবর্তী স্থানে গমন করে দেখলেন যে খুবএকটা সুবিধা করতে পারছেন না। প্রয়াস ছাড়লেন না, তবে বিচার করলেন যে, অন্যদিকে বিস্তার আবশ্যক। তাই সিন্ধুতট ছেড়ে যমুনাতটে এসে নিজেদের অধিকার স্থাপন করলেন। হোমযজ্ঞ দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে করে, চমৎকার দেখিয়ে মন জয় করা শুরু করলেন। বৌদ্ধগ্রন্থাদি পাঠ করেন নি কেউই মধ্যভারতের মানুষ, তাই বেদ যে বৌদ্ধগ্রন্থেরই বঙ্কিমপ্রকাশ, এই সত্য উদ্ধারের সামর্থ্যও কারুর রইলো না।

তাই যমুনাতট অঞ্চলকেও সহজেই অধিকার করে নিলেন ব্রাহ্মণ আর্যরা। ক্রমশ সেখান থেকেও দক্ষিণে যাত্রা করলেন তাঁরা, এবং বিন্ধ্যাঞ্চল পর্বতমালা অতিক্রম করে দ্রাবিড় অঞ্চলকেও অধিকারে আনলেন। দ্রাবিড়রা বৌদ্ধধারার থেকে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই ছিলেন, তাই তাঁদেরকে বশীভূত করতে অধিক সময় লাগলোই না ব্রাহ্মণদের আর্যদের। আর যখন মগধের পশ্চিমকুলের

পূর্বস্থল পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে অধিগ্রহণ করে নিলেন আর্যরা, তখন জম্বুদ্বীপ, যার নামকরণ কপিলমুনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে স্থাপিত ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে হয়ে উঠলো আর্যবত্র।

২৬ তম বুদ্ধ, কনকমুনির জন্ম হয়ে গেছে প্রায় ১৫০০ বছর আগে। এই দীর্ঘ অবধিতে জৈনধারার উত্থান হলেও, বৌদ্ধ ধারার ন্যায় ঋজুতা নেই তাঁদের। তাই মগধ দুর্বল হয়ে উঠেছিল। আর সেই সুযোগ নিয়ে, আর্যদের কাশ্যপ নিজেকে ২৭তম বুদ্ধ আখ্যা প্রদান করে, মগধকেও আর্যবত্রের মধ্যে অধিগ্রহণ করা শুরু করলেন। প্রয়াস করলেন মগধের সীমান্তের অঙ্গ ও ভঙ্গ দেশ, যা বর্তমানে বঙ্গদেশ নামে খ্যাত, তাকেও অধিগ্রহণ করার।

কিন্তু প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত ছিল সেই অঞ্চল। ঘন বন, তাতে বিষধর সর্প, অজস্র জোঁক, বিশালাকায় হস্তি ও গণ্ডার, এবং প্রকাণ্ড গতির ও প্রকাণ্ড শক্তিধর ব্যঘ্র এই অঞ্চলকে অভেদ্য করে রেখে দিল আর্যদের নিকটে। তাই বর্তমানের বাংলা আর্যদের থেকে মুক্তই রইল। সব কিছু মিলিয়ে আর্য ও আর্যবত্র নিজেদের মিথ্যাচারকে ঢেকেঢুকে বেশ সুন্দরভাবেই নিজেদেরকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন।

আর যাই গছানো হয়ে গেল, তাই তাঁদের শোষণপর্বের শুরু হয়ে গেল। নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে, নিজেদের অনুগত শক্তিধরদের ক্ষত্রিয় রূপে স্থাপন করিয়ে, তাঁদেরকে দিয়ে আর্যবত্র শাসন করতে থাকলেন, আর অন্য সকলকে বৈশ্যরূপে স্থাপিত করে, নিজেদেরকে ভগবান বলে তাঁদের কাছে স্থাপিত করলেন। ব্রাহ্মণকে দান দেওয়া মহাপুণ্য, এবং এই পুণ্যের ফলে স্বর্গলাভ হবে, এমন আখ্যা দিয়ে, দানরূপে সকলের থেকে সুস্বাদু আহার তস্করি করা শুরু করলেন।

তস্করি কেবল আহারাদি বস্তু পর্যন্তই সীমিত থাকেনা। তা পরস্ত্রী, পরসম্পদ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে এক শত বৎসরও লাগেনা। ক্রমশ আর্যদের ঔদ্ধত্য চরমে উন্নীত হলে, মগধের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজেদের মধ্যে আলাপ করা শুরু করে দেয়- এঁরা ভগবান! ভগবানের এমন লোভ! আমরা বৌদ্ধদের দেখেছি, কই, তাঁরা তো এমন ছিলেন না! ... কোথাও কনো গণ্ডগোল হচ্ছে নিশ্চয়ই।

এমন আলোচনা থেকে একজন মহামান্য ব্যক্তি, যিনি একই সঙ্গে পণ্ডিত এবং সাধক, তিনি বৌদ্ধধারার চর্চা পুনরায় শুরু করলেন। এই মহাশয়ের নাম হলো দধীচি। বৌদ্ধ কথার সমাহার নির্মাণের প্রয়াসে, ইনি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং সারকথার বিবরণ শুরু করেন, যাকে তাঁর পুত্র পিপলাদ ১১টি উপনিষদ রূপে ব্যক্ত করলেন। আর্যবর্ত্রতে দাঁড়িয়ে এমন কাজ করাকে আর্যরা দণ্ডনীয় অপরাধ রূপেই দেখলেন।

আর তাই প্রথমত দধীচিকে দণ্ড প্রদান করলেন, মৃত্যুদণ্ড। তবে দধীচির অনুগামী অনেক। তাঁদের মধ্যে বিদ্বেষ প্রসারিত হলে, আর্যরা দধীচিকে নিয়ে কিছু রম্যরচনা করলেন পুরাণের মাধ্যমে, এবং দেখালেন যে আর্য দেবদের মহান কর্মের উদ্দেশ্যে দধীচি স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। অনুগামীরা শান্ত হলেও, পিপলাদ শান্ত হলেন না। তিনি নিজের উপনিষদ গঠন সমাপ্তই করলেন।

কিন্তু উপনিষদ যদি আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে বেদের ভিত নড়ে যাবে। তাই পিপলাদকে একপ্রকার প্রত্যাহার করলেন আর্যরা। জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে উঠলো পিপলাদের, কিন্তু সত্য উদ্ঘাটন তাও ত্যাগ করলেন না তিনি। এই মহাসংগ্রামময় জীবনের সাক্ষী যেমন সকলের সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে থাকেন, তেমনই ভাবে থাকলেন প্রকৃতি। কিন্তু এই সংগ্রাম এক অন্য সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কেবল বেঁচে থাকার সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রাম সত্য উদ্ঘাটনের সংগ্রাম, সত্যলাভের সংগ্রাম, সত্যস্থাপনের সংগ্রাম। তাই প্রকৃতিকে কেবল সাক্ষী হয়ে থাকা থেকে অপসারিত হতেই হলো।

পিপলাদের সম্মুখে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন দিব্যনিরাকার স্বরূপ ধারণ করে, এবং বললেন, "পুত্র পিপলাদ। কেন এই সংগ্রামে নিজেকে রত করে রেখেছ? এমন সংগ্রামে রত থাকলে, সত্য তুমি জেনে ফেললেও, তাকে স্থাপন কি রূপে করবে তুমি? কেউ যে এক সংগ্রামী, আর্যবিরোধীর কনো কথাই শুনবে না!"

পিপলাদ প্রকৃতিকে মাতা নামে আখ্যায়িত করে বললেন, "মাতা, তুমি তো মা! সকলের মা। তাই তমার কাছে আর্যও যা, আমিও তাই। তোমার কাছে কনো ভেদাভেদ নেই। কিন্তু মা, তুমি তো মা হবার সাথে সাথে পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। তুমি তো সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী, তাই না! তাহলে তুমি এই যে আর্যদের অনবরত সত্যের দমন করার ভাব এবং সমস্ত সময়ে অহংকারের আরাধনা করার প্রয়াস এবং সমাজে অহংকারের বিস্তার করার প্রয়াস, এও নিশ্চয়ই তুমি দেখেছ। তাহলেও কি তুমি মনে করো না যে এই অসত্যের প্রতিকার করা আবশ্যক!"

নিরাকার মাতা হেসে বললেন, "সন্তানের সুখেই মাতার আনন্দ পুত্র। এতাবৎ সন্তান অসত্যকে স্থাপন করেই আনন্দ লাভ করছিল, তাই এই মাতাও তাতে আনন্দে ছিল। আজ এই সন্তান অসত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে ব্যথিত, সত্যের অনুসন্ধানে কাতর, তাই তো ছুটে এলাম আমার সেই সন্তানের কাছে। আজ্ঞা করো আমায়। কি করতে পারি আমি, যাতে আমার এই সন্তানও আনন্দ লাভ করে?"

পিপলাদ লজ্জিত হয়ে বললেন, "কি বলছো মা! আজ্ঞা দেবে এই সন্তান তাঁর মাকে? ... না না মা, আজ্ঞা নয়, অনুরোধ জানাই, যাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আর সত্যের পথে যাত্রাকে নিশ্চয় করা যায়। ... সম্ভব কি মা, তা করা?"

ব্রহ্মময়ী জননী হেসে বললেন, "সন্তানের আনন্দের জন্য মাতা যে সমস্ত অসম্ভবকেও সম্ভব করতে প্রস্তুত পুত্র। ... পুত্র, আর্য ব্রাহ্মণরা অহংকারকে অহংকার বলেন না। তাঁরা অহং দ্বারা স্বয়ংকে প্রকাশিত না করে, আত্ম শব্দ দ্বারা স্বয়ংকে প্রকাশিত করে, আর তাই তাঁদের অনুগামীরা বিভ্রান্ত এই ভেবে যে অহং ও আত্ম পৃথক। এই আত্মই ত্রিগুণবিশিষ্ট, এবং এই ত্রিগুণকেই আর্য ব্রাহ্মণরা ত্রিদেব রূপে স্থিত করে রেখেছে।

কিন্তু পুত্র, বিভ্রান্তি এখানেই সীমিত নয়, আর শুধু আর্য ব্রাহ্মণরাই বিভ্রান্ত নয়। বিভ্রান্ত তুমিও। পুত্র, যাহা আত্ম, তাহাই আমি। আমার সাথে আত্মের কনো ভেদ নেই। ভেদ কেবল এই যে, আত্ম এই ব্যাপারে ভ্রমিত যে আমিই তাঁদের স্বরূপ, আর সেই ভ্রমের কারণেই সে নিজেকে

ত্রিগুণে বিভাজিত করে রেখেছে। পুত্র পিপলাদ, যদি আমার কথা বলতে যাও, তাহলে আর্য ব্রাহ্মণরা তোমাকে কিছুতেই তা বলতে দেবেনা। আর শুধু তাই নয়, তোমাকেও তাঁরা জীবিত থাকতে দেবেনা, যেমন তোমার পিতাকেও তাঁরা জীবিত থাকতে দেয়নি।

তাই পুত্র, উপনিষদ রচনা করো, কিন্তু সেখানে আমার উল্লেখ না করে, আত্মের উল্লেখ করো। আত্ম সকল স্বরূপে আমিই। আমিই তাঁদের উৎস আর আমিই তাঁদের গন্তব্য। আর এই সত্য ভুলে থাকার কারণেই, তাঁরা নিজেদের আত্ম মনে করে, আর আমাকে প্রকৃতি। যখন এই সত্য তাঁদের বোধগম্য হয়ে যায়, তখন সেও আর আত্ম থাকেনা, ব্রহ্ম হয়ে যায়, আর আমিও পরাপ্রকৃতি থাকিনা, পরব্রহ্ম হয়ে যাই। তাই উপনিষদের রচনা করো, কিন্তু আমার নাম উল্লেখ না করে, আত্মের উল্লেখ করো।

পুত্র, আর্য ব্রাহ্মণরা আজ পর্যন্ত কোনদিন সাধনা বা তপস্যা করেও নি, আর কনো কালে করবেও না। হ্যাঁ, ভেক ধরবে তপস্বীর, এবং নিজেদেরকে ঋষি উপাধি প্রদান করে, নিজেদের মহাসাধক রূপে স্থাপন করে রাখবে, যাতে অসত্যের প্রচার আরো শক্তিশালী হয়। তাই এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে, তোমার লিখনের ভেদ আর্য ব্রাহ্মণরা করে ফেলবে। তাঁরা কনোদিনও জানতে পারবেনা যে, আত্মই প্রকৃতি, আর প্রকৃতিই আত্ম, আর তাই তোমার উপনিষদ যে পরাপ্রকৃতিরই ব্যখ্যা প্রদান করছে, তা তাঁরা কনোদিন উদ্ধার করতেই পারবেনা।

কিন্তু তোমার উপনিষদের প্রকাশ্যে আসা অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ তোমার উপনিষদকে উদ্দেশ্য করেই, আমার সত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নেওয়া অবতার তোমার কাছে উপস্থিত হবে, এবং তোমার থেকে পূর্ণ শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু আমার নাম করে উপনিষদ লিখলে, তাকে আর্যরা কিছুতেই প্রকাশ্যে আসতে দেবেনা। তাই, আত্মের নামে উপনিষদ রচনা করো পুত্র। তোমার আনন্দের উদ্দেশ্যে, আমি অবতার গ্রহণ করবো।

কিন্তু অবতার দেহ ধারণ করার পর, স্বরূপ বিরূপ, কনো কিছুরই স্মরণ থাকেনা। তাই তোমার উপনিষদকে ধরে ধরেই, আমি তোমার কাছে উপস্থিত হবো, আর সত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটাবো। তাই উপনিষদ রচনায় তৎপর হও পুত্র”।

পিপলাদ বিভোর হয়ে বললেন, “একটি ছেলের আনন্দের জন্য তুমি অবতার গ্রহণ করে নেবে মা! একি তোমার অন্য সন্তানের সাথে অবিচার করা হয়ে যাবেনা!”

মাতা হেসে উত্তর দিলেন, “পুত্র, সন্তানের আনন্দই মায়ের কাছে একমাত্র কাম্য। অসত্য বিস্তারের কারণে আমার অবতার গ্রহণ করার তো কনো আবশ্যকতাই নেই পুত্র। সমস্ত জীব এমনিই অসত্যেই বিরাজ করে। কিন্তু আমার এই পুত্র যে অসত্যে ব্যথিত, অসন্তোষে গ্রসিত। আমার কনো সন্তানকে আমি নিরানন্দে কি করে দেখতে পারি পুত্র! আমি কি আর আত্মের ন্যায় ভ্রমিত যে, নিজেকে ঈশ্বর বলেই আনন্দ পাবো! ... না পুত্র, আমার কাছে ঈশ্বর পরিচয়ের থেকেও অধিক তৃপ্তি মা হবার পরিচয়। ... আর মা সন্তানের আনন্দের জন্যই অবস্থান করে, তাঁর নিজের কিছু চাওয়াপাওয়া থাকেনা”।

পিপলাদ গদগদ হয়ে বললেন, “তাহলে মা, আজ থেকে এই ‘মা’ অক্ষরই আমার কাছে গুরুমন্ত্র। ঈশ্বরকে আপন করে পাবার একটিই উপায়, আর তা হলো তাঁকে জননী রূপে দেখো। ঈশ্বর বললে, সে তোমার থেকে দুরেই থেকে যাবে, আর দূরে থেকে থেকেই তোমার আনন্দের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু একমাত্র জননী বলে, দুহাত তুলে আবাহন করলে, তিনি আর থাকতে পারেন না, সন্তানের আনন্দের ব্যবস্থা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন, এই হবে আমার গুরুবাণী”।

মাতা অন্তর্হিত হলেন, পিপলাদ আত্ম নামদ্বারাই উপনিষদের রচনা করলেন। আর্যরা আত্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে, তাই পিপলাদকেও প্রত্যাবর্তন করালেন। উপনিষদ প্রসারিত হতে শুরু করলো। আর তা কর্ণকুহরে পৌঁছল, মৃকেন্দুর বিস্ময়কর মেধাবী পুত্র মার্কণ্ডের কাছে”।

দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, “এই কারণেই কি সব সময়ে, আর্যরা মগধ ও মগধনরেশকে শত্রুর আসনে থাকতে দেখিয়েছেন? এটিই কি তাহলে কারণ?”

বঙ্গীয় অভিযান

ব্রহ্মসনাতন পুত্রীর প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর দিলেন না, বরং মৃদু হাসলেন কেবল। আর বলতে থাকলেন, “প্রভাবিত হলেন মার্কণ্ড, আর তাকে মাধ্যম করেই শুরু হলো মার্কান্ড, অর্থাৎ মায়ের কাণ্ড। পরাপ্রকৃতির অঙ্গজাত তিনি, অর্থাৎ তিনি কনো ভ্রমিত ব্রহ্মাণুর সহস্র দেহধারণের মধ্যে একটি দেহধারণ করে বিরাজমান জীবকটি নন, তিনি হলেন পরমেশ্বরীর প্রেরণায়, তাঁরই অঙ্গজাত একটিই জীবনধারণ করা ঈশ্বরকটি অবতার।

জগতে সত্যের বিস্তারের যেই ভাব পিপলাদ ধারণ করেছিলেন, সেই সন্তানের আনন্দের বিধান করতে, জগন্মাতার গ্রহণ করা অবতার তিনি। তবে ভৌতিক দেহ ধারণ করতে যখন হয়েছে, ভ্রমে মজতে যে তাঁকেও হয়েছে, নাহলে নিরাকার, অনন্ত, অসীম ব্রহ্মময়ী কেনই বা সসীম দেহ ধারণ করবেন। তাই নিজের সত্য, নিজের ঈশ্বরকটি হবার ভান তাঁর শিশুকাল থেকে কি করে থাকবে?

তবে তা না থাকলেও, জীবকটির ন্যায় অজস্র দেহধারণ করে করে, নিজের ভ্রমের আস্তরণকে ঋজুতা প্রদান করেন নি তিনি, তাই অসত্যের ভরসাতেই দেহধারণ করলেও, অসত্যের পলস্তা তাঁর উপর যৎসামান্যই। আর সেই কারণে, আর্যগৃহে জন্মগ্রহণ করলেও, পরাপ্রকৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ শৈশব কাল থেকেই। আর তাঁর ঈশ্বরীর প্রতি প্রেমভাবকে যে আর্য ব্রাহ্মণরা ভয় পাবেন, তাই যে স্বাভাবিক।

এই ঈশ্বরীর প্রতি প্রেমভাবের কারণে অহংকার হ্রাস পায়, স্বার্থহীন জীবন উন্নত হয়, আর স্বার্থহীন নিরহংকার ব্যক্তি যে আচারবিচারের থেকে মুক্তই হন, কারণ আচারবিচারের মধ্যে তিনিই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, যার নিজের স্বার্থচিন্তাকে চরিতার্থ করার বাসনা থাকে, যার

নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার কামনা থাকে। জগন্মাতা যে প্রতিষ্ঠার উর্দ্ধে, জগন্মাতা যে সমস্ত কামনাবাসনা, সমস্ত প্রদর্শনী, সমস্ত বিধিবিধানের উর্দ্ধে। আর আর্য ব্রাহ্মণ তো সমাজকে শোষণ করেনই নিজেদের আচারবিচার দ্বারা।

জন্মের কালের আচারবিচার, অন্নপ্রাশনের কালে আচারবিচার, উপনয়নের আচারবিচার, নিত্যদিনের আচারবিচার, বিবাহের কালে আচারবিচার, গর্ভধারণের কালে আচারবিচার, শ্রাদ্ধের আচারবিচার, আর তা ছাড়া আজ এই কামনা, কাল সেই বাসনার পূর্তির উদ্দেশ্যে দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য সহস্র প্রকার পূজার আচারবিচার, সহস্র প্রকার ব্রতের আচারবিচার- এই হলো আর্য ব্রাহ্মণের বিধান। আর এই বিধানের কারণ? কারণ একটিই, এই প্রতিটি অনুষ্ঠানের আচারবিচারের পালন আর্য ব্রাহ্মণ সকলকে দিয়ে করাবেন, আর তা করানোর কারণে দক্ষিণা স্বরূপ, তাঁদের যা পছন্দ লুণ্ঠন করবেন।

বাণিজ্য বলে বাণিজ্য, লুণ্ঠন প্রক্রিয়া বললে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া, যেই নামেই বলা হউক না কেন, এই ছিল আর্য ব্রাহ্মণদের উপার্জনের পথ। অর্থাৎ স্পষ্ট কথা, সাধারণ মানুষকে কামনাবাসনায় জর্জরিত হতে হবে। তবেই না তাঁরা অন্যের উন্নতিতে ঈর্ষা অর্থাৎ মাৎসর্যপূর্ণ হবেন, আর হোমযজ্ঞাদি করবেন! তবেই না যেই জীবনের প্রতি মোহগ্রস্ত, সেই জীবনকে ভুতপ্রেতের খপ্পর থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অভিলাষী হবেন! তবেই না, এমন বিশ্বাস রাখবেন যে, আমার মানসিকতা যাই হোক না কেন, দেবতাদের তুষ্ট রাখলে, চরম অনাচার করলেও, দাম্পত্য জীবন সুখের হবে, তাই যজ্ঞাদি করে বিবাহ অনুষ্ঠান হবে।

অর্থাৎ সহজ কথা, অহংকারের উপাসনা, কামনাবাসনার বাড়বাড়ন্ত এবং মোহবদ্ধতার মাদকতাই সম্যক সমাজে আর্য ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা, আর যতই এই কামনাবাসনা, অহমিকা এবং মোহ প্রসারিত হবে সমাজে, ততই ব্রাহ্মণের লুণ্ঠন-বাণিজ্য লক্ষ্মীমুখ দেখবে, আর তাঁদের নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সম্পত্তি, এবং বিলাসিতার সাধ পূর্ণ হবে।

যেই সমাজ অহমিকার আরাধনা করে, তাঁকেই না স্বর্গলাভের মোহ প্রদান করা সম্ভব, নরকলাভের ভীতি দেখানো সম্ভব, আর তবেই না ঘৃণ্য ঘৃণ্য প্রথা রেখে সর্বস্ব লুণ্ঠন করা সম্ভব। যদি স্বর্গের মোহ নাই থাকে, তবে সতীদাহ কি করে হবে? আর যদি সতীদাহ না করা যায়, তবে সম্পত্তি লুণ্ঠন কি করে হবে? যদি নরকের ভয় নাই থাকে, তবে বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে কেন তরুণীর বিবাহ দেওয়া হবে? ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হলেও, ব্রাহ্মণের সাথে বিবাহ হলে স্বর্গ নিশ্চিত, নরকের দরজা বন্ধ, এই বিশ্বাস স্থাপন না করা গেলে, ব্রাহ্মণ সম্ভোগের জন্য তরুণী কি করে লাভ করবেন?

আর সেই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় বিবাহ হলে, নরকে যাত্রা নিশ্চিত, এই ভয় স্থাপিত না থাকলে, বিধবা যে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নিয়ে অব্রাহ্মণকে বিবাহ করে নেবে, আর ব্রাহ্মণ সেই সম্পত্তির অংশ পাবেনা, এ কি করে হতে দিতে পারে লোভসর্বস্ব আর্য ব্রাহ্মণরা! সেই কারণেই তো বেদ, পুরাণ স্থাপিত রেখে, জ্যোতিষের মত মনোবিজ্ঞানকে বিকৃত করে ভাগ্যচর্চা রূপে স্থাপিত করে, সম্পূর্ণ সমাজকে অহংকারের ত্রিগুণ অর্থাৎ ত্রিদেবের আরাধনায় মত্ত রাখেন আর্য ব্রাহ্মণ।

কিন্তু এমতবস্থায় যদি প্রকৃতির আরাধনা করা হয়, তাহলে যে সমস্ত কিছুর বিনাশ হয়ে যাবে, সমস্ত লুণ্ঠনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে! বৌদ্ধদের প্রকৃতির আরাধনা করতে দেখেছেন আর্য ব্রাহ্মণরা। প্রকৃতি হলেন ব্রহ্মময়ী, তিনি ভগবান নন, ঈশ্বরী, আর তিনি তাই, যার ঈশ্বরী হবার প্রতিষ্ঠাতে কনোপ্রকার মনোযোগ নেই, তাঁর মনোযোগ মাতৃত্বে। সন্তানের আনন্দই তাঁর লক্ষ্য, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, স্বয়ং উপেক্ষাও গ্রহণ করেন সন্তানের আনন্দের উদ্দেশ্যে। বৌদ্ধদের দেখেছেন তাঁরা নিঃস্বার্থ জীবনযাপন করতে, সমস্ত অহমিকা প্রতিষ্ঠা থেকে বিমুখ থেকে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতে। তাই জগন্মাতার প্রতি প্রেমভাবের নাম শুনলেও ভিত হয়ে যায় ব্রাহ্মণকুল।

দধীচির ক্ষেত্রেও সেই একই ভাব ছিল তাঁদের, পিপলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ, আর মার্কণ্ডের ক্ষেত্রেও। একবার যদি কেউ ব্রহ্মময়ীর ভাব সমাজে বসিয়ে দেয়, আর সমাজ নিঃস্বার্থতার,

নিরহঙ্কারের, মোহশূন্যতার অভ্যাস করতে শুরু করে দেয়! তাঁদের কি হবে তাহলে? তাঁদের সাজানো বাণিজ্য, আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লুণ্ঠন করে করে সম্পত্তি বৃদ্ধি, অধিকার স্থাপন করে করে আর্যবত্র স্থাপন, এই সব যে জলে চলে যাবে! না না, অহংকারেরই আরাধনা হবে, ঈশ্বরের আরাধনাকে আর্যকুল প্রশ্রয় দিতে পারেনা, কিছুতেই পারেনা।

তাই, মার্কণ্ডের পিতা মৃকেন্দুকে আর্যসমাজ ডেকে পাঠালেন। একপ্রকার হুমকি দিয়েই বললেন, “পুত্রের এই মাতৃপ্রেমকে যথাশীঘ্র বন্ধ করো মৃকেন্দু, নাহলে তোমার একমাত্র পুত্রকে তুমি হারিয়ে ফেলবে, যাই তার বয়স ষোড়শ হবে। ... আরে তুমি জানোই না তো, যেই মাতার প্রেমে তোমার পুত্র আবদ্ধ, তিনি যে সদা ষোড়শবর্ষীয়, ষোড়শের থেকে তাঁর বয়োবৃদ্ধিই হয়না। তাই তাঁর প্রতি প্রেম রাখা ব্যক্তিকেও তিনি ষোড়শ বয়স অতিক্রম করতে দেন না। ... তাই যথাশীঘ্র তোমার পুত্রের মাতৃনাম জপ বন্ধ করো, না হলে ষোড়শ বৎসর হলেই, কাল নেমে আসবে তাঁর জীবনে”।

মৃকেন্দু ভয় পেলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, নিজের পত্নীকে আর্য ব্রাহ্মণদের কথা বললেন। স্বামীস্ত্রী পরামর্শ করে কেবলই ক্রন্দন করলেন। ব্রাহ্মণ যে ভগবান, তাঁদের বচন কি করে মিথ্যা হবে! আর মার্কণ্ডের মাতৃপ্রেম যে সহজাত, তাকেই বা কি করে আটকাবেন তাঁরা! ... এত অপেক্ষার পর, একটি মাত্র সন্তান লাভ করলেন, আর সেই সন্তানও ষোড়শ বৎসর হলেই চলে যাবেন। ব্যাথায় বেদনায় ভেঙ্গে পরলেও, স্বামীস্ত্রী মনস্থির করলেন, না, যতদিন মার্কণ্ড জীবিত থাকবে, ততদিন মার্কণ্ডকে সর্বপ্রকার স্নেহ প্রদান করবেন তাঁরা, সর্বপ্রকার শিক্ষাও দেবেন, এবং সর্বপ্রকার স্বতন্ত্রতাও প্রদান করবেন তাঁরা।

ব্রাহ্মণরা যেই ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন, সেই ভয় তো মৃকেন্দু পরিবার পেলেন, কিন্তু যেই মাতৃপ্রেম বিমুখতার প্রসার করতে চেয়েছিলেন, তা হলো না, বরং তার বিপরীত হলো। মার্কণ্ড সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন, উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, এবং পিপলাদের সংসর্গ গ্রহণ করলেন। মৃকেন্দু ও তাঁর পত্নী ব্রত নিয়েছিলেন যে তাঁরা তাঁদের পুত্রের স্বল্পায়ুর স্বতন্ত্রতায় কনো হস্তক্ষেপ করবেন না।

তাই অতি সহজেই মার্কণ্ড পিপলাদের সংসর্গ লাভ করে, উপনিষদের পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে থাকলেন। আর যখন পিপলাদ দেখলেন যে মার্কণ্ডের মধ্যে মাতৃপ্রেম কানায় কানায় রয়েছে, তখন তিনি উপনিষদের গুপ্তকথা, যেই গোপন মাতার নির্দেশে পিপলাদ ধারণ করে, আর্যসমাজে উপনিষদকে স্থাপন করেছিলেন, সেই গুপ্ত কথারও বিবরণ প্রদান করলেন।

একদিকে যখন এই সমস্ত কিছু চলছিলো, তখন আর্য ব্রাহ্মণ সমাজ মার্কণ্ডকে তাঁর ষোড়শ বৎসর অতিক্রমের দিনেই মৃত্যু উপহার দিয়ে হত্যা করবেন, এমন ষড়যন্ত্র স্থির করেন। আর সেই কথা পিপলাদ, যিনি সর্বদা আর্য ব্রাহ্মণরা কি ষড়যন্ত্র করছেন, তা জানার জন্য গুপ্তচর স্থাপিত রাখতেন, তিনি লাভ করলেন।

গুপ্ত সংবাদ লাভ করে, মার্কণ্ডের দীর্ঘায়ুর কামনায় চিন্তন করে, মার্কণ্ডকে একদিন নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। মার্কণ্ডের উদ্দেশ্যে পিপলাদ বললেন, "মার্কণ্ড, আমি যেই উপনিষদের রচনা করেছিলাম, তোমাকে তার গোপন কথা আগেই বলেছি। এই কথার মধ্যাতত্ত্ব ছিলেন মাতা। কিন্তু মাতা আমার সামনে উদিত হয়ে আমাকে বলেন যে অহমিকা অর্থাৎ আত্ম-সকল আর তাঁর মধ্যে এই ভেদ যে, তিনি ভ্রমমুক্ত ব্রহ্ম, আর আত্মরা ভ্রমযুক্ত ব্রহ্মাণু। তাঁরা দুই নন, একই। আর তাই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্দেশ দেন, আত্ম-বিবরণ রূপে।

তিনি আমাকে বলেন যে, আত্মের প্রশংসা করে আমি যা বলবো উপনিষদে, তা তাঁরই প্রশংসা হবে, কিন্তু তাঁর প্রশংসা করলে আর্য ব্রাহ্মণরা সেই ভাবেই আমাকে মৃত্যু দেবেন, যেই ভাবে আমার পিতার মৃত্যু নিশ্চয় করেছিলেন। তাই আমি যেন সত্যের বিবরণ দেওয়া থেকে বিরতও না হই, আর সেই বিবরণ দেবার কালে, মাতার উল্লেখ না করে আত্মের উল্লেখ করি। তবেই ব্রাহ্মণরা আমাকে জীবনদান করবে।

পুত্র মার্কণ্ড, মাতার বিধানকে অনুসরণ করেই, আজ আমিও তোমাকে একই কথা বলছি। গৃহ থেকে দূরে চলে যাও। শিবলিঙ্গের স্থাপনা করো, আর মাতাকে যেই ভাবে ধারনা করো তুমি, সেই ধারনাকে আত্মের তমগুণের উপর আরোপ করে, মন্ত্রের উচ্চারণ করো। পুত্র, হট করো

না। প্রথম ব্রাহ্মণদের থেকে সুরক্ষিত হও, পরবর্তীতে মাতার গুণকীর্তন করার অনেক সুযোগ পেয়ে যাবে, যদি আজ জীবিত থাকো।

আর তোমাকে আজ আরো একটি গোপন কথা বলি। আত্মের বা অহংকারের ত্রিগুণের মধ্যে এই তমগুণ অত্যন্ত বিচিত্র। এঁর বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন প্রকার বিস্তার হয়। আর এঁর যেই চরমস্তরের বিস্তার, সেই বিস্তার সম্ভব হলে, আত্ম মাতার সত্যকে ধারণ করতে পারে, এবং সমস্ত ভ্রমের নাশ করে। যাও মার্কণ্ড, গৃহ থেকে দূরে স্থিত হয়ে, শিবলিঙ্গ স্থাপন করে, বাহ্যিক ভাবে ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করে, জীবনদান লাভ করো। আর একই সঙ্গে সেই শিবমন্ত্রের উপর মনকে নিবদ্ধ করো। আশীর্বাদ করি তোমায়, তমগুণের সমস্ত বৈচিত্র্য তোমার হৃদয়দর্পণে চিত্রিত হোক"।

পিপলাদ মার্কণ্ডের কাছে গুরু, আর তাঁর বাণী হলো গুরুবাণী। তাই পিপলাদের কথিত প্রতিটি অক্ষরের পালন করলেন মার্কণ্ড। নিজগৃহে নাট্য করলেন যেন তিনি জেনে গেছেন তাঁর আয়ু ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত, আর তাই দীর্ঘায়ুর প্রতি কামনা নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন, এই বলে যে তিনি মহাকাল শিবের আরাধনা করে দীর্ঘায়ু লাভ করবেন।

আর সেই কথা তাঁর মাতাপিতা ভয়ার্ত হয়ে আর্যকুলকে জানালে, আর্যকুল আনন্দিত হন এই ভেবে যে, মার্কণ্ডের মাতৃপ্রেমের বিসর্জন হলো শেষমেশ। তবে বিশ্বাস তো আর্যরা কারুকে করেন না, করবেনই বা কি করে, দিবারাত্র যারা অন্যের বিশ্বাস নিয়ে ক্রীড়া করেন, তাঁরা কারুকে বিশ্বাস কি করে করতে পারেন! তাই মার্কণ্ডের শিবভক্তি দেখতে তাঁরা যাত্রা করলেন, সঙ্গে উপনিষদ রচনা করে, তাঁদের প্রিয় হয়ে ওঠা পিপলাদ কেও সঙ্গে রাখলেন।

পিপলাদ তাঁর প্রিয়শিষ্যকে সেই সময় প্রদান করতে চান, যেই সময়কালে মার্কণ্ড তমগুণের বৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ সন্ধান পেয়ে যাবেন। তাই মার্কণ্ডের অবস্থান জানা সত্ত্বেও, আর্য ব্রাহ্মণদের এদিকসেদিক ভ্রমণ করালেন, মার্কণ্ডের সন্ধানে। অবশেষে যেইদিন তাঁর ষোড়শ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়, সেইদিন আর্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন মার্কণ্ডের সন্নিকটে।

ব্রাহ্মণ সকল দেখলেন মহাধ্যানে লীন হয়ে, মার্কণ্ড শিবের নামে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের রচনা করে, অবস্থান করছেন একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হলেন, আর পিপলাদ অভয় লাভ করে মার্কণ্ডকে জীবনদানের বিধান প্রদান করতে বললে, আর্য ব্রাহ্মণকুল পিপলাদকেই স্বমুখে সেই অভয়দান প্রদান করতে বললেন। মার্কণ্ড অভয়দান লাভ করলেন, আর গুরু আলয়ে প্রত্যাবর্তন করে কিছু বিশেষ কথা বললেন তাঁর গুরুর উদ্দেশ্যে।

তিনি বললেন, "গুরুদেব, আপনি যেই উপায় বলেছিলেন, সেই উপায়ে আমি তমগুণের মহা উগ্র স্বরূপ দর্শন করেছি। আর এও অনুধাবন করেছি যে, যেমন যেমন উগ্র হয়ে ওঠেন তমগুণ, তেমন তেমন ব্রহ্মময়ীরও রূপবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। আসল কথা এই যে, ব্রহ্মময়ী নিরাকার ও পরিবর্তনীয়, অনেকটা আকাশের মত। যেমন যেমন আকাশের বক্ষে বাদল শুভ্র থেকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ হয়ে ওঠে, তেমন তেমন গগনের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে, এমনই বোধ হয়।

অবশেষে যখন বাদল সর্বোত্তম ঘনকৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠে বর্ষণ করে, তখন গগন উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর গগনের স্বরূপ, অর্থাৎ বাদলমুক্ত গগন প্রদর্শিত হয়। গুরুদেব, সত্ত্বগুন যদি শুভ্র লঘু ওজনের বাদল হয়, তবে রজগুণ হলো ঘন শুভ্র বাদল, আর এঁরা সকলে মাতাকে ঢেকে রেখে, অসত্যের স্থাপনার দিকেই মনযোগী। তমগুণ হলো কৃষ্ণবর্ণ বাদল, তবে সেও প্রথম দিকে মাতাকে ঢেকেই রাখে।

তবে এই কৃষ্ণবর্ণ বাদল অর্থাৎ তমগুণের বৈচিত্র্য অনেক। অন্য বাদলের যেমন রূপান্তর হয়না, এই বাদলের তেমন ঘনঘন রূপান্তর হয়। কৃষ্ণবর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে ওঠে, আর অবশেষে সে উগ্র হয়ে উঠে বর্ষণ করে, এবং বর্ষণ উপরান্তে মাতা অর্থাৎ সত্য অর্থাৎ নীল গগন প্রস্ফুটিত হয়। গুরুদেব, আমি এই কৃষ্ণবর্ণ বাদলের পরিণতি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতার বিভিন্নরূপ প্রকাশকে লিপিবদ্ধ করতে চাই। আমার জন্য কি বিধান গুরুদেব?

গুরুদেব, আমার বিশ্বাস, এই কাব্য রচনা করতে করতে, আমি সেই ঘনকৃষ্ণবর্ণ বর্ষণমুখি বাদল, অর্থাৎ তমগুণের চরম অবস্থারও ধারনা লাভ করবো, আর সাথে সাথে মাতারও স্বরূপের ভাব

লাভ করবো। আর একবার তা যদি করতে সক্ষম হই, গুরুদেব সত্যে যাত্রার এক অনন্য পথের রচনা সম্ভবপর হয়ে যাবে। এতে আপনার বিধান কি?”

পিপলাদ মৃদু হেসে বললেন, “তুমি আমার কাছে স্থিত থেকে নিশ্চিন্তে তোমার কাব্য রচনা করো। এখানে স্থিত থাকলে, তোমার কনো অন্যচিন্তার অবকাশও থাকবেনা, আর সাথে সাথে তোমার কাব্যের প্রচুর অনুগামীও তুমি লাভ করে ফেলবে, যারা পরবর্তীতে তোমার নির্দেশিত সত্যযাত্রার মার্গকেও ধারণ করতে পারবে। তাই তেমন করাই হলো আমার বিধান”।

গুরুনির্দেশ লাভ করে, মার্কণ্ড পিপলাদের চরণতলে উপস্থিত হয়েই, তাঁর অর্জন করা মহাজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশকে মরলোকের সম্মুখে আনলেন। কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করলেন স্বয়ং তাঁর গুরু, মহর্ষি পিপলাদ। মার্কণ্ড মহাপুরাণ নাম হলো তার, আর তাতে রইল সম্পূর্ণ প্রকৃতিতত্ত্ব। প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় হয়েও কি ভাবে আত্মের নিরিখে তিনি সক্রিয় প্রকৃতি হয়ে উঠলেন পরব্রহ্ম থেকে, প্রকৃতি কি রূপে কাল ও এই বাহ্য প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন, এবং কেন রাখেন; এবং কি ভাবে সমস্ত আত্মকে তিনি তাঁদের স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য মহামায়া হয়ে বিরাজমান- এই ছিল গ্রন্থের বৃহত্তর অংশ।

বাকি অর্ধেকের এক তৃতীয়াংশ জুরে ছিল, সাধক কি উপায়ে নিজের অন্তরে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত করতে সক্ষম, সেই উপায়। এই উপাখ্যানের নামকরণ করেছিলেন মার্কণ্ড নবদুর্গা। এবং এই অধ্যায়ে, প্রকৃতি সাধকের হৃদয়ে প্রাথমিক ভাবে শৈলন্যায় হয়ে থাকে সেই থেকে বিবৃতি শুরু করেন মার্কণ্ড, এবং ক্রমশ প্রকৃতিকে প্রকাশিত হতে দেখান।

শৈল বেশ থেকে, ব্রহ্মন্যায় অব্যক্ত অচিন্ত্য প্রকাশে স্থিতা প্রকৃতিকে দেখান, এবং ক্রমশ অব্যক্ত মাতার সন্তানের দায়িত্বপালনের ভূমিকাকে দেখাতে থাকেন। সন্তানের হৃদয়কে শান্ত ও আলোড়িত করতে তিনি চন্দ্রঘণ্টা হন, সন্তানের সমস্ত শক্তি সম্পদের উৎসস্থল বেশে তিনি কুষ্মাণ্ডা, আবার সন্তানকে সুরক্ষা প্রদত্তা মাতাকে বিচাররূপী স্কন্ধের মাতা বেশে বিরাজিতা- এও দেখান মার্কণ্ড।

অতঃপরে, মাতা সন্তানের আমিত্বের দমনকারী কাত্যায়নী হয়ে ওঠেন, তো সন্তানের গুপ্ত মোহসমূহকে কালরাত্রি বেশে বিনাশী মাতাকে দেখিয়ে, মাতার সন্তানের হৃদয়ে যখন সৌম্যতার রূপ ধারণ করে মহাগৌরি, সেই অপার সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার বিবরণ প্রদান করে, অন্তে সন্তানের সমস্ত জ্ঞান আহরণের বাঁধা দূর করে মাতা যখন সিদ্ধিদাত্রী, সেই মহাপ্রকাশের বিবরণ প্রদান করেন।

সেই বিবরণ অতিমনোরম, অতীব ভক্তিজাগরণী, আর এই বিবরণ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করে কিভাবে পরাপ্রকৃতি সন্তানের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ মিটিয়ে, তাকে জ্ঞান আহরণের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন। অসম্ভব নিখুঁত এবং অত্যাশ্চর্য সেই বিবরণ পাঠ করে, আপ্লুত পিপলাদ অতি সহজেই বুঝলেন যে, এই কাব্য প্রকাশিত হলে আর্যরা মার্কণ্ডের প্রাণ হননের জন্য প্রগল হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে, মার্কণ্ডের এমন অদ্ভুত বিবরণে ভক্তিস্নাত হতে থাকলেন পিপলাদের সমস্ত শিষ্য। সেই দেখে, পিপলাদ কি করনিয়, সেই বিশয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, এবং অপেক্ষা করলেন, মার্কণ্ড মহাপুরাণের সমাপ্তির। অনুষ্ঠিত হলো সেই সমাপ্তি, আর মার্কণ্ড মহাপুরাণ জগতের শ্রেষ্ঠ মানবীয় কীর্তি রূপে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুতও হলো। তৃতীয় অধ্যায়ে, মার্কণ্ড মাতার শ্রেষ্ঠ সম্ভব বিবরণ প্রদান করলেন, আর সেই বিবরণ এমনই নিখুঁত ও অলৌকিক হলো যে তা বৌদ্ধধারারও কাছে এক মহাবিশ্ময় হতে চলেছিল।

প্রথম অধ্যায়ে, মার্কণ্ড সতী থেকে পার্বতীর উত্থানের ব্যখ্যা দ্বারা মাতার অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়ে ওঠার বিবরণ প্রদান করেছিলেন, নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠার বিবরণ প্রদান করে মুগ্ধ করেছিলেন সমস্ত পাঠককে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাতার নবদুর্গার বিবরণ প্রদান করে, কি ভাবে সাধকের হৃদয়কে সাধনার জন্য উপযোগী করে তোলেন মাতা, সেই বিবরণে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন।

আর তৃতীয় ও অন্তিম উপাখ্যানে, মার্কণ্ড বললেন অনবদ্য সাধনব্যখ্যা। তমগুণকে গ্রাস করে নিয়ে মাতা হন ধূমাবতী। আর অতঃপরে মাতা তমগুণকে ক্রমশ অধিক থেকে অধিক পরিশ্রম করাতে থাকেন এবং তাঁকে নিজের কমলা রূপ দ্বারা দেখান যে তিনিই সমস্ত সম্পদা প্রদত্তা, বগলা রূপ দ্বারা দেখান তিনিই সমস্ত বাকনিয়ন্তা।

ভেদাভেদ মুক্ত করনে তিনি মাতঙ্গী, তো ত্যাগ ও দায়িত্বপালনে নিজসত্ত্বাত্যাগী জননী রূপে তিনি ছিন্নমস্তা। মাতার প্রকাশে, ত্যাগে, নিঃস্বার্থভাবে, স্নেহের অসীম অনন্ত বিকাশকে লক্ষ্য করে তমগুণ হতবম্ব হয়ে যান, তো মাতা এবার ভুবনেশ্বরী রূপ ধারণ করে তমগুণকে দেখান যে তিনিই সমস্ত লোক এবং সমস্ত লোকের অধীশ্বরী একমাত্র অস্তিত্ব। সমস্ত জীবনপ্রবাহী ধারাও তাঁর থেকেই উৎস লাভ করে, মাতার সেই অপার রূপবতী ত্রিপুরাসুন্দরী ললিতা রূপের বিবরণে সকল পিপলাদ শিষ্য মার্কণ্ডের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হয়ে গেলেন চিরতরের জন্য।

কিন্তু মার্কণ্ডের বিবরণ তখনও থামেনা। মৃত্যুর কাণ্ডারি, এবং জন্মমৃত্যুর চালিকার আসনে তিনি তমগুণকে দেখান এবার, যেখানে মাতা হন ভৈরবী, আর এবার তমগুণ ঘনকৃষ্ণবর্ণ বাদলের ন্যায় হয়ে উঠতেও শুরু করে ভৈরব হয়ে ওঠেন। প্রবল পরিবর্তনের ফলে তমগুণ যায় মূর্ছা, আর যখন তাঁর মূর্ছাত্যাগ হয়, তখন দেখেন মাতা তাঁকে স্তনপ্রদানি তারা। উগ্রতা তখন তমগুণের চরমে, এবং সেই উগ্রতার উৎস হয়ে ওঠে ভক্তি।

সকল শ্রোতা গদগদ যখন, তখন দশমহাবিদ্যা অধ্যায়ের ইতি টানেন মার্কণ্ড মহাকালীকে সম্মুখে রেখে। তমগুণ তখন আর আত্মমুখী নয়। রজ ও সত্ত্বকে সম্যক ভাবে যেন গ্রাস করে নিয়েছে তমগুণ, আর সর্বগ্রাস করে সে এখন পূর্ণ ভৈরব। আর মাতা! মাতা এবার নিজের বাস্তবিক নিরাকার, মহাশূন্য, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য স্বরূপ মহাকালী। তিনি যেন অনন্ত রাত্রির গগন, আর সেই বাদলমুক্ত গগনের মাধ্যম হলেন ভৈরব স্বয়ং। ভৈরব যেন চূড়ান্ত উগ্রতায় সমস্ত বাদলকে বৃষ্টির বেশে প্লাবিত করে দিয়েছেন, লয় হয়ে গেছেন তিনি মহাকালীর চরণতলে, আর তাই সন্তানকে অন্তিম গন্তব্য, ব্রহ্মে লীন করে, মাতা আজ পুনরায় নিরাকার, কালনিয়ন্তা মহাকালী।

হিল্লোল উঠলো মার্কণ্ডের। পিপলাদ শিষ্যরা এখন মার্কণ্ড শিষ্য হয়ে গেছেন। দিকেদিকে মার্কণ্ডের অসম্ভব গুণের বাখান করে ফিরছেন তাঁরা। কনো কারুর কথনে নয়, সততই সেই প্রশংসাবাণী, কারণ তাঁরা যে মার্কণ্ডের মাতৃবন্দনায় আপ্লুত, ভক্তিতে গদগদ, আনন্দে আত্মহারা। প্রশ্ন এলো শিষ্যদের মার্কণ্ডের কাছে, "প্রভু, আত্মের তমগুণকে বাগে কি করে লাভ করবো? বাগে লাভ না করলে, তাঁকে ভক্ষণ করে মাতা কি করে ধূমাবতী হবেন? মাতা ধূমাবতী না হলে, কি করে তাঁতে লীন হবো? তাঁতে লীন না হলে, তাঁর মধ্যে অহংকারের নাশ না হলে, কি ভাবে সমস্ত জন্মমৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হবো?"

উত্তর এলো মার্কণ্ডের থেকে, "তন্ত্রধারার নির্মাণ হবে। আমাদের মোহ আমাদের পঞ্চভূতের এই শরীরের প্রতি। আকাশতত্ত্ব সেখানে মন হয়ে বিরাজমান হয়ে আমাদেরকে ভ্রমে আবদ্ধ করে রেখেছে; জলতত্ত্ব সেখানে বুদ্ধি হয়ে উপস্থিত থেকে আমাদের সর্বদা আসক্তি বিরক্তির মধ্যে বন্দি করে রেখেছে; প্রাণ রূপে পবন, দেহ রূপে ধরিত্রী, আকাশ অর্থাৎ মন এবং জল অর্থাৎ বুদ্ধির প্রভাবে প্রভাবিত অগ্নির কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অগ্নি শরীরের মধ্যে উর্জা বেশে স্থিত হয়ে মন বুদ্ধির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে, আহার নিদ্রা ও মৈথুনে সর্বদা বদ্ধ, আর তাই ধরিত্রী ও পবনও ত্রস্ত।

তন্ত্রের ধারা নির্মাণ হবে, মন, বুদ্ধি ও উর্জাকে অত্যাচার করে করে, পঞ্চভূতকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তবেই তমগুণ উগ্র হবে, তবেই গগনের বাদল ঘন কৃষ্ণবর্ণ হবে, আর তবেই বর্ষণ হবে। চলো, সেই তন্ত্রধারার নির্মাণ করবো আমরা, মাতার কাছে লীন হবো। গহন সমাধিতে মাতার মধ্যে চিরতরে লীন হয়ে জীবনমৃত্যুর চক্রকে ছেদন করবো"।

উপায় নিশ্চিত, তন্ত্রের নির্মাণ সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু এঁরই মধ্যে মার্কণ্ডের শিষ্যদের মার্কণ্ডকে নিয়ে উন্মাদনা আর্যদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো। মার্কণ্ড মাতৃবন্দনার এক অনবদ্য গীত রচনা করেছেন। সেই গীত এমন যা সমস্ত অহংকারকে চিরনিদ্রা প্রদানে তৎপর। আর্যদের ভিত ও ভিত্তি নড়ে উঠলো। এবার বোধহয় তাঁদের সমস্ত আচারানুষ্ঠানের ইতি হবে, আর তাদেরকে কেউ ভগবন মানবে না, আর কেউ তাঁদেরকে দান দেবেনা, এবার বোধহয় তাঁদের দুঃসময়ের

সূচনা হলো। ...এমন বিচার করতে, আর্য ব্রাহ্মণরা একত্রিত হয়ে, মার্কণ্ডকে দহন করার সিদ্ধান্ত নিলে, পিপলাদ মার্কণ্ডকে ও তাঁর শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন।

মাতৃবন্দনা করতে পেরে আনন্দিত, ও তন্ত্রের সূচনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকা প্রফুল্লিত মার্কণ্ড ও তাঁর শিষ্যরা পিপলাদের সম্মুখে উপস্থিত হলে, পিপলাদ বললেন, “মার্কণ্ড, তুমি তোমার শিষ্যদের নিয়ে এক্ষণে প্রস্থান করো। আর্যরা মার্কণ্ডকে জীবিত দহন করে দিতে উদ্যত। মার্কণ্ড মহাপুরাণের কারণে, আর্য ব্রাহ্মণদের অহংকারের আরাধনা আজ বন্ধ হবার যোগার, তাঁরা নিজেদের দুর্দিনকে দর্শন করে নিয়েছে। আর সেই দুর্দিনকে আটকানোর একটিই উপায় সন্ধান করেছে তাঁরা, আর তা হলো মার্কণ্ড তোমার মৃত্যু। তাই এক্ষণে পলায়ন করো”।

শিষ্যদের আনন্দের হাট মুহূর্তের মধ্যে দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়ে গেল। তাঁরা পিপলাদকে প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু প্রভু, মার্কণ্ড যে মহামুনি! তিনি যা নির্মাণ করেছেন, তা কালের গর্ভে এই ভাবে হারিয়ে যাবে? মাতার বিবরণ জগতে অপ্রকাশিতই থেকে যাবে?”

পিপলাদ মৃদু হেসে পলায়নে অসম্মত মার্কণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, “পুত্র মার্কণ্ড, ভঙ্গের গহন অরণ্যকে আর্যরা ভয় পায়। কেবল আর্য ব্রাহ্মণই নয়, আর্য ক্ষত্রিয়রাও সেই গহন অরণ্যে প্রবেশ করতে সদাভীত। তোমার সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে সেই অরণ্যে প্রবেশ করো মার্কণ্ড। সেই অরণ্যের দুটি খণ্ড আছে পুত্র, আর অযোধ্যা পর্বতমালা সেই দুই বনাঞ্চলকে পৃথক করে। সেই অযোধ্যা পর্বত অঞ্চলেই ভঙ্গের অসামান্য সুন্দরী এবং প্রকৃতির পূর্ণপবিত্র কন্যাদের নিবাস।

তাঁদেরও প্রয়োজন পরবে পুত্র তোমাদের তন্ত্রসাধনা করতে, কারণ তন্ত্র সাধনায় ভৈরবীর আবশ্যকতা বিপুল। সেখানে প্রস্থান করো, এবং তন্ত্রের স্থাপনা করো। সেখানেই বিস্তার করো তন্ত্রের, এবং সময় আসন্ন হলে, দিকে দিকে সেই তন্ত্রধারার বিস্তার নিশ্চয় করবে। এই অনবদ্য কৃত্য মানবজীবন থেকে হারিয়ে যেতে পারেনা। যাও মার্কণ্ড, প্রকৃতি তোমারই আগমনের জন্য ভঙ্গভূমির মহাপাবন ধামকে সুরক্ষিত রেখেছেন বনাঞ্চল ও হিংস্র পশুর পাহারা দ্বারা। সেখানে যাও, এবং তন্ত্রের স্থাপনা করো”।

মার্কণ্ড এবার পিপলাদের কথাতে আশ্বস্ত হলেন, এবং তন্ত্রের প্রগতিকে নিশ্চয় করতে, ১১জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ভঙ্গের বনাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আর্যরা মার্কণ্ডের সন্ধান করা বন্ধ করলেন না, কিন্তু দিকে দিকে সংবাদ নিতে নিতে যখন জানলেন তাঁদের আতঙ্কে মার্কণ্ড ভঙ্গের বনাঞ্চলে প্রবেশ করেছে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন যে, সেই বনে যখন মার্কণ্ড প্রবেশ করেছে, তখন আর সে জীবিত থাকবে না অধিকদিন।

কালীঘাট মহাশক্তিপীঠ

ভঙ্গে প্রবেশ করলেন মার্কণ্ড ও তাঁর একাদশ শিষ্য। গভীর অরণ্য সেখানে। এমনই সেই অরণ্য যেন দিনরাত্রির হিসাবই গরমিল হয়ে যায়। এমনই অন্ধকার যে, হিংস্র পশুদের কেবলই জ্বলজ্বলে নেত্রই দেখা যায়। তবে সমস্ত পশুর আচরণ যেন মার্কণ্ডের জন্য ভিন্ন। হিংস্র পশুদের আচরণ এমন যেন, তাঁরা সকলেই মার্কণ্ডের গৃহপালিত বাধ্য পশু। যেন সকলে মিলে, মার্কণ্ডের পথপ্রদর্শক।

সকল পশু মিলে যেন মার্কণ্ডকে অযোধ্যা পাহাড়ের পথ বলে দিতে থাকলো, আর সেই পথে যতই অগ্রসর হতে থাকলো মার্কণ্ড, ততই মাতার প্রেমকে, এবং সে প্রেমে মাতা কেমন সকল জীবের মধ্যে হৃদয় অয়ে বিরাজ করে, সর্বদা স্নেহপ্রদান করে করে মার্গ বলে দিচ্ছেন, এমনটাই অনুভব করেন মার্কণ্ড। আর সেই অনুভব যেমন যেমন বলতে থাকেন সকল একাদশ শিষ্যদের, তেমন তেমন সেই শিষ্যরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মার্কণ্ডকে দেখতে থাকেন।

কি অপরিসীম মাতৃপ্রেম এই মানুষটার! যেন ইনি নিজেকে ভুলেই গেছেন! যেন মাতার মধ্যে নিজেকে লীন করে ফেলেছেন! নিজের ব্যাথা বেদনা দেখতেই পাচ্ছেন না ইনি। সদাসর্বদা মাতার পরিশ্রম দেখতে পাচ্ছেন। নিজের প্রেমকে দেখতেই পাচ্ছেন না যেন। সর্বদা মাতারই প্রেমকে অবলোকন করে, মাতারই গুণকীর্তন গেয়ে চলেছেন!

আর এই আত্মবিসর্জনের মধ্যে কনো প্রকার নাট্য নেই। কি আশ্চর্যকর এই প্রেম! এমন প্রেম যেন, মাতা আর মার্কণ্ড দুই নয়ই, যেন একাকার হয়ে গেছেন! আর সর্বাধিক আশ্চর্যকর বিশয় এই যে, মার্কণ্ডের এই প্রবল প্রেমের কনো আভাসই নেই। সর্বক্ষণ মাতার গুণকীর্তন করে চলেছেন। মাঝে মাঝেই কেঁদে উঠে মাতার কাছে বলছেন, "মা, আমার উপর এমন কৃপা কেন তোর? কেন দায়িত্ব নিয়ে রেখে দিয়েছিস যেন আমি হারিয়ে না যাই, যেন আমি পরে না যাই, যেন আমি আঘাত না পাই! ... এই অপার প্রেম কেন মা?"

নিজেরই প্রশ্ন, নিজেরই উত্তর। নিজেই নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, "মা তুমি, তাই না! মা কি কিছু পাবার আশায় সন্তানকে স্নেহ করে? সন্তানকে স্নেহ করা যেন মায়ের কাছে নেশা! মায়ের কাছে জীবনের অর্থই সন্তানকে স্নেহ করা। আমিও কেমন মূর্খ দেখো। মায়ের প্রেমের কারণ জানতে চাইছি! সত্যই আমার আক্কেল একদমই হয়নি"।

শিষ্যরা বাকরুদ্ধ। কি বলবেন তাঁরা! যা দেখছেন, যা অনুভব করছেন, তা যে তাঁদের কাছে নিরুপম, কনো উপমাই নেই এই সমস্ত কিছুর। যেন মার্কণ্ডই মা, আর মা-ই মার্কণ্ড। যেন সমস্ত কিছু একাকার। নাহলে, স্বয়ং পরব্রহ্মময়ীর ভাব কি করে কেউ জানতে পারে! কি করে এমন নিশ্চিত হতে পারে কেউ যে, নিরাকার, লিঙ্গহীন ব্রহ্মের ভাব মাতার ন্যায়ই, পিতার ন্যায় নয়!

কি করে এত নিশ্চিত ভাবে কেউ বলত পারে যে, স্নেহ না করে মাতা যে থাকতেই পারেন না। সেই জন্যই তো তিনি ভগবান নন, ঈশ্বর। ভগবান হলে, সহায়তা তো করতেন, তবে ভক্তির অপেক্ষা করতেন নিশ্চয়ই; বলিদানের অপেক্ষা নিশ্চয়ই করতেন, কিন্তু মার্কণ্ড নিশ্চিত ব্রহ্ম হলেন মাতান্যায়। তাই তো তিনি ভক্তির অপেক্ষা করেন না, বলিদানের অপেক্ষা করেন না, কামনা বাসনা শ্রবণ করার প্রয়াসও করেন না; সহজাত ভাবেই স্নেহ করে চলেন।

না কামনা করলেও মার্গ প্রদর্শন করতেই থাকেন সম্মুখে সময় বা প্রকৃতি বেশে আবির্ভূতা হয়ে। না বাসনা রাখলেও যখন যা আবশ্যক, তা সম্মুখে আনতেই থাকেন। তাই তো তিনি ভক্তের আবাহনের উপর আশ্রিতা ভগবান নন, তিনি ঈশ্বর। তাই তো তিনি পিতা নন যে সন্তান পিতার

প্রতিষ্ঠায় অবদান প্রদানের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হলে, তবেই তিনি সন্তানকে স্নেহ করবেন, নাহলে সন্তানকে দিবারাত্র গাল দেবেন। তাই তো তিনি মাতা, যিনি সন্তানের কনো কামনা, আবাহন, আহ্বান, আশা, চিন্তার প্রতি আশ্রিতা না হয়ে, সদাসর্বদা মার্গ প্রদত্তা, সদাসর্বদা স্নেহপ্রদত্তা।

মার্কণ্ডের থেকে কেউ এই সমস্ত ব্যাখ্যা চান নি। স্বতঃই হৃদয়ের হরষে তিনি এই সমস্ত কিছু বলে চলেছেন, আর পথ চলার সমস্ত ব্যাথা ভুলে গিয়ে, মাতার স্নেহ অনুভব করতে করতে নিজের প্রেমাশ্রু পুছতে থাকছেন। মার্কণ্ডের শিষ্য হবার পূর্বে সকলেই পিপলাদের শিষ্য ছিলেন এই একাদশ শিষ্য। আর পিপলাদের মুখ থেকে প্রেমীর গুনাগুণ শ্রবণ করেছেন তাঁরা। আর আজ যেন তাঁরা গুনাগুণ শ্রবণ করছেন না, সম্মুখে একজন পূর্ণপ্রেমিক, যার প্রাণ তাঁর প্রেমে গত হয়েছে, তেমন একজনকে দেখে আপ্লুত।

অযোধ্যা পার্বত্য অঞ্চলে, একাদশ শিষ্য নিজের নিজের ভৈরবী লাভ করেছেন। সত্যই মহর্ষি পিপলাদ সঠিকই বলেছিলেন। ভঙ্গদেশের কন্যারা যেমন তনুগত ও মুখশ্রীগত ভাবে সুশ্রী, তেমনই তাঁরা মাতৃত্বগুণে পরিপূর্ণা। মার্কণ্ড মাতার যেই যেই গুণের কথা বলে মাতার প্রেমকীর্তন করছিলেন, যেন এই ভঙ্গীয় নারীদের সকলের মধ্যে সেই সমস্ত গুণ বর্তমান।

আর্য কন্যাও দেখেছেন তাঁরা, অনার্য কন্যাও দেখেছেন তাঁরা। সুশ্রী, হরিদ্রা ত্বকযুক্তা সুন্দরী তাঁরাও হন। কিন্তু মার্কণ্ডের কণ্ঠে যেই মাতৃগুণের বিবরণ শুনছেন শিষ্যরা, সেই নিরিখে যেন সমস্ত সেই আর্য ও অনার্য কন্যারা স্ত্রী হয়েও পিতা। আর এই ভঙ্গীয় নারীরা যেন সাখ্যাত ভগবতী। এঁদের সকলের মধ্যে মাতৃত্বের সমস্ত গুণ ঠাঁসা। যেন ভগবতী জগজ্জননির ন্যায়ই তাঁরা অকারণ স্নেহময়ী, অকারণ সন্তানসেবক। মহর্ষি পিপলাদ সঠিক বলেছিলেন, ভঙ্গীয় নারীর থেকে শ্রেয় তন্ত্রভৈরবী কেউ হতে পারেন না। এঁরা সাখ্যাত মাতৃমূর্তি যেন, অঙ্গরূপেও, হৃদয়ভাবেও।

কিন্তু প্রকৃতি যেন এখানে থামার ইঙ্গিত দিলেন না। মার্কণ্ড আত্মভোলার ন্যায় দক্ষিণের আরো অধিক ঘন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্যক ভঙ্গভূমি যেন অর্ধনারীশ্বর, যার বাম দিক

হলো স্ত্রীরূপ, আর সেই সেই স্ত্রীরূপের স্তনদেশ যেন অযোধ্যা পর্বত। মার্কণ্ড বলেন, সন্তানের সম্বন্ধ মাতার যোনির সাথে। সেখানেই সন্তান মাতার কনো এক নাড়ির সাথে এককালে আবদ্ধ ছিল, যখন সে মাতার গর্ভস্থ ছিল। গর্ভ থেকে মুক্ত হবার কালে সেই নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে এসেছে সন্তান।

তাই সন্তানকে যে যদি পুনরায় মায়ের মধ্যে লীন হতে হয়, তবে সেই যোনিতেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হয়তো অযোধ্যা পেরিয়ে মার্কণ্ড আরো দক্ষিণে এই ভঙ্গরূপ অর্ধনারীশ্বরের যোনিদেশ সন্ধানেই এগিয়ে চলেছেন! শিষ্য সুধালেন, “গুরুবর, আমরা কোথায় যাচ্ছি!”

মার্কণ্ড আনমনা হয়ে ছিলেন। দুইতিনবার প্রশ্ন করার পর অনুভব করলেন যেন কেউ তাঁকে কিছু সুধাচ্ছেন। তাই চতুর্থবার প্রশ্নটি আলাদা করে জেনে নিয়ে হেসে বললেন, “এই দেখ না, ভঙ্গদেশ যেন এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। অযোধ্যা তাঁর স্তন, আর সেই স্তনদেশ থেকে স্বর্ণ রেখার ন্যায় তাঁর অমৃত দুগ্ধরূপ নদী নির্গত হয়েছে। কিন্তু তন্ত্র মানে যে মাতার মধ্যে লীন হওয়া। আর মাতার সাথে সন্তানের সম্বন্ধ তো যোনি থেকে। তা এই দেখো শিষ্যরা, ভাগীরথীর ধারা। মহর্ষি কপিলের আশ্রম থেকে ভাগীরথী সাগরে মিশে যাচ্ছে, যেন ভঙ্গের অন্তরের যত সমস্ত মল, সমস্ত কিছুকে ভাগীরথী বহন করে সাগরে প্রস্রাবের ন্যায় বিসর্জন দিচ্ছে।

তবে কি জানো পুত্ররা, যোনির অবস্থান মূত্রদ্বারের অনেকটাই ঊর্ধ্বে। মাতা এই ভঙ্গদেশে আমাদের এনে দেখিয়েছেন যে এই ভঙ্গদেশের আকৃতিই কচ্ছপ পৃষ্ঠের ন্যায়, অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ ভঙ্গদেশই এক মহাতীর্থ। কিন্তু এঁর আকৃতি তো যেন অর্ধনারীশ্বরের। আর আমরা এক্ষণে সেই অর্ধনারীশ্বরের বামদিকে, অর্থাৎ যেই অঙ্গে মাতা পূর্ণাঙ্গ ভাবে মাতা, সেই দিকে দাঁড়িয়ে।

ভাগীরথী এঁর মলধৌতা, অর্থাৎ ভাগীরথীর ধারা এঁর যোনির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হয়েই যাত্রা করছে। পুত্ররা ভালো করে ভাগীরথীকে লক্ষ্য করো। দেখো যেন সে গতি পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যেন মাতার কৃপায়, ভাগীরথী দিশা পরিবর্তন করেনি। যেন মাতা ভাগীরথীর

মাধ্যমেই আমাকে মাতা ভঙ্গের পবিত্রধামের যোনিদেশের সাথে পরিচয় করাতে তৎপর। ... তাই পুত্ররা আগে চলো। সেই যোনিস্থলই আমাদের লক্ষ্যস্থল”।

শিষ্যরা ধারনা করেছিলেন, কিন্তু এতটা নিখুঁত ব্যাখ্যা লাভ করবেন, তা আশা করেন নি। ভাগীরথীর ধার ঘেঁসে তাই মার্কণ্ড, তাঁর একাদশ শিষ্য এবং তাঁদের একাদশ ভৈরবী পথ চলতে থাকলেন। আর পথ চলতে চলতে একস্থানে পৌঁছে মার্কণ্ড দাঁড়িয়ে পরলেন। শিষ্যরাও পিছনে ছিলেন। তাঁরাও হতবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে যে তাঁদের গুরুদেব আচমকা উধাও কি করে হয়ে গেলেন! আর তেমন ভেবেই সম্মুখে হন্তদন্ত করে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, এক সুদীর্ঘ, প্রায় ৩০ গজের মত স্থান অন্য সমস্ত ভূমির তলের থেকে প্রায় দুই থেকে তিন গজ নিম্নে চলে গেছে। আর তা অত্যন্ত বিচিত্র আকারের স্থান।

হ্যাঁ কিছুটা যোনির আকারেরই স্থান। নজর গেল ভৈরবীদের তাঁদের গুরুদেব মার্কণ্ডের উপর। উনি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে গীত গাইছেন, আর লম্ফ করছেন। উনি যা বলছেন তা হলে এই যে, “ধরণীতে কালীর যোনি পেয়ে গেছি। কালীর ঘাট এটা। কালীঘাট। দেখো দেখো পুত্ররা, নদীর তলদেশে এত বৃহৎ পাথর দেখেছ কখনো? এক গজের পাথর! ... এ যে পাথর নয়, স্বয়ং কালীর প্রতিনিধি। মূর্তি নির্মাণ হবে মায়ের এর থেকে”।

গুরু রূপে মহর্ষি পিপলাদকেও পেয়েছেন এই শিষ্যরা, আর তাঁরই নির্দেশ এবং প্রেরণায় আজ তাঁরা মার্কণ্ডের শিষ্য। কিন্তু মার্কণ্ডের ন্যায় গুরু যেন তাঁদের সকলের কল্পনার অতীত। ইনার মধ্যে গুরুর গাম্ভীর্য নেই বললেই চলে। জগন্মাতার বিবরণ দেবার কালে ভাবে বিভোর থাকেন, অন্যসময়ে জগন্মাতারই অনুসন্ধান করতে যেন ব্যস্ত থাকেন, আর সেই কালে ইনি যেন শিশুরও অধম। কেবলই যখন কনো জীবনতত্ত্বের বিবরণ প্রদান করেন, তখনই যা একটু গম্ভীর, তাও শিষ্যদের শাসন করার যেন কনো ধারণাই নেই ইনার।

মহর্ষি পিপলাদ তাঁদেরকে যখন মার্কণ্ডের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে ইনার আচরণ বিচিত্র হবে, শিশুর ন্যায় হবে, আবার পিশাচের ন্যায় হবে, কারণ

ইনি সাখ্যাত পরব্রহ্মের অবতার। তিনি বলেছিলেন, পুরুষ বেশে যেন তাঁরা না দেখে মার্কণ্ডকে, কারণ অন্তরে সম্পূর্ণ ভাবে মার্কণ্ড হলেন মাতা, জগন্মাতা। আর বলেছিলেন, মার্কণ্ড শিশুর ন্যায় থাকবে, আর তাঁর আচরণই হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। তবে কনো মুহূর্তে যেন মার্কণ্ডকে উত্তপ্ত করার প্রয়াস না করে শিষ্যরা।

হ্যাঁ, অবতার দেহ ধারণ করে আছেন, তাই পরমেশ্বরীর স্বভাবই এঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ হবে। জগন্মাতা কনো ভগবান নন, তিনি ঈশ্বর, যিনি সমস্ত ভগবানের উর্দ্ধে, তিনি সাখ্যাত নিয়তি, যার কাছে ত্রিদেবও বশীভূত থাকেন সর্বক্ষণ, স্বয়ং পরমাত্মও তাঁর গুণগ্রাহী। কিন্তু মাতার কাছে ঈশ্বরী ভাব প্রিয় নয়, তাঁর কাছে মাতার ভাবই প্রিয়। তিনি তাই ঈশ্বরী হয়ে বিরাজমান থাকতে অপছন্দ করেন, বরং সকলের হৃদয়ের সন্নিকটে মাতা হয়ে থাকতেই পছন্দ করেন।

তাই মার্কণ্ডও তেমনই মাতা হয়েই থাকবেন। অকারণ সন্তানকে স্নেহ করা; সন্তানের থেকে সামান্য কিছুও আশা না রাখা; নিজেকে নিঃশেষ করে, সন্তানের ভার গ্রহণ করতে থাকা; এই হলো মাতার ভাব। মাতা পিতার ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী হন না, পিতার ন্যায় প্রতিষ্ঠা প্রেমীও হন না। তাই পিতার ন্যায় সন্তানের থেকে প্রতিষ্ঠা লাভের আশাও রাখেন না মাতা; সন্তানের থেকে কনো নামযশ প্রতিপত্তি, কিচ্ছুর আশা রাখেন না মাতা। মাতা কেবলই সন্তানের সুখশান্তির চিন্তায় রত। সেই সুখশান্তির চিন্তার কারণে যদি মাতাকে ভিক্ষুকও হতে হয়, তাও মাতার কাছে আনন্দের বিশয় হয়।

মহর্ষি পিপলাদ আরো বলেছিলেন যে, মাতার বিশেষত্ব অত্যন্ত সুপ্ত, কারণ মাতা কখনোই প্রচারের আলোকে নিজেকে রাখেন না। নিঃস্বার্থতাই মাতার প্রাথমিক লক্ষণ, নিরাকাঙ্ক্ষাই মাতার দ্বিতীয় লক্ষণ, এবং দুশ্চিন্তারত থাকাই মাতার তৃতীয় লক্ষণ। যেই মাতা নিজের স্বার্থ চিন্তা করতে থাকেন, নিজের প্রতিষ্ঠা, নিজের নামযশ এর চিন্তা করতে থাকেন, এবং সন্তানকে সেই নামযশ লাভের জন্য সর্বদা উৎপীড়ন করতে থাকেন, তিনি মাতার নামে কলঙ্ক, আর জগন্মাতা কখনো মাতার নামে কলঙ্ক হতে পারেন না।

যেই মাতা সন্তানের সুখশান্তির থেকে নিজের সখসৌখিনতা বা প্রত্যাশার প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তিনি অবশ্যই কুমাতা, আর জগন্মাতা কখনোই কুমাতা হতে পারেন না। যেই মাতা সন্তানের সুরক্ষা, সন্তানের জীবনচিন্তা, সন্তানের জীবন আদর্শ, সন্তানের জীবনদর্শন নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না থেকে, সন্তানকে দর্শনচিন্তা, আদর্শস্থাপন বা জীবনচিন্তা থেকে বিমুখ করে রাখতে ব্যস্ত থাকেন, সেই মাতা অন্য কারুকে নন, স্বয়ং জগন্মাতাকে নিরাশ করছেন, কারণ যেই সন্তানের মাতার আসনে তিনি স্থিতা, সেই সন্তান যে আসলে জগন্মাতারই সন্তান, ভৌতিক জগতের সকল মাতারা যে জগন্মাতার সন্তানেরই পালিতা মাতা।

এত কথা বলে মহর্ষি পিপলাদ নিজের শিষ্যদের বলেছিলেন, "পুত্ররা, মার্কণ্ড সেই জগন্মাতারই মানবীয় অবতার। তাই জগন্মাতার সমস্ত চিত্র তাঁর মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে। সর্বদা তিনি তোমাদের দর্শনচিন্তা, জীবনচিন্তা এবং আদর্শচিন্তা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন; সর্বদা তোমাদের সুখশান্তি নিয়ে চিন্তিত থাকবে; স্বয়ং নিদ্রাত্যাগ করে, আহার ত্যাগ করে, সর্বস্ব ত্যাগ করে, তোমাদের জন্য চিন্তিত থাকবেন। তাই তোমাদের দায়িত্ব থাকবে যাতে, তাঁর খেয়াল তোমরা রাখো।

তিনি মাতা। মাতা নিজের খেয়াল রাখবেন না। মাতা তিনি। তাই পিতার মত সন্তানকে পালন না করতে পারলে, সন্তানকে কারুর কাছে বিক্রয় করবেন না, স্বয়ংকে বিক্রয় করে দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তোমাদের এই বিশয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি যদি মাতা হন, তাহলে তোমরাও সন্তান। মাতা যদি নিজের সর্বস্ব কিছু বিসর্জন দিয়ে সন্তানের লালনপালন করেন, তাহলে সন্তানও নিজের সর্বস্ব দিয়ে, মাতার জীবনদর্শনকে নিজেদের চরিত্রে ও সর্বত্রে স্থাপন করবে।

আর সব শেষে, তিনি মাতা হয়ে থাকতেই ভালোবাসেন, ঈশ্বরী হয়ে, আরাধ্যার আসনে স্থিতা হতে তিনি পছন্দই করেন না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর উপেক্ষা করবে, তাঁর সহজ ব্যবহারকে মাথায় রেখে। ভুলে যেওনা তিনি স্বয়ং নিয়তি, স্বয়ং প্রকৃতি, স্বয়ং কালনিয়ন্তা কালী। তাই তাঁকে ভুলেও ক্রুদ্ধ করো না। প্রকৃতি ক্ষিপ্ত হলে, পঞ্চভূতের নাশ হয়; কালী রুষ্ট হলে

ত্রিগুণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়; কিন্তু নিয়তি রুষ্ট হলে ত্রিগুণ অর্থাৎ ত্রিদেবকে শবে পরিণীত হতেই হয়, আর তা হতে হওয়ার অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড পিশাচে পরিণত হয়ে, জীবনচক্রের থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়, কিন্তু জীবন থেকে মুক্ত হয়না। তাই এমন দুঃসাহস কখনো দেখিও না"।

যখন মহর্ষি এই সমস্ত কথা বলেছিলেন, তখন শিষ্যরা সমস্তই শুনেছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু সেই কথনসমূহের বিচার করেন নি। কিন্তু এক্ষণে মার্কণ্ডের আচরণ তাঁদেরকে বাধ্য করেছে সেই সমস্ত কথার স্মৃতিচারণ করতে। মহর্ষি পিপলাদের সমস্ত কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে মার্কণ্ডের সাথে। কিন্তু শিষ্যদের মনে এমন কথার উদয় হলেও, মার্কণ্ডের যেন সেই দিকে দৃষ্টি দেবার সময়ই নয় এটি। তিনি মাতৃযোনি লাভ করার আনন্দে বিভোর।

শিষ্যরা সকলে মিলে দুই হাত সমান মাতার মূর্তি নির্মাণ করলেন সেই নিম্ন যোনিস্থল থেকে লাভ করা প্রস্তর থেকে। আর সেই প্রস্তরের বাকি অংশ থেকেই মাতৃমূর্তির গহনা নির্মাণ করলেন। আর সেই সমস্ত কৃত্যের সমাপ্তি হলে, মার্কণ্ড মাতার মূর্তির স্থাপনা করলেন, আর মহাশক্তিপিঠ কালীঘাটের স্থাপনা করলেন তিনি।

মহাকালীর মূর্তি যেন মূর্তি নয়, যেন সাখ্যাত মাতার প্রতিনিধি। প্রকৃতি, সময় সমস্ত কিছু যেন মার্কণ্ড তথা সকল শিষ্য ও ভৈরবীদের তন্ত্রসাধনাকে সিদ্ধ করতে তৎপর হয়ে রইল। মার্কণ্ড সকল শিষ্য ও ভৈরবীদের তন্ত্রের গুহ্য কথা বলে, তন্ত্রের অভ্যাস করাতে থাকলেন। সত্ত্ব ও রজ গুণকে পশমিত করতে শেখালেন, আর অবশিষ্ট আত্মগুণ, তমের শান্তিভঙ্গ করানো শেখালেন।

বহুপ্রকার ভাবে নিদ্রা, আহার, তথা বিলাসিতা অর্থাৎ মৈথুনের ভাবকে পশমিত করা হলে, তমের সম্মুখে না এসে উপায় রইল না। আর যেই ক্ষণে তমের আত্মপ্রকাশ হলো, তক্ষণে মাতার গুণগানে তমগুণকে অতিষ্ঠ করা শুরু করলেন সকলে মার্কণ্ডের শিক্ষানুসারে।

মাতা স্বয়ং পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের নির্বিকল্প ভাবকে, অকর্তা ভাবকে সহ্য করতে না পেরে, নিজেকে ভ্রম বশত মাতার থেকে পৃথক জ্ঞান করে, স্বয়ংকে প্রকাশ করা স্বয়ম্ভু সে, এই বলে উত্তপ্ত করা

শুরু করে, সমানে আরো আরো অধিক ভাবে তমগুণের কাছে এই বার্তা প্রকাশ করে যে, সেও স্বরূপে ব্রহ্ম হয়েও, স্বরূপ ভুলে, সে আজ তুচ্ছ। সে আজ নিয়তির দাশ। সে একাকী আত্মরূপেও নিয়তির দাশ, আর সমস্ত ব্রহ্মাণুর সমষ্টিরূপ পরমাত্মও নিয়তির অনুরূপ ভাবে দাশ।

সেই বাখানে তমগুণ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ভগবান হবার মদ যেন চূর্ণবিচূর্ণ হতে শুরু করে তাঁর, আর যতই তেমন হয়, ততই যেন তাঁর ক্রোধ, হিংসা সকল আবেগ ভয় ও শঙ্কার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, ঈর্ষায় পরিণত হতে শুরু করে। ক্রমে, নিজের ভগবান হয়ে বিরাজ করার মদ ও লালসার মোহ, আত্মকে উত্তপ্ত করতে শুরু করে দেয়, এবং সেই সমস্ত উত্তাপের প্রতিক্রিয়ারূপে ঘৃণা ও দ্বেষরূপী রাক্ষুসে দন্ত বিকশিত হতে শুরু করে।

তন্ত্রশিষ্যরা আত্মের এই তামসিক অবস্থায় তাঁকে শান্তি দেয়না, তাঁর উগ্রতাকে পশমিত হতে দেয়না। বরং ক্রমশ তখন বলতে থাকে- হে আত্ম, তুমি কাল ঠিকই, কিন্তু তোমার স্বতন্ত্রতা কোথায়? কালীর গ্রাস তুমি, কালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুমি, দাশ তুমি।

অধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এই মদবিদারক শব্দের প্রভাবে। তাই তন্ত্র শিষ্যরা পুনরায় বলেন- হে আত্ম, তুমি সকল জীবের সূত্রধর ঠিকই, কিন্তু সেখানেও বা স্বতন্ত্র কোথায় তুমি? সেখানেও নিয়তি তোমার সম্মুখে প্রকৃতি বেশে আবির্ভূতা হয়ে, তোমাকে এবং সকল আত্মকে বেঁধে রেখে, কালচক্রের ঘূর্ণনে ঘূর্ণায়মান। এঁর পরেও নিজেকে ভগবান বলতে তোমার লজ্জা করেনা! স্বরূপে তুমিও ব্রহ্ম, কিন্তু স্বরূপকে ভ্রমে ত্যাগ করে, তুমি আজকে এক নিতান্ত দাস! এতই করুন তোমার পরিণতি!

আত্মের ক্রোধ এবার ভয়ানক হয়ে উঠলে, তান্ত্রিক বলতে থাকেন – আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না! ... বেশ তাহলে এই দেখো অর্ধদগ্ধ শবদেহ। এই শবদেহকে আসনরূপে ধারণ করে, ধ্যান করে দেখো। দেখো ভালো করে। এঁর অন্তরে জীবন তো তুমি ধারণ করে উপস্থাপন করছিলে,

কিন্তু সেই জীবনকে চালিয়েছিল কে? দেখে নাও, মিথ্যা বলছি কিনা। নিজেই দেখে নাও। ধ্যান করো, এঁর জীবনকে কে বেঁচেছে, আর কে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, দেখে নাও।

নিজেকে ভগবান প্রমানে ব্যকুল আত্ম অর্ধদগ্ধ শবদেহকেই আসন রূপে ধারণ করলে, অসামান্য ক্রোধই হয়ে ওঠে তাঁর একাগ্রতার আধার। আর সেই একাগ্রতার মধ্যে মার্কণ্ড বলতে থাকলেন দশমহাবিদ্যার কথা। সাধকের আত্ম সেই সমস্ত কথাকে হৃদয় দর্পণে দেখতে থাকলেন, এবং অনুভব করতে থাকলেন যে, তাঁর বচন শক্তি বগলার কারণে স্থিত, মার্জিত ও দিশাপ্রদত্ত; তাঁর সম্পদ সমস্ত কমলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ধ্যান ভঙ্গ হলো অসহজতার কারণে। নিজের করা কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার কারণে ধনাদি লাভ করেন নি তিনি। ইচ্ছা তো তাঁর অনেক কিছু ছিল, কিন্তু লাভ করেছেন সামান্য বা অত্যন্ত অধিক। নিয়ন্তা স্বয়ং নিয়তি, তাঁর কল্পনা কেবলই তাঁকে অসত্য বলে, যেই কর্তা তিনি নন, সেই কর্তা সাজিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। ব্যথিত হলেন, চিন্তিত হলেন, আগ্রহী হলেন, সম্মুখের সমস্ত কিছু দেখতে।

পুনরায় ধ্যনস্থ হলেন, তো মার্কণ্ড মাতঙ্গীর কথা বললেন। সাধকের আত্ম দেখতে থাকলেন, কি ভাবে সহস্র ভেদাভেদ করে করে, অন্যকে তুচ্ছ, আর নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। পুনরায় ধ্যান ভঙ্গ হলো। অন্তরে একটিই ভাব, ছলনা। সমস্ত জীবন নিজের সাথে নিজে ছলনা করে এসেছেন তিনি। যেই ভেদ নেই, সেই ভেদকে সত্যরূপে মেনে এসেছেন। মানুষে মানুষে ভেদ করে গেছেন, পুরুষে স্ত্রীতে ভেদ করে গেছেন, আহারের মধ্যেও ভেদ করে গেছেন। ঘৃণার উদয় হলো সাধকের আত্মের, তবে এবার নিজের প্রতি সেই ঘৃণা।

জেদি হয়ে উঠলেন, ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠবেন। বমন আহার করলেন, মূত্র দ্বারা তৃষ্ণা মেটালেন। ভৈরবীকে আত্মরূপজ্ঞানে আলিঙ্গন করে, স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ মিটিয়ে ধ্যনস্থ হলেন।

নিয়তির মাতৃত্বকে পরিদর্শন করলেন। স্বয়ং পরব্রহ্ম হয়েও, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও না করে, নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, ছিন্নমস্তা হয়ে, তাঁকে সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করে গেছেন নিয়তি। ধ্যান ভঙ্গ হলো আপ্লুত ভাবের কারণে। ক্রন্দনে ফেটে পরলেন সাধক। যিনি সর্বস্বকিছু, তাও যিনি সেই প্রভুত্ব স্থাপিত না রেখে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে জননী যিনি, তাঁর এই করুণাকে অদেখা করে, নিজেকে ভগবান আর তাঁকে সেই ভগবানের দাসী রূপে স্থাপন করে এসেছে সে এতকাল!

কৌতূহল জন্ম নিলো। জীবনের মধ্যে তো তাঁকে দেখলাম। মৃত্যুর পরে কি হয়? মৃত্যুর পরেও কি তিনি মাতা রূপে পালন করে চলেন সর্বক্ষণ? পুনরায় ধ্যানস্থ হলেন, এবার ভৈরবীর সাথে সঙ্গমে স্থিত হয়ে, অথচ সঙ্গমকে অকৃতকার্য করে। নিজের সম্ভোগের লালসাকে উৎপন্ন করেও, তাকে অতৃপ্তি প্রদান করাই তাঁর ভাব। নিজেকে দণ্ড দেওয়াই তাঁর এখনের একাগ্রতার উপায়।

ধ্যনস্থ হলে, দেখলেন মৃত্যুর মুহূর্তের নির্মাতাই স্বয়ং ভৈরবী, আর মৃত্যুর উদ্দেশ্য যাত্রাপরিবর্তন, আর যাত্রাপরিবর্তনের উদ্দেশ্য সত্যলাভের উপায়সন্ধান। পুরবের দেহে সত্যলাভ আর সম্ভব নয়, তাই পূর্বের দেহের সমস্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, মৃত্যু, দেহত্যাগ, তাও মাতা ভৈরবী নির্ধারিত উপায় মার্গ অনুসরণ করে, এবং মাতা ভৈরবী নির্মিত ক্ষণে।

ধ্যানভঙ্গ হলো, একটিই কথা মুখনিঃসৃত হলো, আত্ম সদা দাসঃ, অর্থাৎ আমি সদা দাসই ছিলাম। উৎসাহ জাগলো, মৃত্যুর পরে কি হয়? কোথায় নিয়ে যায় মাতা। জন্মজন্মান্তর জানার ব্যকুলতা। তাই পাঁচটি জীবের মুণ্ডের আসন করে, তাঁর উপর স্থিত হয়ে ধ্যান প্রয়াস করলেন। মহাধ্যান হলো। উর্ধ্বের নিম্নের সমস্ত ৭ লোকের দর্শন হলো। দেহের মধ্যেই তা কুণ্ডলিনীর মধ্যে স্থিত, তাও দেখা গেল।

পুনরায় ধ্যান, তবে এবার মাতাকে দেখার ভাব নিয়ে ধ্যান। বহু বিফল প্রয়াসের পর, মাতার সর্বস্ব প্রদত্তা ললিতা রূপের দর্শনলাভ হলো। কিন্তু এরপর যা হলো, তা হলো প্রবল

সাধনপ্রয়াসের অনাচারের কারণে, দেহের ক্ষয় হলো। কৃশ হয়েছে শরীর, দুর্বলও হয়েছে বিস্তর। মূর্ছা যেতে থাকলো সাধকেরা। কিন্তু এই মূর্ছাও যেন মাতারই এক লীলা।

মূর্ছাও যেন এক ধ্যান, এক মহাধ্যান। আর সেই ধ্যনস্থ অবস্থায়, মাতার নিরাকার শূন্যকায় মহাকালীরূপের তাণ্ডব দেখলেন সাধক ও সমর্পিত হলেন। অবশেষে সেই ধ্যনেই দেখলেন, মাতা তারাবেশে নিজের স্তনদান করে, জীবনদান করলেন তাঁদেরকে। জীবন মাতা, মৃত্যু মাতা, জন্ম মাতা, পুনর্জন্ম মাতা, সর্বস্ব কিছু মাতা। ত্যাগ মাতা, বিদ্যা, সম্পদ মাতা, ব্রহ্মাণ্ড মাতা, সমস্ত কিছুই মাতা।

এবার আর মূর্ছা গেলেন না, সমাধিস্থ হলেন। সিদ্ধ হলেন। যেন ধ্যানে নয়, বাস্তবেই মাতা স্তনদান করে জীবনে ফিরিয়ে আনলেন, না হলে স্বাস্থ্যের উন্নতি কি করে হলো? জীবন কি করে ফিরে এলো? মার্কণ্ডের একাদশ শিষ্য সিদ্ধ হলেন, আর মার্কণ্ড!

তাঁর কার্য সিদ্ধ হয়েছে। তন্ত্রের স্থাপনা করে দিয়েছেন। এবার তিনি মহাসমাধি গ্রহণ করলেন। তাঁর শিষ্যরা ও ভৈরবীরা দেখলেন, কালীঘাটের মহাকালী যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। জীবন্ত তিনি। প্রাণবন্ত তিনি। সজীব তিনি।

ক্রন্দন এলো তাঁর অবতারের জীবন সম্পন্ন হয়ে গেল তাই। অপার প্রেমলাভের ইতি হলো। কিন্তু সত্যই কি তাই? মা'র কাণ্ড তো সবে শুরু হলো। দিব্যআদেশ সকলের হৃদয়পটে একত্রে অনুভূত হলো। মা বললেন – আমার এই পূর্ণ অবয়ব নিয়ে আমি কি করবো পুত্ররা? আমার অঙ্গকে খণ্ডিত করে করে, দিকে দিকে চলে যাও। সর্বত্র মার্কণ্ডের তন্ত্রসাধন ধারার প্রতিষ্ঠা করো।

আদেশ লাভ করে, শিষ্যরা মাতার মূর্তিকে খণ্ডিত করা শুরু করলেন। কিন্তু একি? মাতার জিহ্বা কাটেন তো লহু নির্গত হয়! মাতার মাথার খুলি কাটেন তো লহু নির্গত হয়। রক্তাক্ত মা। ... শিষ্যরা ক্রন্দনে ফেটে পরে বললেন- না মা, এমন পীড়া তোমায় দিতে পারবো না! ... এ যে অসম্ভব পীড়া!

মাতা পুনরায় দিব্যনির্দেশ দিলেন সকলের হৃদয়পটে- আমার এই রক্তাক্ত অঙ্গগুলি বিভিন্ন স্থানে স্থানে নিয়ে যাও পুত্ররা। এঁদের রক্তাক্ত রূপ প্রমাণ দেবে যে আমি জীবন্ত। এই রক্তাক্ত অঙ্গগুলিকে স্থাপন করো সেখানের কনো না কনো প্রস্তরে, আর তাতে সাধন করে, সিদ্ধ হও, স্থাপন করো সেই শক্তিপিঠকে। আমার পীড়ার চিন্তা করো না। আমার সন্তানরা যেইভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যেই ভাবে আত্মের আরাধনায় মত্ত, যেই ভাবেই আত্মের ত্রিগুণের আরাধনায় অহংকারের বিস্তারে বিব্রত, তা যে আমার কাছে অধিক পীড়ার। আমার এই লহু-আবৃত অঙ্গই আমার সকল সন্তানের কাছে এই প্রমাণ দেবে যে, তাঁদের জননী তাঁদের অপার প্রেম করে। যাও, আদেশের পালন করো।

তন্ত্রপ্রচার

অশ্রুসিক্ত হয়েও, মাতার আদেশ পালন করে, মাতার লহুমিশ্রিত অঙ্গাদি নিয়ে দিকে দিকে যেতে থাকলেন তান্ত্রিক ও ভৈরবীরা। আর্যরা ভঙ্গের বাইরে কঠিন দৃষ্টি রেখে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখে আত্মপ্রচারে উন্মত্ত। ব্রাহ্মণজাতির আসনে তন্ত্রের ছাপ রাখতে সচেষ্ট হলে, মা সকল মার্কণ্ডশিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন কিছু দিব্যবাণী।

তিনি বললেন, "পুত্ররা, আমি জগন্মাতা, জন্ম আমি স্বেচ্ছায় কারুকে দিইনি, কারণ আমি সেই মা নই যে সন্তানকে নিজের থেকে পৃথক করে আনন্দ পায়। ব্রহ্মাণুরা আমার গুণসন্ধান করার জন্য, আমাকে অর্থাৎ নিজেদের স্বরূপ, অর্থাৎ শূন্যতাকে ত্যাগ করে, কর্তা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের সত্য তো আমিই, আর তাই আমি সকলের জননী। আমি জননী, তাই সময় বা কালের ন্যায় সূক্ষ্ম বেশে, এবং প্রকৃতির ন্যায় স্থূল বেশে, আমি সকলের মধ্যে মহাসমন্বয় স্থাপন করে, সকলের পালন করি।

কিন্তু এঁরই মধ্যে তোমাদের আর্য ব্রাহ্মণরা সেই ব্রহ্মাণুগণ, যারা প্রকৃতি ও সময়কে উল্লঙ্ঘন করেন এবং তেমন করারই সিদ্ধান্ত দেন। এঁরা প্রকৃতি ও সময়ের উপর ভরসা করেন না; সময়

ও প্রকৃতি এঁদের সম্মুখে যেই সিদ্ধান্তকে উপস্থাপন করেন, এঁরা কেবল তাঁর অপেক্ষাই করেন না, বরং এঁরা নিজেদের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার উপর আশ্রিত নিজেদের আত্মের সিদ্ধান্তকেই সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করেন, এবং তাই জগন্মাতাকে এঁরা উপেক্ষা করেন।

তাই পুত্ররা, আর্য ব্রাহ্মণরা আমার সন্তান হলেও, আমি তাঁদেরকে সন্তানরূপে মান্যতা প্রদান করিনা, কারণ তাঁরা আমাকে মাতারূপে মান্যতা প্রদান করেনা। কাল আমি, আর কালের নিয়ন্ত্রক কালীও আমি। তাই এক না এক সময়ে, ব্রাহ্মণ জাতিকে আমি এই ভঙ্গভূমিতেই, যার নাম তখন বঙ্গভূমি হবে, সেই খানে স্থিত হয়েই উৎখাত করে দেব।

হ্যাঁ জানি আমি, এই ক্রিয়া করার আগেই, ব্রাহ্মণত্ব মানসিকতা চারিদিকে ছড়িয়ে পরবে। সাগর পারিদিয়ে এই মানসিকতা বহুকালই মিশরে ও রোমে ছড়িয়ে পরেছে, আর তা আবারও সাগরলঙ্ঘন করে পশ্চিমতম দেশে ছড়িয়ে পরবে। কিন্তু তাও ব্রাহ্মণ আমার সন্তান, তাই এই সময়ের সুযোগ তাঁদের দিতেই হবে আমাকে, যাতে তাঁরা নিজেদের উন্নত করতে সক্ষম হয়। জানি এতে তাঁদের কনো লাভ হবেনা। তাঁরা যেমন আত্মমদাচ্ছন্ন, তেমনই থাকবে। তাও মা আমি, তাই সুযোগ আমাকে দিতেই হবে।

যখন সমস্ত সুযোগের অবসান ঘটাবে তাঁরা, তখন এই ভঙ্গদেশে দাঁড়িয়েই, যাকে তখন বঙ্গদেশ বলে চিহ্নিত করা হবে, সেখানে এই ব্রাহ্মণ জাতিকে নির্দয়, অত্যাচারী এবং নৃশংস স্বার্থপর ঘৃণ্যজাতি বলে আমিই প্রমাণ করবো। কিন্তু তাতেও ব্রাহ্মণত্বের নাশ হবেনা। আর্য ব্রাহ্মণত্ব এক জাতি নয় পুত্ররা, এক মানসিকতা।

এই মানসিকতা নিজেকে সর্বেসর্বা জ্ঞান করার মানসিকতা। সময়, প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করার মানসিকতা এটি। আর তাই বঙ্গভূমি থেকে জাত ব্রাহ্মণ ত্যাজ্য ভাবের সঞ্চার অনেক স্থানে হলেও, অনেক স্থানে তা তখনও থেকে যাবে। আর অবশেষে, বঙ্গের এই মানসিকতা গ্রহণ করা ব্যক্তিরা, যারা মূলত আর্য অনুপ্রবেশেই এই পুণ্যতীর্থে প্রকাশিত হবে, তাঁরা আমারই এক

অবতারের নামযশকে মাধ্যম করে, বৈষ্ণব হয়ে বিরাজ করবে, আর পুনরায় শোষণ করবে আমার অন্য সন্তানদের।

তাই পুত্ররা, আর্যভূমিতে তন্ত্রের প্রচার করার পূর্বে, এই ভঙ্গভূমিতে এবং উত্তরের অঙ্গভুমি ও প্রাগজ্যোতিষকে উদ্ভাসিত করে তন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তলো আমার সন্তানদের মধ্যে। অতঃপরেই আর্যভূমিতে অনুপ্রবেশ করো। স্মরণ রেখো, সেখানে অনুপ্রবেশ তোমাদের করতেই হবে, আর করলেই আর্যরা সরাসরি মার্কণ্ড মহাপুরাণকে বিনাশ করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। পুত্ররা, মার্কণ্ডের কীর্তির নাশ হবার পূর্বেই, সমস্ত উত্তরপূর্ব জম্বুদ্বীপে, অর্থাৎ, ভঙ্গে, অঙ্গে, প্রাগজ্যোতিষে, কলিঙ্গে ও মগধে মার্কণ্ডের কথাকে এমন ভাবেই প্রচার করে দাও যাতে, আর্যদের শতপ্রয়াসেও এই ভূমি থেকে মার্কণ্ডের গাঁথার সমাপ্তি না হয়"।

মার্কণ্ড শিষ্য বশিষ্ঠ উদ্বেগের সাথে বললেন, "মা, তোমার সন্তানদের শোষণ করবে এই ব্রাহ্মণ মানসিকতা, তা জেনেও, তুমি ব্রাহ্মণদের উন্নীত হবার সুযোগ প্রদান করবে? এটা জেনেও যে, ব্রাহ্মণরা কখনোই সময় ও প্রকৃতিকে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেবেনা, তারপরেও এই সুযোগ এঁদেরকে প্রদান করবে?"

মা হেসে বললেন, "এঁর তিনটি কারণ পুত্র বশিষ্ঠ। প্রথমত, যতই অপ্রিয় হোক, ব্রাহ্মণ আমারই সন্তান। তাই এক মা তাঁর সন্তানের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনা। পুত্র, সন্তানের অঙ্গের বর্ণ কৃষ্ণ হয়েছে বলে, সন্তান কৃষ হয়েছে বলে, সন্তান কন্যাশিশু হয়েছে বলে, সন্তান অকল্যাণ বহন করে এনেছে বলে, মাতা যদি সন্তানকে স্তনদান করতে অস্বীকার করে দেয়, তাহলে কি হবে সমস্ত আত্মদের সমর্পণের উদ্দেশ্যে অগ্রগতির!

পুত্র, সমস্ত আত্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাণু নিজের নিজের ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণে ব্যস্ত, আর সকলের ব্রহ্মাণ্ডকে একত্রে তোমরা ব্রহ্মাণ্ড বলো। এই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ হলে, আমার কি লাভ বলতে পারো? প্রতিবার এই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ হয়, প্রতিবার আমার সন্তান আমার থেকে ঈষৎ দূরে চলে যায়, তারপরেও আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের নাশ করিনা কেন, বলতে পারো?

পুত্র, এই ব্রহ্মাণ্ড গঠন যতই করে তারা, ততই তারা নিজেদেরকে সুযোগ দেয় যে, তাঁরা ইচ্ছা চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা পদস্থ আত্মভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে, কাল ও প্রকৃতির সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে, আমার নিকট অর্থাৎ সত্যের নিকট আসতে থাকবে। এই হলো কারণ যে আমি ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ না করে, সমস্ত ব্রহ্মাণুর নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডকে একত্রিত করে, প্রকৃতি রূপে অবস্থান করি, এবং সময় রূপে প্রবাহিত হয়ে আমার সকল সন্তানকে, সকল আত্মকে, সকল ব্রহ্মাণুকে আমার স্তন প্রদান করে, তাঁদেরকে জীবনসংগ্রামে রত রাখি।

পুত্র, এখন আমিই যদি ভেদভাব করি, তবে আমার সন্তানদের অগ্রগতি কি করে সম্ভব হবে? সেই কারণে বশিষ্ঠ, এঁদেরকে সুযোগ দিলে আমার অন্য সন্তানরা নিপীড়িত হবে, তা জেনেও, আমাকে এঁদেরকে সুযোগ প্রদান করতেই হবে। তবে এছাড়াও আরো দুটি কারণ আছে, এঁদের সুযোগ প্রদান করার।

পুত্র বশিষ্ঠ, এতাবৎ সময় পর্যন্ত আর্যব্রাহ্মণরা মিথ্যাচার করেছে, বৌদ্ধ গ্রন্থের থেকে তস্করি করে, নিজেদের গ্রন্থ স্থাপন করে, নিজেদেরকে ভগবান রূপে স্থাপন করেছে সম্পূর্ণ জম্বুদ্বীপে। কিন্তু এঁদের অত্যাচার এখনো চরমে উন্নীত হয়নি। এঁদের অত্যাচার চরমে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, আমি এঁদেরকে বার্তা প্রদান করবো, সতর্ক করবো, কিন্তু দণ্ড দেবো না। আর একবার চরমে উন্নীত হয়ে গেলে, এঁদেরকে দণ্ডও দেব, আর সম্যক আর্যব্রাহ্মণজাতিকে তাঁদের অস্তিত্বকাল পর্যন্ত আমার অর্থাৎ সময় ও প্রকৃতির মমতার থেকে মুক্ত করে দেব।

তখন যেখানে এঁরা নিজেদের ভগবান হবার প্রচার বন্ধ করবেন না, সেখানে কেবল আমার অন্য সন্তানরা যখন পর্যটক হয়ে আসবে, তখনই প্রকৃতি সেখানে সহায় হবে, অন্যথা সর্বক্ষণ প্রকৃতি এঁদের বিরোধীই হবে। লক্ষ্মী বা শ্রীরও কৃপাদৃষ্টি এঁদের উপর থাকবেনা, তাই এঁদের মধ্যে কনো প্রতিভাই স্থান গ্রহণ করতে পারবেনা। শ্বেতা বা সরস্বতীরও কৃপা থেকে এঁরা মুক্ত থাকবে, তাই এঁরা জ্ঞানের থেকে সদামুক্ত থাকবে, আর এঁরা জগতের শ্রেষ্ঠ অজ্ঞানী হয়েই বিরাজ করবে।

আর পুত্র, যেই যেই স্থানে এই ব্রাহ্মণরা মস্তক নিম্নে করে নেবে, যেমন এই ভঙ্গদেশ যা তখন বঙ্গদেশ রূপে স্থাপিত থাকবে, সেখানে তাঁরা কেবলই সামান্য দক্ষিণায় সংসার চালানো পুরোহিত হয়ে থাকবে। অর্থাৎ, এই যে, যতদিন আমি দিন এই জাতিকে উন্নত হবার সুযোগ প্রদান করছি, ততদিন তাঁদের আকালের অপেক্ষার কাল। কারণ আমার অপেক্ষা সমাপ্ত হলেই, তাঁদেরও আকাল শুরু হয়ে যাবে।

আর তৃতীয় কারণ এই যে পুত্র, এই ব্রহ্মাণ্ড এক কল্পভূমি, যার সত্যতা বলে কিছুই নেই। সত্য কেবল আমি, সত্য কেবল আমার স্বরূপ অর্থাৎ শূন্য বা ব্রহ্ম। না ব্রহ্মাণ্ড সত্য, না ব্রহ্মাণু, আর না আত্ম বা পরমাত্ম। সমস্ত কিছুই কল্পনামাত্র। আর তাই, যদি এই ব্রহ্মাণ্ডতে স্থিত হয়ে আমার সন্তানরা সুখের সাখ্যাতকার করতে থাকে, তাহলে এই অসত্য ব্রহ্মাণ্ডই তাঁদের কাছে সত্য হয়ে প্রকাশিত হবে। তাই, এই ব্রাহ্মণমনস্ক পাপীদের অস্তিত্বও আবশ্যক এই ব্রহ্মাণ্ডে, কারণ এঁরাই আমার বাকি সন্তানদের জীবন দুর্বিষহ করতে থাকবে।

আর যতই তাঁদের জীবন ওষ্ঠাগত হতে থাকবে, ততই ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের কাছে পরমসত্য হয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়া রুদ্ধ হবে। তাই ব্রাহ্মণজাতির মাথায় আমার রুষ্টদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হবার পরেও, বৈষ্ণবের মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশিত হতেই থাকবে, কারণ এঁদের অত্যাচারই আমার বাকি সন্তানদের ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের কাছে সত্য হয়ে প্রকাশিত হওয়া থেকে অবরুদ্ধ হবে”।

বশিষ্ঠ গদগদ হয়ে বললেন, “অদ্ভুত তোমার লীলা মা। গুরুদেব সঠিকই বলতেন। তোমার লীলা তুমিই জানো। কেউ অন্যায় করে, তো সেই অন্যায়ও কারুকে সত্যের দর্পণ দেখায়; আবার কেউ ন্যায় করে, তো সেই ন্যায়ও কারুকে সত্যের দর্পণ দেখায়। অর্থাৎ সময় ও প্রকৃতির বেশে তুমি সকল সন্তানকে সর্বক্ষণ সত্যের দর্পণ দেখিয়েই চলেছ।

যে এই দর্পণ দেখতে দেখতে, নিজের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা আবদ্ধ আত্মের বিরোধিতা করে, সময় ও প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করবে, সেই তোমার আভাস লাভ করবে। আর

গুরুদেব এই তন্ত্রও এই কারণেই নির্মাণ করেছেন যে এই পথে চললে, আত্ম নিজের ইচ্ছা চিন্তা ও কল্পনার থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে, আর তোমার সান্নিধ্য পাবে"।

মা এবার মিষ্ট হাস্য শ্রবণ করিয়ে বললেন, "পুত্র, মার্কণ্ড আমারই অবতার ছিল। আমার সাকার রূপ সে। ভাবিকালে আমার কনো পূর্ণ অবতাররূপও এই বঙ্গদেশে আসবে। সে সংসারে অবস্থান করে, আমার সান্নিধ্যলাভের উপযোগী হবার শিক্ষা প্রদান করবে। তবে তা দেরি আছে। তাই এখন তন্ত্র। যতক্ষণ না সে অবতারিত হচ্ছে, ততক্ষণ তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মার্গ"।

বশিষ্ঠ এবার ক্রন্দনে ভেঙ্গে পরে বললেন, "গুরুদেব আমাদের একটিবারও কেন বললেন না যে উনি আপনার সাকার প্রকাশ ছিলেন! আমরা তাঁকে স্নেহ করতাম, সন্তানের ন্যায় বিরক্তও করতাম, আর তিনি মাতার ন্যায় আমাদের সমস্ত করা অত্যাচারকে মমতার সাথে গ্রহণ করে নিতেন। কিন্তু মা, তাও আমাদের ভেদভাবের দৃষ্টিকোন আমাদেরকে এই সত্য সম্বন্ধে ভুলিয়ে দিলো যে, আমাদের মা নিরাকার, আমাদের মায়ের কনো লিঙ্গই সম্ভব নয়। সমস্ত লিঙ্গেই তিনি থাকেন। ...

মা, হৃদয় আমার বড়ই বিচলিত আজ। ... তোমার দর্শনে ব্যকুল লাগছে। কি ভাবে তোমার দর্শনের যোগ্যতা অর্জন করবো মা? বলো আমায়? আমি তোমার দর্শন পেতে ব্যকুল?"

মা হেসে বললেন, "অযোধ্যা পর্বতের দিশায় যাত্রা করো। আমার এই আজ্ঞাচক্রকে ধারণ করো। আর প্রথম যেখানে উষ্ণজলাশয় পাবে, সেখানের অরণ্যে উপবেশন করে, তন্ত্রের তপস্যা করো, এবং তন্ত্রের শিক্ষা প্রদান করো। তোমরা সকলেই তাই করো, সকলেই একাকজন ভৈরব হয়ে উঠে, আমার দর্শন লাভ করে মোক্ষকামী হবে। যাও পুত্ররা"।

মায়ের এমন আদেশ লাভ করে, সমস্ত ভঙ্গের সমস্ত স্থানে সকলে প্রচারের উদ্দেশ্যে লহুমিশ্রিত ধারণ করে ছড়িয়ে গেলেন। সকল আর্যস্পর্শ থেকে মুক্ত, অরণ্যনিবাসী মাতার প্রেমের গাঁথা শুনে আপ্লুত হতে শুরু করলেন। মাতার প্রেম, করুণা ও মমতা সর্বত্র প্রচারিত ও প্রসারিত হতে শুরু করলো ভঙ্গে, অঙ্গে, কামরূপে, ত্রিপুরে ও মনিপুরে।

বশিষ্ঠ মাতার সাকার দর্শন লাভ করলেন, কিন্তু স্বরূপের দর্শন না লাভ করলে, মাতা নির্দেশ দিলেন মগধে যাত্রা করতে। সেখানে মাতার এক অবতার অবস্থান করছেন, যিনি ২৭ তম ও অন্তিম বুদ্ধ। বশিষ্ঠ সেই কথাতে আপ্লুত হয়ে মগধ গেলে, সেখানে দুর্গারূপের স্থাপন করলেন দেওঘরের অমৃত হ্রদের প্রান্তে।

অবশেষে পাটনেশ্বরীকে স্থাপন করার কালে ২৭ তম বুদ্ধের সাখ্যাতকার করলেন, এবং মাতার সত্যস্বরূপ শূন্যরূপের দর্শন লাভ করলে, বুদ্ধের নির্দেশ আসে বশিষ্ঠের কাছে, "যাও পুত্র, ভঙ্গ হয়েছে, অঙ্গ হয়েছে, কামরূপ হয়েছে, মনিপুর হয়েছে, ত্রিপুর হয়েছে, কলিঙ্গেও মাতার ত্রিঅঙ্গ স্থাপন করেছ, মগধেও করেছ। এবার বাকি মাতার অঙ্গ নিয়ে আর্যদের মধ্যে যাও। সেখানেও অনেকেই মাতার আশিসের অপেক্ষায় বসে আছেন। যাও, দক্ষিণে কুমারীকা অতিক্রম করে সিংহলে যাও, পশ্চিমে সিন্ধুতট পেরিয়ে বালুকাতটে যাও, আর উত্তরে যাও কৈলাসের তলে, আর তির্গতদের রাজ্য যেখানে সমাপ্ত হয়, সেখানে যাও। স্থাপন করো তন্ত্রকে। অক্ষয় করে দাও তন্ত্রকে"।

যাত্রা করলেন মার্কণ্ড শিষ্য তান্ত্রিকগন উত্তরে। মিথিলা থেকে শুরু করে মানসসরবরে মাতার লহুমিশ্রিত অঙ্গ স্থাপন করে তপস্যা করে, ও শিষ্যের নির্মাণ করে তন্ত্রপীঠ স্থাপন করে এলেন। একই ভাবে কিছু তান্ত্রিক কুরুক্ষেত্রতে শক্তিপীঠ স্থাপন করে, উত্তরে গুরুদেবের মার্কণ্ড মহাপুরাণের ব্যাখ্যা অনুসারে এক বিশালাকায় গুহা লাভ করে, তাকেই অমরনাথ গুম্ফ বলে চিহ্নিত করে, তার অন্তরে উত্তর পূর্ব কোনে স্থাপন করলেন, মাতার বিশুদ্ধ চক্রকে।

আর অন্যরা গেলেন দক্ষিণে। সেখানেও বিভিন্ন স্থানে সমস্ত পীঠ স্থাপন করতে করতে, কুমারিকার সমুদ্রতটে পৌঁছালেন, আর সেখানে মাতার স্তনদেশ স্থাপন করে তাকে মহাশক্তিপীঠ রূপে স্থাপন করে, পূর্বকোনের প্রান্ত ধরে সিংহলে প্রবেশ করে, সেখানেও মাতার গহনা স্থাপন করে শক্তিপীঠ স্থাপন করে এলেন।

আবার কিছু তান্ত্রিক পশ্চিমকে ভেদ করতে করতে, জ্বালামুখীতে মাতা কালীর জিহ্বা স্থাপন করে, সেই জিহ্বার থেকে ঐশ্বরিক অগ্নির প্রকাশ দর্শন করে, অতিপশ্চিমে যাত্রা করে, চলে গেলেন সিন্ধুতটের উপরান্তে, বালুর দেশে, এবং সেখানে উপস্থাপন করে, মাতার মাথার খুলির উর্ধ্বদেশ স্থাপন করে, তাকে মহাশক্তিপীঠ রূপে স্থাপন করলেন।

আর্যদের মধ্যেও মাতার প্রতি এমন প্রেম ভাব উৎপন্ন হবে ভিন্নভিন্ন স্থানে, তা কল্পনাতেও ভাবেন নি মার্কণ্ডশিষ্যরা। তবে তন্ত্রের ও মার্কণ্ড মহাপুরাণ, যেখানে কেবলই মাতার জয়গান করা হয়েছে, অহংকারের আরাধনা করাই হয়নি, তার জনপ্রসিদ্ধি আর্যদের প্রতিষ্ঠাকেই নড়বরে করে তুলল। আক্রোশে ফেটে পরলো আর্যরা।

যেখানে যেখানে মার্কণ্ড মহাপুরাণ দেখতে পেলেন আর্যরা, তখন তখন সেই মহাগ্রন্থকে অগ্নিস্নান করিয়ে করিয়ে ভস্ম করতে থাকলেন আক্রোশের বশে, এবং নিজেদের বিনাশকে নিশ্চয় করতে শুরু করে দিলেন। তন্ত্রপীঠে পীঠেও আক্রমণ করলেন, কিন্তু মার্কণ্ডশিষ্যরা একাকজন ভৈরব হয়ে সেই সমস্ত পীঠের রক্ষক হয়ে উঠলে, স্থানীয়রা সেই সমস্ত ভৈরবেরও আরাধনা শুরু করে দিলেন তন্ত্রপীঠসমূহতে।

আর ঠিক তার পরে পরেই, গৌতম বুদ্ধের প্রসিদ্ধি ব্রাহ্মণদের পুনরায় বিপাকে ফেলে দিল। এক তন্ত্র, তার সাথে বৌদ্ধধারার উত্থান। তন্ত্র তো এক নবসাধনধারা, যা সরাসরি ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করেনি, কিন্তু বৌদ্ধধারা এবার তো সরাসরি ব্রাহ্মণদের ব্যবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে উঠলো। দিকে দিকে, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কুণ্ঠিত হতে শুরু করলো। বিন্ধ্যের অঞ্চলে অঞ্চলে, আর হিমালয়ের পাদদেশের, হৃষীকেশ ও আরো উত্তরের অঞ্চলে, ব্রাহ্মণরা লুকিয়ে পরতে শুরু করলেন।

জনতা ব্রাহ্মণ বিরোধী হয়ে উঠেছে। বুদ্ধের প্রভাবে তাঁরা উগ্র বা উচ্ছৃঙ্খল তো হননি, কিন্তু হতে কতক্ষণ, একবার উগ্র হয়ে উঠলে, ব্রাহ্মণদের হত্যা করতেও জনতা পিছুপা হবেনা।

বৌদ্ধত্বের প্রসার, ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য স্থাপিত ক্ষত্রিয়কুলকেও উগ্রতা ত্যাগ করতে বাধ্য করতে থাকলো।

বৌদ্ধপ্রসার

ব্রাহ্মণরা প্রায় সর্বহারা হতে থাকলেন। কিন্তু শিকারি কুমিরের ন্যায় হিমালয় নিম্নতটে, হিন্দুকুশ নিম্নতটে, বিন্ধাঞ্চলের নিম্নতটে একপ্রকার লুক্কায়িত হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে থাকলেন ব্রাহ্মণ আর্যরা।

গৌতম ভবলীলা ত্যাগ করলেন। ব্রাহ্মণ গুহা থেকে মুক্ত হওয়া শুরু করলেন। কিন্তু গৌতমের যেন অন্ত হয়েও অন্ত নেই। বিভিন্ন গোষ্ঠী গৌতমকে ঋষি গৌতম বলা শুরু করে দিলেন, আর তাঁর কৃপা নিয়ে অসংখ্য কাহিনী সম্মুখে আসতে থাকলো। ব্রাহ্মণ আর্যরা এক নব উপায়ের সন্ধান পেলেন। তাঁরাও এবার পিপলাদকে মহর্ষি পিপলাদ বলা শুরু করলেন, মার্কণ্ডকে মহর্ষি মার্কণ্ড বলতে শুরু করলেন, আর গৌতম বুদ্ধকে ঋষি গৌতম বলা শুরু করে, ইনারা সকলেই আর্যসমাজের নক্ষত্র, এমন দেখিয়ে পুনরায় আর্য ব্রাহ্মণকুলকে প্রতিষ্ঠিত করতে গালগল্প স্থাপন করে একাধিক পুরাণের রচনা শুরু করলেন।

কিন্তু মগধের পরে যেন তাঁদের যাত্রা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। ২৭ তম বুদ্ধমতধারার জনকরাজ্যে মগধের থেকে বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর পৌত্রীকে বিবাহ করে নৃপতিরূপে স্থিত নন্দ সমস্ত আর্যভূমিকেই প্রায় গ্রাস করে নেয়। তাই অজাতশত্রুর অন্যবংশধর চন্দ্রগুপ্তকে গোপনে আর্যব্রাহ্মণরা পালন করে, চাণক্য নামক আর্য ব্রাহ্মণ নন্দকে কপটভাবে হত্যা করে, মগধের অধিকার গ্রহণ করালেন।

চন্দ্রগুপ্তের বৌদ্ধধারা যেন এবার আর্যদের কবচ, আর সেই কবচের অন্তরালে থাকা মহাধূর্ত আর্য, চাণক্য স্থাপন করলেন হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দু নামকরণ করলেন আর্যদের যবনরা, কারণ তাঁরা

সিন্ধুনদীর উপকুলের বসবাসকারী, তাই। আর সেই হিন্দু নাম থেকে হিন্দুস্থান স্থাপন করলেন চাণক্য, চন্দ্রগুপ্তকে কবচরূপে ধারণ করে।

কিন্তু আর্যরা যেন নিজেদের কপটকে চিরস্থায়ী করতেই পারছিলেন না। চন্দ্রগুপ্ত পুত্র, বিন্দুসার সমস্ত আর্যদের করা কপট জেনে গেলেন, এবং বিষপ্রয়োগ করে চাণক্যের হত্যা করলেন। অপরদিকে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অশোক পুনরায় ক্ষত্রিয়ত্বকে জাগ্রত করে, সমস্ত রাজ্যকে বাহুবলে দখল করতে আরম্ভ করলেন। আর্যদের হত্যা করে, বৌদ্ধরাজ্য স্থাপন করবেন অশোক, এই তাঁর মনস্কাম।

কিন্তু সম্মুখে এলেন জৈনরা, এবং বললেন, "শান্তির স্থাপক বৌদ্ধধারার স্থাপন তুমি কি করে লহুপান করে করবে অশোক! ... এই লহুপান বন্ধ করো, আর শান্তির বিস্তার করো। প্রসার করো বৌদ্ধধারার দিকে দিকে"।

অশোক বৌদ্ধধারার স্থাপনা শুরু করলেন, আর এবার বিনাযুদ্ধে আর্যদের সমস্ত সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া শুরু করলেন। উত্তরকে বশীভূত করলেও, দ্রাবিড় অঞ্চল প্রায় হৃদয় থেকেই বৌদ্ধ ধারাকে স্বীকার করে, পাল, চোলা ও পান্ডেয়া কুলের রচনা হলো, এবং সম্পূর্ণ দক্ষিণ হিন্দুস্থান হয়ে গেল বৌদ্ধধারায় আবদ্ধ।

আর্যরা অতিআগ্রহে কনো প্রতিভাবানের অপেক্ষা করছিলেন, তো আর্যশিরোমণি এক শূদ্রের গর্ভে এক কৃষ্ণবর্ণের সন্তান প্রদান করলেন, যার নাম তাঁর বর্ণের ও তাঁর জন্মের স্থানের কারণে হলো কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। একদিকে যখন গৌতমকে কেন্দ্র করে উপনিষদের নবনির্মাণ হচ্ছিল, সেই কালে, মার্কণ্ড মহাপুরাণের দহন অভিযান চালিয়ে চালিয়ে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে, তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ হবার কারণে দিবারাত্র বেদনা প্রদান করে, সেই বেদনা থেকে মুক্ত হবার উপায় রূপে তন্ত্রের ধারা যে কেবলই আচারবিচারের ধারা, এমন স্থাপন করে মার্কণ্ড পুরাণ রচনা করার নির্দেশ দিলেন আর্যরা।

অসামান্য মেধার অধিকারী কৃষ্ণ, আর তাই তাঁর মেধাকে ব্যবহার করে, একাধিক পুরাণ রচনা করালেন আর্য ব্রাহ্মণরা, যা বিশেষত তাঁর কৃষ্ণবর্ণ হবার কারণে, তাঁকে অনার্য রূপে প্রকাশিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকার অছিলাতেই করলেন ব্রাহ্মণরা, যারা নিজেদেরকে দেব, অধিদেব, তথা ভগবন রূপে সম্যক হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ করতে থাকছিলেন।

কিন্তু বুদ্ধের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত কৃষ্ণ, আর তাই বিষ্ণু পুরাণ রচনার অন্তিম অধ্যায়ে লিখলেন বুদ্ধের কথা, কিন্তু আর্যদের থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখলেন, তাঁর নাম বুদ্ধ না লিখে কৌশলে পরশুরাম করে লিখলেন। সঙ্গে রাখলেন জ্ঞানের কুঠার, আর সেই কুঠারের প্রভাবে, ২৭ তম বুদ্ধের নাম না করে, ২৭ বার ক্ষত্রিয়দমন, যা সকল বুদ্ধ করেছিলেন, তার বিবরণ দিলেন।

মাতার এই অবতার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যখন ২৭ তম বুদ্ধের কথা ২৭বার ক্ষত্রিয়দমনকারী পরশুরামের বেশে লিখলেন, তখন মাতাও বুঝে গেলেন, কৃষ্ণ প্রস্তুত, তাঁর জন্মের মূল কর্ম সম্পাদন করার জন্য। তাই তিনি উদিত হলেন কৃষ্ণের সম্মুখে আর বললেন, “পরশুরাম তো শিক্ষাও দিয়েছিলেন পুত্র। কই সেই কথা তো লিখলেনা তুমি!”

কৃষ্ণ বললেন, “মাতা, ... তুমি এসেছ! ... কবে থেকে তোমারই অপেক্ষায় বসেছিলাম। অহেতুক জন্ম নিয়ে এসেছি মনে হচ্ছিল, তোমার দর্শন লাভ না করে। ... আদেশ দাও মা! ... ও, তোমার প্রশ্নের উত্তর... মা, পরশুরাম যে বাহ্য শিক্ষা দেননি। তিনি যে অন্তরে দিব্যতা জাগরণী শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার উদয়ে কি ভাবে পঞ্চানন আত্ম আর বিচার বিবেক সমস্ত অহংকারের নাশ করে, সত্যের স্থাপনা করে, সেই শিক্ষাই প্রদান করেছেন”।

মাতা হেসে বললেন, “তাহলে সেই কথা লিখছ না কেন বাছা! ... সমস্ত অন্তরের শিক্ষাকে মানবীয় আকৃতি প্রদান করে, রচনা করো মহাগ্রন্থের। ব্যখ্যা দাও সেখানে সেই শিক্ষার। ব্যাখ্যা দাও সেখানে আমার জাগরণের। কি ভাবে আমি হৃদয়ের অগ্নি থেকে জন্ম গ্রহণ করি, কি ভাবে

আমি বিবেকদ্বারা পঞ্চানন আত্মের মার্গদর্শন করি, আর সেই মার্গদর্শনের ফলে, সাধকের অন্তরে যেই মহাসংগ্রাম হয়, কেন লিখছ না সেই কথা!"

কৃষ্ণ বললেন, "আদেশ দাও মা। তোমার আদেশের মধ্যে যে আশীর্বাদ নিহিত থাকে। সেই আশীর্বাদ লাভ না করলে, এতো বড় কীর্তি সম্পন্ন করবো কি করে?"

মাতা হেসে বললেন, "বেশ পুত্র, আমি তোমাকে নির্দেশ প্রদান করলাম, আমার যেকোনো নাম গ্রহণ করে, সেই মহাকাব্য রচনা সম্পন্ন করো"।

আশ্বস্ত হলেন কৃষ্ণ। রচনা করলেন জয়া, যা আজ আমাদের কাছে মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ। স্থাপন করলেন পরশুরামকে মহাশিক্ষা প্রদানের ভূমিকায়। দেখালেন, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাকে কি ভাবে নিয়ে ছলনা করা হচ্ছে কর্ণের মাধ্যমে। দেখালেন পঞ্চাননের পঞ্চপাণ্ডবরূপে জন্ম। দেখালেন বিচার ও বিবেককে বলরাম ও কৃষ্ণ বেশে জন্মগ্রহণ করতে। আর দেখালেন যজ্ঞের অগ্নি থেকে স্বয়ং মাতাকে কৃষ্ণা বেশে জন্ম নিতে।

তাতে দেখালেন আন্তরিক সমস্ত তত্ত্বের কুটনীতিপূর্ণতাকে। দেখালেন কি ভাবে তাঁরা পঞ্চানন আত্মকে দমিয়ে রাখতে ব্যস্ত। দেখালেন বিচার বিবেকের সাথে পঞ্চাননের সখ্যতাকে। আর দেখালেন, কৃষ্ণাকে কি ভাবে পঞ্চানন লাভ করেন, তা। শুধু এই নয়, কৃষ্ণা স্বয়ং লজ্জার ও নিপীড়নের শিকার হয়ে, কি ভাবে ক্রমশ পঞ্চানন ও বিবেককে চালিত করে, মহাসংগ্রামের সম্মুখীন করে দেয়, এবং বিবেককে সারথি করে কি ভাবে পঞ্চানন সেই সংগ্রামে জয়লাভ করে সাধনায় সিদ্ধ হয়, তাও দেখালেন।

আর অন্তে দেখালেন যে, এই সমস্ত সংগ্রাম মাতারই লীলা, এবং বিবেকেরই ক্রিয়া, পঞ্চানন অর্থাৎ আত্মকে সম্যক সত্যের সাথে পরিচিত করার জন্য। সমস্ত কিছু দেখাতে থাকলে, মাতা পুনরায় উদিত হয়ে বললেন, 'কি করছ পুত্র! ... মার্কণ্ড আমার গুণকীর্তন করার কারণে, আর্যরা মার্কণ্ড মহাপুরাণের সম্যক বিনাশ করে দিয়েছে। তারপরেও তুমি প্রত্যক্ষ ভাবে আমার গুণকীর্তন করো? না পুত্র, সত্যের বাখান আবশ্যক, সত্যের যাত্রা করানো আবশ্যক। আমার গুণকীর্তন

করা নয়। ... তাই, বিবেককেই সামনে রাখো, আমাকে নয়। তাহলেই আর্যরা তোমার এই গ্রন্থের প্রসার হতে দেবে, নচেৎ তোমার জয়ার অবস্থাও মার্কণ্ড মহাপুরাণের ন্যায় হয়ে উঠবে”।

রচনা হলো জয়ার। নামকরণ করা হলো মহাভারত। আর্যদের বুদ্ধি এই মহাভারতের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তাঁদের সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ কিছু এমন করেছে, যা আর্যসমাজের বিরোধিতা। যাচাই করতে, ভগবৎ মহাপুরাণের রচনা করার নির্দেশ এলো। কৃষ্ণ তাও করলেন। আরো নির্দেশ এলো। এবারের নির্দেশ ভবিষ্যতের কথা লেখার। সময় সীমা রাখো এর বিস্তর, লক্ষ বৎসরেরও অধিক। তাহলে কেউ আর আর্যদের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করবেনা।

রচনা হলো কল্কিপুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণের। তবে তাতে গল্পকথা লেখেন নি। লিখেছেন তত্ত্বকথা, যার লেশমাত্রও আর্যরা বোঝেন না। আর আরো বুঝতে পারলেন না, কারণ সমস্ত তত্ত্বকথাকে সেখানে কৃষ্ণ মানবীয় আকৃতি প্রদান করে রাখলেন। তাই আর্যরা ভাবলেন দূরবর্তী ভবিষ্যতের আজগুবি কথা লিখেছেন কৃষ্ণ। কিন্তু সেই কথা যে আগামীদিনের তাত্ত্বিক অবস্থান, তা আর্যরা জানতেও পারলেননা।

কৃষ্ণ নিজের দেহলয়ক্ষণের নিকটে উপস্থিত হলেন। তাই এবার কৃষ্ণ, আর্য ব্রাহ্মণরা তাঁর কৃষ্ণবর্ণকে সম্মুখে রেখে, যেই ভাবে তাঁকে হেনস্তা করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী হলেন। উপনিষদের কথা পুনরায় লিখলেন তিনি, তবে এবার একটু অন্য মোড়কে। ব্রাহ্মণরা নিজেদের ভগবান, দেব, অধিদেব বলে প্রচার করেন। কৃষ্ণ নিজেকে সেখানের ভগবানশ্রেষ্ঠ করে স্থাপিত করলেন, যাতে একদিন এই ব্রাহ্মণ ভগবানদের মানুষ তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে।

কিন্তু সেই কথাকে প্রকাশিত না করেই চলে গেলেন কৃষ্ণ ভবলীলা ত্যাগ করে। তাঁর শিষ্যরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ, যা ভগবৎ গীতা নামে আজ খ্যাত, তার প্রকাশ করলেন। তবে ব্রাহ্মণরা আবারও এর কথার মাথামুণ্ডু বুঝলেন না। কৃষ্ণ যে বিবেক, সেই তত্ত্বও কনোদিন উদ্ধার করতে পারলেন না

ব্রাহ্মণরা, আর তাই তাঁকে বিষ্ণু অবতার বলে চালাতে থাকলেন। অন্যদিকে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যে মার্কণ্ডের ন্যায়ই এক অবতার, তারও টের পেলেন না ব্রাহ্মণরা।

তাই, ভগবৎ গীতাকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করলেন না। ভাবতেও পারলেন না, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ধরে, মাতারই এক অংশ অবতার ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বকেই সঙ্কটাপন্ন করে তুলবে এক সময়ে। বরং, তাঁরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের রচিত বিভিন্ন পুরাণকে ধরে ধরে, এবার অশোকের নির্মিত সমস্ত বৌদ্ধমঠ, সমস্ত বৌদ্ধস্তূপকে নারায়ণশিলা বা শিবলিঙ্গ রূপে স্থাপিত করা শুরু করলেন।

২৭ তম বুদ্ধের পর আর কনো বুদ্ধ আসেন নি। বৌদ্ধকুলরা সীমান্তযুদ্ধ করতে করতে, ক্ষয় হয়ে চলেছে। পাণ্ড্যে, পল্লভ, পাল, সেন, চোল, কুশল, সমস্ত বৌদ্ধধারার পতন হতে থাকছিল। আর সেই সুবাধে, আর্যরা বৌদ্ধ মঠ আর স্তূপকে পরিবর্তন করা শুরু করে দিয়েছিল। অশোক স্থাপিত ৮০ সহস্র স্তূপকে শিবলিঙ্গ বা নারায়ণশিলা বলে প্রচার শুরু করলেন আর্যরা; অশোক স্থাপিত প্রায় এক হাজার মঠকে মন্দির করে পরিচয় প্রদান শুরু করলো ব্রাহ্মণগোষ্ঠী।

আর্যরা দ্রাবিড় সুন্দরীদের দেখে, নিজেদের কামাতুর স্বভাবিক স্বভাবকে আর আটকাতে পারলেন না। তাঁদের সঙ্গম হলে, এবার আর গোলাপি বর্ণের আর্য রইল না, মিশ্রবর্ণের আর্য বিরাজ করতে শুরু করলো বিভিন্ন স্থানে। তবে হিমালয়ের পাদতলে, ও হিন্দুকুশের পাদতলে, আর্য ব্রাহ্মণরা কারুর সাথে সঙ্গমে গেলেন না, কারণ তাঁদের নিকট কৃষ্ণবর্ণের দ্রাবিড়রা ঘৃণ্য, গৌরবর্ণের গারো খাসি ও বঙ্গবাসি তথা মগধবাসি হলেন শত্রু।

যেখানে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা অন্যশ্রেণীদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে হয়ে, বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপদের মন্দিরে ও শিবলিঙ্গ তথা নারায়ণশিলায় পরিবর্তিত করতে ব্যস্ত রইলেন, সেইসময়ে গোঁড়া আর্যরা হোমযজ্ঞ এবং এই পরিণত মঠ ও স্তূপদের নিজেদের নির্মিত আচার অনুষ্ঠান দ্বারা পূজা করে করে, সকলকে এই বার্তা দিলেন যে, এক আর্যই আছেন, আর সমস্ত কিছুর কিছুই নেই।

দীর্ঘকাল এমন চললে, সত্যের চর্চাই এই ভারতভূমি থেকে উঠে যেতে শুরু করলো। কেবল অধিকারস্থাপন ও দক্ষিণালাভের জন্য পূজা, শোষণ করার উদ্দেশ্যে একাধিক ব্রাহ্মণীয়

লোকাচার, আর অহংকারের আরাধনাই অবস্থান করলো সমাজে। আর সেই সমস্ত কিছুকে প্রশ্নচিহ্ন প্রদানের জন্য মাতা পুনরায় অবতার গ্রহণ করলেন শঙ্কর নামে।

এবারে মা বৌদ্ধের পক্ষও নিলেন না। গঠন করলেন অদ্বৈত বেদান্ত, যেখানে সম্যক জীবনের সার স্থাপিত করলেন। হিল্লোল উঠলো সম্পূর্ণ দ্রাবিড় অঞ্চলে। তবে তা দ্রাবিড় অঞ্চলেই সীমিত থাকলো না। আগুনের মত উৎকল, কলিঙ্গ, প্রয়াগ এবং কর্নটে ছড়িয়ে পরলো। আর্যদের মসনদ পুনরায় নড়বরে হয়ে গেল। এবারে আরো অধিক ভাবে, কারণ এবারে যে আর্যরা কারুকে আক্রমণ করার মতও পাচ্ছে না।

প্রকৃতি সংক্রান্ত তত্ত্বকে জ্বালিয়ে দেবার সাহস তারা দেখিয়েছিল পূর্বেই। বৌদ্ধদের অন্তরে প্রবেশ করে, অর্থনীতিকে মাধ্যম করে সম্পূর্ণ ছেত্রকে হিন্দুস্থান করে তুলেছিল। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে তাঁর গাত্রবর্ণের জন্য টানাটানি করে করে, তাঁকে মাধ্যম করে জম্বুদ্বীপকে ভারতবর্ষ করে তুলতে চেয়েছিল, যাতে করে সাংখ্য, বঙ্গদেশ ও কপিলমুনির নাম সাধকদের স্মৃতিপট থেকে হারিয়ে যায়।

কিন্তু এবারে যে নাস্তিকতার দর্শনের সঙ্গে সম্যক লড়াই। কনো তর্ক, কনো শর্ত, কনো আক্রমণ, কনো ছলনা, কিছুই কাজ করলো না। আর এবারে মাতার অবতার লুক্কায়িত হয়ে ভঙ্গের বনে গিয়ে সাধনধারার নির্মাণ করলেন না। এবারে প্রত্যক্ষভাবে জনসমক্ষে সমস্ত ক্রিয়া রচলেন। নিজের হস্তে ব্যবস্থায়ন করে গেলেন, চার চারটি মঠ স্থাপন করে, আর তাতে নিজের শিষ্যদের স্থাপিত করে।

আরাধনা যদি করতেই হয়, তা একমাত্র আদিশক্তির আরাধনা হবে। এমন ধারার গঠন করে, শঙ্কর আর্যব্রাহ্মণদের কাছে ত্রাস হয়ে উঠলেন। কিন্তু বেশিদিন নয়। স্বল্প কিছুদিনের মধ্যেই, শঙ্কর ভবলীলা ত্যাগ করলেন। ব্রাহ্মণ সমাজ উঠে পরে লাগলেন, এবার দ্রাবিড় অঞ্চলকে আর ছেড়ে রাখা যাবেনা। এতদিন পর্যন্ত দ্রাবিড়দের দুর্বল ভেবে গেছিলেন।

তেমন অবস্থাতেই বৌদ্ধসঞ্চার হয়ে, দ্রাবিড় অঞ্চলে পল্লভ, পাণ্ডেয়, কেকয়, তথা বঙ্গে সেনরা প্রায় আর্যদের আচার অনুষ্ঠানের নামে হনন, দক্ষিণার নামে লুণ্ঠন, এবং নিজেদের ভগবান বলে অনাচার করতেই দেয়নি। এঁরা দুর্বল হচ্ছিলেন, তক্ষণে শঙ্কর এসে সমস্ত আর্যদের পরিশ্রমকে পণ্ডশ্রম করে দিয়েছে। এবার দ্রাবিড় অঞ্চলে না তো কনো বৌদ্ধ নৃপতির দাপট আছে, আর না রয়েছে শঙ্করের ন্যায় মহাজ্ঞানীর তেজ। এই সুযোগ, দ্রাবিড় অঞ্চলকে পুনরায় অধিকার করে নেবার।

এমন ভাবেই যখন বহুকাল কারুর সন্ধান করে ফিরছিলেন, তখন এক মেধাবী দ্রাবিড় সন্তান পেয়ে গেলেন, যার নাম রামানুজ। তাঁর হৃদয়ে বৌদ্ধ বা বৈদান্তিকদের প্রলেপ পরার আগেই, আর্যরা বেদের ছাপ রাখতে আরম্ভ করে দিল। আর এর ফলে, রামানুজের উত্থান হলো এবং দ্রাবিড় অঞ্চলে পুনরায় উত্থান হলো আর্যসমাজের।

স্বগোত্রিয় আক্রমণ

কিন্তু জগন্মাতা যেন আর আর্যদের সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেবেন না। এ যেন ভগবান আর শয়তানের সংগ্রাম। একদিকে জগন্মাতা স্বয়ং অবতার গ্রহণ করে করে, ভগবানের তরফ থেকে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর অন্যদিকে আর্য ব্রাহ্মণরা তো চিরকালই মিথ্যাচার, মিথ্যাকথন, এবং লুণ্ঠন মানসিকতা নিয়ে, শয়তান।

কিন্তু এবারে আর জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে কিচ্ছু করতে হলো না, কারণ এবার জগন্মাতা যা করলেন এই শয়তানদের কোণঠাসা করতে, তা হলো তাঁদের স্বগত্রিয়দের আনায়ন করলেন। যেই ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে, জম্বুদ্বীপে এসে নিজেদের আর্য বলে আখ্যা দিয়ে, এই দেশের মানুষদের সর্বসম্ভব উপায়ে লুণ্ঠনের প্রয়াস করছিলেন, সেই স্থান থেকেই এবার পাঠান আর মুঘল এলেন এই দেশে, আর্যদের দেশে।

প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করার তো মুখই নেই আর্যদের। তাঁদের গাত্রবর্ণ দেখলেই মুঘল পাঠানরা বুঝে যাবেন যে, এঁরা সেই স্বৈরাচারী শয়তান, যারা পূর্বে গান্ধার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষদের লুণ্ঠন করছিলেন বলে, এঁদেরকে ভুমিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই প্রত্যক্ষ ভাবে এঁদের সম্মুখেও এলেন না আর্যরা। বরং, যাদেরকে শাসক করে রেখে হাতের পুতুল করে রেখে দিয়েছিলেন এঁরা, সেই ক্ষত্রিয় রাজপুতদের এঁদের সাথে যুদ্ধে রত করলেন।

কিন্তু বলের হেরফের বিস্তর। যেই রাজপুতরা আর্যদের পৃষ্ঠপোষণের কারণে অজেয় শক্তিধর আখ্যা নিয়ে ভারতে বিরাজ করছিলেন, আর সেই বিরাজের কারণে অসীম মদাচ্ছন্ন হয়ে, মদ হতে জাত সাহসে দিগবিজয়ী আখ্যা নিয়ে বিরাজ করছিলেন, তাঁরা এই বিশালাকায় মুঘল পাঠানদের দেহবলের কাছে নিতান্তই শিশু।

প্রতিটি যুদ্ধে পরাস্ত হতে হতে ক্লান্ত হতে থাকলো রাজপুতরা। শক্তিক্ষয়ের সাথে সাথে, বৈভবেরও ক্ষয় হতে শুরু করলো, আর ক্রমশ তাঁরা সমর্পণ করতে শুরু করলো মুঘলদের কাছে। আর্যরা এবার দমিত। পুনরায় তাঁরা উত্তরের খণ্ডে, হিমালয়ের পাদদেশে পলায়ন করলেন। আর সেখান থেকেই একটু একটু করে যেই যেই বৌদ্ধ মঠ এবং স্তূপকে নিজেদের মন্দির বলে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, সেগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকা শুরু করলেন।

বঙ্গে প্রবেশ করলেন, মগধে বিরাজ করলেন, উৎকলে বিরাজ করলেন। প্রথমত তাঁরা সাধারণ মানুষ হয়েই বিরাজ করছিলেন সেখানে, যাতে মুঘলদের দৃষ্টি না পরে, কিন্তু স্বভাব কোথায় যাবে! স্বভাব বশত, পুনরায় তাঁরা লুণ্ঠন শুরু করলেন। একাকী কিছু করতে পারছিলেন না এই অঞ্চলে, কারণ তন্ত্র ও তান্ত্রিক বঙ্গভূমিতে অধিকার করে রয়েছে। তাই কিছু কিছু তান্ত্রিকদের প্রলোভন দেখিয়ে দেখিয়ে, তাঁদের দিয়েও স্ত্রী, ধন, ইত্যাদি লুণ্ঠন শুরু করলেন।

কিন্তু ভগবতী যেন এই শয়তানদের পিছু কিছুতেই ছাড়েন না। বঙ্গদেশের পবিত্র ভূমিতে মাতা পুনরায় অংশঅবতার নিলেন নিমাই নাম ধারণ করে। পাণ্ডিত্য, নীতিজ্ঞান দ্বারা ভূষিত হলেন এই যুবা। ব্রাহ্মণরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মত এঁকেও বশীকরণ করার প্রয়াস করলেন। তবে এবারে

চরিত্র ভিন্ন। এবারে চাপে রেখে নয়, এবারে নিমাইকে পণ্ডিত আখ্যা দিয়ে, নিজেদের দলে টানার প্রয়াস করলেন।

অবতার হন বা সাধারণ জীবকটি, ভ্রমে আচ্ছন্ন হয়েই এই অসত্য ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম নিতে হয়, নাহলে কে বা নিয়তি, কালী আর প্রকৃতি, আর কেই বা আত্ম, অহংকার, ব্রহ্মাণু! ... সমস্তই শূন্য যে তখন। তাই ভ্রমের থেকে মুক্ত হবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নিমাইকে পণ্ডিত আখ্যা দিয়ে ভালোই চলছিলে ব্রাহ্মণদের। এবার তাঁরা নিমাইকে ভিড়িয়ে দেবেন মুঘলদের পিছনে। আর সে মুঘলদের উৎখাত করে, ব্রাহ্মণদের পুনরায় শয়তানের রাজত্ব স্থাপনের সুযোগ করে দেবে।

এই ছিল তাঁদের পরিকল্পনা। নিজেদের শয়তানের রাজত্বকে এতদিন দেবতার রাজত্ব বলে চালিয়ে এসেছেন। যেই আচার, বিচার, অন্ধবিশ্বাস, অহংকারের আরাধনার কারণে, এই দেশের মানুষদের লজিত হওয়া উচিত, এঁরা আর্যব্রাহ্মণদের মিথ্যাচারের আর মিথ্যাপ্রচারের কারণে, সেই কারণেই উদ্যন্ড, সেই কারণেই অমার্জিত, সেই কারণেই ব্রাহ্মণকে ভগবান আখ্যা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু চেতনার জাগরণ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকেও ততদিনই ভ্রমিত করে রাখতে পেরেছিল ব্রাহ্মণরা, যতদিন না তিনি নিজের চেতনাকে ফিরে পেয়েছিলেন। আর একই কৃত্য নিমাইএর ক্ষেত্রেও। চেতনা লাভ সম্পন্ন হলো, আলাপ হলো ভগবৎ গীতার সাথে। শুরু হলো পাঠ। যেন গীতা হলেন জানালা, আর সেই জানালা দিয়ে ব্রাহ্মণদের করা সমস্ত অনাচারকে একত্রে দেখে ফেললেন। আর দেখা মাত্রই, সমস্ত পুঁথি দিলেন পুরিয়ে।

শুরু করলেন গীতার প্রচার এবং ব্যাখ্যা। আর যতই তা প্রখর হয়ে উঠলো, ততই ব্রাহ্মণদের পায়ের তলার মাটি সরতে থাকলো। তাঁদের প্রকৃত শয়তানের চরিত্র বঙ্গদেশের মানুষ জানতে শুরু করে দিয়েছে। উঠলো হিল্লোল, না সামান্য হিল্লোল নয়। মহা হিল্লোল। গীতা ধারণ হলো, ব্রাহ্মণদের ত্যাগ দেওয়া শুরু হলো বঙ্গদেশে।

ক্রমশ সেই আগুন ছড়িয়ে পরল উৎকলেও। ব্রাহ্মণদের বারে বারে বৈঠক হতে থাকলো। এবার কিছু করতেই হবে, নয়তো ভগবৎ গীতার হাত ধরে, সম্যক ব্রাহ্মণকুলকে উৎখাত করে দেবে এই বৈষ্ণব গোষ্ঠী। বহু সহজ প্রয়াস করেছেন ব্রাহ্মণরা, আপোষ করার মানসিকতাও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু চেতনার আলোকে উদ্দীপ্ত নিমাই তখন চৈতন্যদেব। তাঁকে ধরে রাখার সামর্থ্য ব্রাহ্মণের নেই।

তাই অবশেষে বিচার করতে বসলেন ব্রাহ্মণরা। শক্তি আন্তরিক। অবতার হন আর জীবকটি বাহুবলের শক্তি মানবিক মর্যাদা মেনেই স্থাপিত থাকে। পুরাণে তো সমস্ত আন্তরিক দৈব শক্তির কথা বলা হয়েছে। বাহ্যিক শক্তি নয়। বাহ্যিক শক্তিতে চৈতন্য পেরে উঠবে না। এমন সলাপরামর্শ করে, নীলাচলের শক্তিপীঠেই গুপ্ত কক্ষে ব্রাহ্মণরা চৈতন্যের হত্যা করলেন এবং নীলাচলের সাগরে দেহ তলিয়ে দিলেন।

চৈতন্য হত্যা সম্ভব হলেও, চৈতন্য গঠিত বৈষ্ণব গোষ্ঠীর দাপট, গীতা চর্চা, আর ব্রাহ্মণবিদ্বেষকে আর্যরা কিছুতেই দমাতে পারছিলো না। তাই ধীরে ধীরে, কিছু কিছু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে যোগদান করা শুরু করলেন, এবং সেখানে গিয়ে, ক্রমে ক্রমে নেতৃত্ব গ্রহণ করে করে, ব্রাহ্মণবিদ্বেষ স্তব্ধ করলেন। অতঃপরে, তন্ত্র প্রকৃতি আরাধনার বিরোধ শুরু করলেন তাঁরা, যা আর্যদের স্বভাব।

আর যতই তা হতে থাকলো, ততই ব্রাহ্মণরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পুনরায় অত্যাচার, লুণ্ঠন শুরু করে দিলো। আর এখন তো সেই লুণ্ঠন পক্রিয়ার মধ্যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল, কারণ বৈষ্ণবদেরও তাঁরা অধিগ্রহণ করে নিয়েছেন। চৈতন্যমত ভুলে গেছেন তাঁরা। চৈতন্য মতের কেবল আচার অনুষ্ঠান রেখে, প্রকৃতি বিরোধ, আর কৃষ্ণ যে বিবেক অর্থাৎ গজানন, তা ভুলে গিয়ে, তাঁরই জননীর উর্ধ্বে তাঁকে স্থান প্রদান করে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব একত্রে শুরু করলেন লুণ্ঠন।

প্রায় এক শত বৎসর ধরে বেশ ভালোই প্রসার চললে, এবার সমস্ত আর্যরা মিলে এই নবউদ্যমের সঞ্চার করবে সম্যক ভারতে, এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন সবে। কিন্তু সেই ক্ষণেই এই আর্যদের দ্বিতীয় স্বগত্রিয় এসে উপস্থিত হলো, যারা হলেন ইউরোপীয়। এঁদের সামর্থ্য মুঘলদের থেকেও অধিক। মুঘলরা দৈহিক ভাবে শক্তিশালী। কিন্তু এঁদের দেশে বরফযুগ গত হবার উপরান্তে, স্বয়ং আদিশক্তির চেতনা লাভ করে এঁরা জ্বালানী কয়লার সন্ধান পেয়েছে। তাই মাতার চেতনা যুক্ত হবার ফলে, এঁরা অত্যন্ত বলশালী। আর তাই এঁদের সম্মুখে মুঘলরা [এরে উঠলেন না।

কিন্তু আর্যদের হলো জ্বালা। মুঘলরা নিশ্চিত ভাবেই তাঁদের সনাক্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বগোত্রিয় তাই একটিও কথা বলেন নি। কিন্তু এঁরাও স্বগত্রিয়। যখন গান্ধার তক্ষশীলা ত্যাগ করে, তাঁরা এদিকে সেদিকে চলে গেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী মিশরে যায়, ভারতে আসা গোষ্ঠী হলো আর্য, আর তৃতীয় গোষ্ঠী রোমের দিশায় যায়। এঁরা হলেন সেই রোমে যাত্রা করা তাঁদেরই সমগোত্রীয় গোষ্ঠী। কিন্তু বরফযুগের পর মাতার চেতনা লাভ করে, এঁদের আচার অনুষ্ঠান সমস্ত কিছুর নাশ হয়ে গেছে।

এঁরা এখন কেবলই মানবিকতা এবং যান্ত্রিকতা, এই দুই হাত নিয়ে জীবিত। তাই, ব্রাহ্মণরা বিচার করতে শুরু করে, এই মুঘলরাই ভালো ছিল। আবার এই ফিরিঙ্গিরা এসে আমাদের পাকাধানে মই দিয়ে দিল কেন!

আসলে ব্রাহ্মণরা তো জানতেনও না যে, জগন্মাতা বশিষ্ঠকে এই দিনের কথাই বলেছিলেন, যেখানে ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে নির্বল বিহন্নলা করে রেখে দেবেন, তবে বৈষ্ণবরা লুণ্ঠনের মার্গ সচল রেখেই দেবেন। ... তাই ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারছিলেন না, তাঁদের জন্য ঠিক কি আসছে। কিন্তু সেই সময় তো এসেই গেছে। মা'র কাণ্ডের দ্বিতীয়চরণ যে তখনই শুরু হয়ে গেছিল”।

বঙ্গ উত্থান

দিব্যশ্রী বললেন, “পিতা, এ যে চরমতম দুরাচার! ... ঐতিহাসিকদের সাধারণ স্বভাবের মধ্যেই পরে যে, তাঁরা ইতিহাসের বিতর্কিত অধ্যায়সমূহকে ইতিহাসের পাতার বাইরে রাখেন। কিন্তু এখানে তো সম্পূর্ণ ইতিহাসকেই বিকৃত করে রাখা হয়েছে!”

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, “পুত্রী, ইতিহাস মহাশক্তিধর। যেকোনো মানুষের, গোষ্ঠীর, জাতির, সমাজের প্রকৃত চিত্র উন্মোচিত করে রেখে দেয় সকলের সম্মুখে। তাই সকল সময়ে সকল শাসকই প্রয়াস করেন যাতে ইতিহাসের মুখ বন্ধ রাখা যায়। আসলে পুত্রী, প্রকৃত সত্য সম্মুখে এসে গেলে, প্রজার মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। শাসকের অনাসৃষ্টির কথা জেনে, শাসকের শাসনকে অমান্য করা শুরু করে দেয় ।

আসলে পুত্রী, রাজতন্ত্র হোক, বা লোকতন্ত্র, সর্বদাই শাসক হলেন জনপ্রতিনিধি। যেমন করে এক পিতা তাঁর সন্তানের পালক, জীবননির্মাতা নন, ভাগ্যনিয়ন্তা নিয়তি নন, তেমন করেই শাসক প্রজার ভাগ্যনিয়ন্তা নিয়তি নন। পিতার ন্যায়, তিনিও কেবলই সন্তানদের অর্থাৎ প্রজার পালক। তাই তাঁরা হলেন জনপ্রতিনিধি। আর তাই যদি প্রজা শাসককে অস্বীকার করেন, তবে শাসকের আর কিচ্ছুই করার থাকেনা।

সেই অসন্তোষকে রোধ করার জন্যই শাসক ইতিহাসকে বিকৃত করে, যাতে জনরোষ সৃষ্টি না হয়; যাতে জনসমক্ষে তাঁদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; এবং যাতে অবিরাম ভাবে প্রজা তাঁদের ক্ষমতায় উপস্থাপিত থাকতে দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপস্থাপনের লালসা সম্ভোগ মানসিকতাসম্পন্নই হয়, যদিও সহস্র বৎসরে কনো কনো শাসকের মানসিকতা প্রজার সেবাও হয়।

আর তাই প্রজার সম্মুখে ইতিহাসকে বিকৃত করে প্রতিস্থাপন করেন শাসক, যাতে প্রজার কাছে তাঁরা ভগবানতুল্য হয়ে থাকতে পারেন। আর নিজেদের কর্তা জ্ঞান করার কারণে, ইনারা এমনই

ভাবতে থাকেন যে, তাঁরা যদি ইতিহাসকে বিকৃত করে দেন, তাহলে সদাসর্বদার জন্য মানুষ ইতিহাসের ক্রুর সত্য থেকে চ্যুত থাকবেন। কিন্তু ইনারা, পরানিয়তির অবতারদেরকে প্রায়শই ভুলে যান, আর ভুলে যান যে, এই ঈশ্বরকটি ব্যক্তির কাছে সমস্ত ইতিহাস তাঁর মানসনেত্রেই ধরা পরে যায়, তাঁকে ইতিহাসের পাতা থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে হয়না"।

দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা পিতা, এই সামর্থ্য কি কেবলমাত্র ঈশ্বরকটি অবতারদেরই থাকে? কনো জীবকটির এই গুনাগুণ থাকেনা কেন?"

ব্রহ্মসনাতন হাস্য প্রদান করে বললেন, "পুত্রী, ঈশ্বরকটি আর জীবকটির মধ্যে প্রাথমিক ভাবে বিশেষ কনো ভেদ থাকেনা। তাঁদের দেহগঠন, তাঁদের জীবনযাত্রা, সমস্ত কিছুই একই হয়। হ্যাঁ, মানবিকভাবে সামান্য ভেদ থাকে বটে, আর সেই ভেদ হলো সংস্কারের ভেদ।

পুত্রী, সংস্কার অন্য কিছুই নয়, তা হলো বিভিন্ন দেহধারণ থেকে যেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এক ব্রহ্মাণু, তার সমষ্টি। এই সংস্কারের মধ্যে যেমন সদ্ভাব, বিনয়ের মত উচ্চকটি গুণ থাকে, তেমনই দম্ভ, ভেদাভেদের ন্যায় নীচকটি গুণও থাকে। আর ঈশ্বরকটি নিয়তি-কাল-প্রকৃতি প্রেরিত দূত হন, যার উদয় এঁদের থেকেই হয়, আর সকলের মত লয় এঁদের অন্তরেই হয়। ব্রহ্মাণুদের সংসারের কল্যাণ সাধন করাই এঁদের জন্মদানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আর যেহেতু এঁদের কনো পূর্বজন্ম থাকেনা, তাই এঁদের মধ্যে কনো সংস্কারও থাকেনা। আর যেহেতু এঁদের অন্তরে কনো সংস্কার না থেকেই, এঁরা সরাসরি উচ্চতমযোনিতে জন্ম নেয়, তাই পুত্রী, এঁদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকেনা, জটিলতা থাকেনা, আমিত্বের বোধ থাকেনা, আর সেই কারণেই এঁরা সহজে সত্যমুখি হয়ে যান।

পুত্রী, যদি জীবকটিও সরাসরি এমন ভাবে মানুষ বা শ্রেষ্ঠ যোনিতে জন্ম নিতে পারতো, তবে এই কাজ তাঁদের পক্ষেও সহজ হতো। কিন্তু এঁরা স্বেচ্ছায় ভ্রমিত ব্রহ্মাণু, আর তাই নিজেদের ভ্রমের থেকে উন্নত হবার প্রয়াসের কারণে এঁরা প্রস্তর যোনি থেকে উন্নত হতে হতে, সমস্ত যোনির মধ্যে থেকে লাভ করা সমস্ত অভিজ্ঞতা ধারণ করে মানুষ বা শ্রেষ্ঠযোনিতে অবস্থান

করেন। তাই এঁরা সত্য সম্বন্ধে উদ্ভ্রান্ত, দিশাহীন, দৃষ্টিহীন। আর সেই দৃষ্টিহীনতা, সেই দিশাহীনতা এবং সেই উদ্ভ্রান্ত ভাব থেকে মুক্ত করে সত্যের অভিমুখে প্রেরণ করার জন্যই নিয়তি-কাল-প্রকৃতি নিজেদের দূত প্রেরণ করেন, তাঁর সর্বসন্তানের কল্যাণ উদ্দেশ্যে।

এ ছাড়া ঈশ্বরকটি আর জীবকটির মধ্যে তেমন কনো ভেদ নেই। তবে এঁদের একটি ভেদ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, যখন এঁরা সত্যে অর্থাৎ মহাশূন্যে লীন হয়ে যান, এবং জীবনের লক্ষ্য বা পরমার্থ প্রাপ্তি করেন। পুত্রী, এই পরমার্থ প্রাপ্তিকে এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে তা ঈশ্বরকটিরও পরমার্থ প্রাপ্তি। ঈশ্বরকটির পরমার্থ সত্যলাভ নয়, বরং সত্যলাভের উপরান্তে সত্যলাভের উপায় জগতকে বলায়, সত্যলাভের থেকে জগত কেন পিছিয়ে, কি করলে সেই দূরত্ব দূর হবে, তা বলায়।

সত্যলাভ জীবকটির পরমার্থ। সত্যলাভ হওয়াকেই, ব্রহ্মে বা মহাশূন্যে নিজের আমি, বা অহং, বা আত্ম, যেই ভাষাতেই বলো, তার লীন হয়ে সমাপ্তি হওয়াই জীবকটির লক্ষ্য এবং একেই জীব মোক্ষ বলে থাকে। এবার ভালোই বুঝতে পারছ পুত্রী যে, যেই মোক্ষ জীবকটির সমাপ্তি, জীবকটির মুক্তি, ঈশ্বরকটির সেখান থেকেই কর্মযজ্ঞের শুরু।

পুত্রী, জীবকটি এই মুক্তি লাভ করে, চিরতরের জন্য জীবনমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে, লীন হবার সাতদিবসের মধ্যে দেহত্যাগ করে চলে যান। আর ঈশ্বরকটি! ঈশ্বরকটির ক্ষেত্রে এটি মোক্ষ নয়, এটি নির্বিকল্প সমাধি। আর এই বিকল্পহীন মহাশূন্যে সমাধির শেষে ঈশ্বরকটির কি হয়?

পুত্রী, ঈশ্বরকটি কনো ভ্রমিত ব্রহ্মাণুর জীবনযাপন করেন না। তিনি এক আপেক্ষিক ব্রহ্মাণু, যার রচনা নিয়তি করেন লোকহিতের উদ্দেশ্যে। তাই এই সমাধির কালে, তাঁর এই আপেক্ষিক অহং বা আত্ম লীন হয়ে যায় শূন্যে, এবং তিনি স্বয়ং নিয়িতি, বা কাল বা প্রকৃতি হয়ে বিরাজ করেন।

পুত্রী, তোমাকে পূর্বেও বলেছি, স্বরূপে তিনি মহাশূন্য যাকে তোমরা বলো ব্রহ্ম। আর তাঁর তিন প্রকাশ; কারণ বেশে তিনি নিয়তি, সূক্ষ্ম বেশে তিনিই কালের নিয়ন্তা কালী, আর স্থূল বেশে

তিনিই প্রকৃতি। আর অবতারও এই তিন বেশেই উপস্থাপন করেন। সম্যক ভাবে নিয়তি হলেন ৯৬ কলা বিশিষ্ট, অর্থাৎ ৯৬ তত্ত্বের অধীশ্বরী তিনি।

এই সমস্ত কলার মধ্যে প্রথম ১৬ কলার অধীশ্বরী হলেন প্রকৃতি, প্রথম ৩২ কলার অধীশ্বরী হলেন কালী, এবং সম্যক ৯৬ কলার অধীশ্বরী হলেন স্বয়ং নিয়তি। কিন্তু আজ পর্যন্ত জগৎসংসার কখনো সম্পূর্ণ ৯৬ কলার অবতার দেখেন নি। যেখানে মার্কণ্ড ছিলেন ৩২ কলার অবতার, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কালী স্বরূপা, সেখানে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ছিলেন ১৬ কলা অবতার অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতি। যেখানে শঙ্কর ছিলেন ২৪ কলা অবতার, সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ৮ কলা অবতার। আবার রামকৃষ্ণ দেবকে পরানিয়তি ৩২ কলার অবতার করে স্থাপিত করেছিলেন, প্রথম ৬৪ কলা অবতার রূপে আমাকে স্থাপন করতে।

কিন্তু এই অবতারচক্র, যা এখন চলছে, তা জগতের বুকে শ্রেষ্ঠ অবতারধারা, কারণ আমাকে যেখানে ৬৪ কলার অবতার করে, নিয়িতি, কালী তথা প্রকৃতি, তিনকেই স্থাপিত রেখেছেন, সেখানে তোমাকে ৮ কলা অবতার করে স্থাপিত রেখেছেন, এবং তোমার হাত ধরেই আরো ৮ কলার অবতার প্রেরণ করবেন, এবং অন্তে ১৬ করলার পূর্ণ প্রকৃতি অবতার স্থাপন করে, সম্পূর্ণ ৯৬ কলার প্রকাশ করে, এবার পরানিয়িতি মনুষ্যকে সত্যে স্থাপনের অন্তিম প্রয়াস করবেন।

যাই হোক, পুত্রী, এই যখন আমি বা তুমি সত্যে লীন হয়ে গিয়ে, আর আমাদের আপেক্ষিক অণু বা আত্মকে ধারণ করে জীবিত থাকিনা, তখন আমরা পুর্ণাঙ্গ ভাবে মহাশূন্যের মধ্যেই বিরাজ করি। যিনি প্রকৃতি কলাতেই সীমাবদ্ধ, তিনি ব্যক্তিবিশেষের অতীত ভবিষ্যৎ দেখতে পান; আবার যিনি ১৬ কলা থেকে ৩২ কলার অবতার তিনি সম্পূর্ণ কালচক্রকেই দেখতে পান, আবার যিনি ৩২ কলার ঊর্ধ্বের অবতার, তিনি স্বয়ং নিয়তির কর্মভারে উপস্থিত থাকেন, তাই তাঁর বচনে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যনির্মাণও হয়।

তাই কথা এই যে, এমন নয় যে জীবকটি এই সামর্থ্যের অধিকারী নন। যখন তাঁরা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁরা এই সামর্থ্যেরই অধিকারী হন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের

জীবনের অন্ত সেখানেই হয়, কারণ তাঁরা নিয়তিনির্মিত আপেক্ষিক ব্রহ্মাণু নন, বরং স্বয়ং ভ্রমিত ব্রহ্মাণু, সেই কারণেই তাঁরা এই অকথিত ইতিহাসকে দর্শন করতেও পারেনা, আর লাভ করতেও পারেনা"।

দিব্যশ্রী নিজের অন্তরের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লাভ করে তৃপ্ত হয়ে বললেন, "পিতা, এবার ব্রাহ্মণদের কি হলো? আর বৈষ্ণবদেরই বা কি হলো? ব্রাহ্মণদের বিষদন্ত কি ছেদন হলো? আর বৈষ্ণবদের?"

ব্রহ্মসনাতন বললেন, "ফিরিঙ্গিদের আগমনে আর্যরা বিপাকে না পরলেও, বঙ্গে নিয়িতির কৃপাতে মনিষীর ভিড় লেগে যায়, ব্রাহ্মণদের এই পুণ্যক্ষেত্রে দমিত করার জন্য। প্রথম আঘাত আসে ব্রাহ্মসমাজের থেকে। ব্রাহ্মসমাজের পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্রের আঘাত সমানে ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে কোণঠাসা করতে থাকে।

এক এক করে, সতীদাহ প্রথার উৎখাত করা হয়, তথা বিধবা বিবাহ লাগু করে হয়, আর তাতে বাংলার মনিষীদের সাথে সঙ্গত দেয় ফিরিঙ্গিরা। এই দুই আঘাতেই, ব্রাহ্মণরা মোটামুটি কুপোকাত হয়ে গেছিল বঙ্গভূমিতে। কিন্তু, এর পরের দুইটি আঘাতে ব্রাহ্মণকুল সম্পূর্ণ ভাবে ঔদ্ধত্য ছেড়ে, সামান্য পুরোহিত হয়ে গেছিল, অন্তত এই বঙ্গভূমিতে তো নিশ্চিত ভাবে।

এঁই দুইয়ের মধ্যে প্রথম হলো ঈশ্বরচন্দ্রের বঙ্গভাষার নবীকরণ। পুরাতন বাংলা ভাষার কাঠিন্যের কারণে সংস্কৃতকে শিরোধার্য করে রাখছিল ব্রাহ্মণরা। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের বঙ্গভাষার নবীকরণের কারণে, বাংলাভাষার এমনই উত্থান হয় যে সাহিত্য সর্বজনের জন্য হয়ে ওঠে, আর ব্রাহ্মণরা বঙ্গভূমিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি, তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি হতে হতে, পিছিয়ে পরা জাতি হয়ে উঠতে শুরু করলো।

আর এঁর দ্বিতীয় আক্রমণ আসে ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে। বেদান্ত উপনিষদ ও তন্ত্র একাকার হয়ে যখন সম্মুখে আসে, তখন ব্রাহ্মণরা আর দাঁড়াবারও স্থান খুঁজে পায়না। আধ্যাত্মবাদের

প্রকোপে, ব্রাহ্মণদের সাজিয়ে রাখা ধর্মভীরুতা তাসের ঘরের মত ধসে পরে যেতে থাকলো। ক্রমশ এমন অবস্থা হলো যে, সমস্ত ব্রাহ্মণকুল বঙ্গদেশে প্রহসনের পাত্র হয়ে উঠতে থাকলো।

আর যতই তা হতে শুরু করলো, আর্যরা বঙ্গদেশের মানুষকে প্রথমে অধর্মী বলে প্রচার করতে শুরু করে, কিন্তু সেই দাবিও যখন মানুষের কাছে ধপে টিকলো না, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেবের কারণে, ও বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকদের দাপটের কারণে, তখন বঙ্গদেশের ব্যাপারে কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন ব্রাহ্মণরা। আর এক কথায় বলতে গেলে, প্রবল ভাবে আর্যরা বঙ্গভূমি এবং বঙ্গবাসিদের ভয় পেতে শুরু করলেন।

উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি সম্বন্ধে এক বিচিত্র ভাবের সঞ্চার হলো। যেখানে বাঙালি নামের থেকেই আর্যরা ভয়ার্ত থাকতে শুরু করলো, সেখানে সেই সমস্ত স্থানের স্থানীয়রা বঙ্গবাসীদের পৃষ্ঠপেশন শুরু করলেন। সমগ্র জগতকে অন্ন প্রদান করে, বঙ্গদেশ হয়ে ওঠে অন্নপূর্ণা। আর সেই অন্নের আড়তদার বাঙালী বনিকরা তখন বিশ্বের ধনিতম ব্যক্তি সমূহের একাকজন না হলেও, রাজা না হয়েও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধনি তখন বঙ্গদেশেরই মানুষ।

সঙ্গে তাঁরা সৌখিনও। ভেদাভেদের ধার ধারেনা, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গবাসী। আধুনিক বৈদান্তিক ধর্মের ধ্বজাধারি ব্রাহ্মণের অত্যাচারী হস্তের ছেদনকারী বাঙালীদের সৌখিনতা তাঁদের মুঘলদের আতরও ব্যবহার করাতো, মোঘলাই আহারও গ্রহণ করাতো, আবার ফিরিঙ্গিদের গাড়ি বা যন্ত্রেরও ব্যবহারঅ করাতো। সাথে সাথে, তাঁদের স্বভাবে রয়েছে সাহিত্য ও ভ্রমণ। আর তাই সমস্ত ভ্রমণযোগ্য স্থানে একমাত্র বাঙালীদের আনাগোনা।

আর তাই সেইস্থানের স্থানীয় মানুষরা যেই যৎসামান্য ধন উপার্জন করে, তা বাঙালীদের কারণেই। তাই বাঙালীকে আর্যরা যতই একঘরে করার প্রয়াস করলো বাংলার বাইরে, বাংলায় তাঁরা যেমন একঘরে হয়ে গেছে তার প্রতিশোধ নেবার প্রয়াসে, ততই তাঁরা নিজেরা কোণঠাসা হতে শুরু করলো।

সম্পূর্ণ ভারতভূমিতে ফিরিঙ্গিদের একমাত্র পছন্দের জাতি হলো বাঙালী। তাঁদের অসম্ভব মেধা, তাঁদের অসম্ভব পরিশ্রম করার সামর্থ্য, এবং তাঁদের উদার ভেদাভেদশূন্য মানসিকতা ফিরিঙ্গিদের অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। আর সেই ফিরিঙ্গিরাই ভারতশাসন করে রেখেছিল। তাই বাঙালীদের কিছুতেই একঘরে করতে পারলো না আর্যরা, যদিও এই একঘরে করে রাখার মানসিকতাকে এবং ইচ্ছাকে তাঁরা নিজেদের স্বভাবমতই ভুলল না।

আর সেই স্মৃতিপটে তুলে রাখা বাঙালীশত্রুতাকেই কাজে লাগাল আর্যরা এক ঘরশত্রু বিভীষণ বাঙালী, শ্যামাপ্রসাদ দ্বারা। অখণ্ড বঙ্গভূমি যেন অর্ধনারীশ্বর। সমস্ত জগতের অন্নদাতা সে। তাই বঙ্গদেশ অখণ্ড থাকলে, আর্যরা কনো ভাবেই বঙ্গদেশের উপর অধিকার স্থাপনে সক্ষম নয়। উপরন্তু বঙ্গবাসী ভেদাভেদ শূন্য, আর তাই এই দেশের যেই বিস্তীর্ণ ইসলাম মানুষ ছিলেন, তাঁরাও বঙ্গবাসীদের অধিক শক্তিশালী করে রেখেছিলেন।

তাই আর্যরা এই শ্যামাপ্রসাদের মস্তিষ্কলেহন করে করে, তাঁকে আর্যভাবাপন্ন করে তুলল, আর তাঁর দ্বারা বঙ্গদেশের অর্ধনারীশ্বরমূর্তির ছেদন করাল। এই অতিঘৃণ্য কর্ম ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এতাবৎ যেই যেই অপরাধ করে চলেছিল আর্যরা তাকে ক্ষমা করেছেন নিয়তি। কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গ করিয়ে, স্বয়ং নিয়তিকে নিজেদের শত্রু করে নিয়েছেন। স্বয়ং প্রকৃতি অঙ্গিকার করে নিয়েছেন যে আর্য ব্রাহ্মণের কুলে, আর কনো শর্ততেই অবতরণ সম্ভব নয়।

নিমাই, রামকৃষ্ণ অবতার ব্রাহ্মণগৃহেই হয়েছিল। ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করে, তাঁরা ব্রাহ্মণের অনাচার স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ করিয়ে, ব্রাহ্মণরা নিয়তিকে নিশ্চয় করতে বাধ্য করলেন যে, আজিবতকাল ব্রাহ্মণশ্রেণী ঈশ্বরের শত্রু অর্থাৎ শয়তান জাতি হয়েই বিরাজ করবে। কনো রূপ কৃপা তাঁদের উপর বর্ষিত হবেনা। না তাঁদের গোত্রে কনো অবতার আসবেন, আর না সাধক। ধর্মভ্রষ্ট মানবজাতি করে দেবেন নিয়িতি তাঁদের, আগামী ৩ শতকের মধ্যেই।

যেই অখণ্ড বাংলার কারণে ভারত ধনিদেশ হয়ে উঠতে পারতো, সেই অখণ্ড অর্ধনারীশ্বর বঙ্গভূমির প্রকৃতি ও পুরুষকে ভাগ করে দিলেন ব্রাহ্মণশ্রেণী। আর সেই ভাগের কারণে, ভারত দরিদ্র হতে শুরু করে দিল। অর্থাৎ ভারতকে গরিবদেশে পরিণত করার কাণ্ডারি অন্যকেউ নন আর্য ব্রাহ্মণ জাতি। এই ঘৃণ্য শয়তান জাতি এবার বাঙালীকে একঘরে করার প্রয়াস করতে থাকলো।

কিন্তু বঙ্গদেশ যে কনো দেবভূমি নয়, এ যে ঐশ্বরিক ভূমি, এ যে স্বয়ং পরানিয়তির, মহাকালীর, এবং পরাপ্রকৃতির বিচরণ ছেত্র। তাই শিক্ষা, কলা, ইত্যাদিতে বঙ্গদেশকে দমিয়ে রাখা অসম্ভব। হ্যাঁ, ফিরিঙ্গিদের শাসন থেকে মুক্ত ভারতের শাসকের আসনকে আর্য ব্রাহ্মণরা বরাবরই প্রভাবিত করতে চেয়েছে। আর তাই বঙ্গপুত্র সুভাষের দেখানো পথে এই ভারতের সেনানিবেশ হলেও, বঙ্গদেশ ও বঙ্গপুত্রদের নামে কনো সেনা ছাওনি করতে দেয়নি এই আর্যরা।

একই ভাবে, শাসকের আমলার স্থান থেকে বঙ্গবাসীদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সর্বস্বকিছু করল তাঁরা। কিন্তু কলা? বিদ্যা? সেখান থেকে বঙ্গবাসীকে কি করে সরিয়ে আনবে। সঙ্গীতজগতকে, শিক্ষার জগতকে, উদারতার জগতকে, কলা ও নাট্যের জগতকে বঙ্গদেশ আলোড়িত করতেই থাকলো। এবং বঙ্গভূমির গুরুত্ব কমিয়ে আনলেও, বঙ্গভূমির প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলো না আর্যরা কিছুতেই।

কিন্তু হ্যাঁ, তাঁরা নিজেরা ভারতের একটি মাত্র রাজ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে ফেলেন, এই সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে। আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে, দুটি ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। একটি হলো এই আর্যদেরকে পুনরায় সম্মুখে নিয়ে আসার জন্য, শয়তানের অবতার জন্ম গ্রহণ করে, পশ্চিম ভারতের উপকুলে। আর তাঁর অনেক পরে, বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করে, নিয়তির ৬৪ কলা অবতার, যিনি এবার বেদান্তের স্থাপন করতে আসেন নি, এসেছেন কৃতান্তের স্থাপন করতে, এবং মানুষকে তাঁদের চরম বিপদ থেকে রক্ষা করতে। ... পুত্রী, এবার আমি তোমাকে এক এক করে, সেই শয়তানের অবতারের অধিকার স্থাপিনের কথা বলবো, আর বলবো নিয়তির ৬৪

কলা অবতারের উত্থানের কাহিনী। এই দুই কথাই আমাদের বর্তমান প্রগতির কথাকে সমাপ্ত করবে, আর অতঃপরে আমরা ভবিষ্যতের বিকাশের কথায় যাত্রা করবো"।

দিব্যশ্রী বললেন, "আচ্ছা পিতা, শয়তানের মহাবতারকে কে আটকালেন? তাঁকে আটকানোর জন্যও কি প্রকৃতি কনো অবতার গ্রহণ করেছিলেন?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "না পুত্রী, তাঁকে আটকাবার জন্য, নিয়তিকে কনো পৃথকভাবে অবতার গ্রহণের প্রয়োজনই বা কোথায়? স্বয়ং বঙ্গভূমি মানবীয় অবতারবেশ ধারণ করে সম্মুখে ছিলেন, সেই শয়তানের মহাবতারকে অবরুদ্ধ করতে, এবং আর্যদের অন্তিম আগ্রাসনকে সমাপ্ত করে দিতে। পুত্রী, এই বঙ্গমাতার দেহধারণের পূর্বে, কিছু দিব্য কথনও আছে, যা কনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই আমি তোমাকে সেই কথাও বলছি।

পুত্রী, শয়তানের মহাবতার যখন আর্যভক্ত হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন পরানিয়িতি অবতারগ্রহণে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বঙ্গমাতা তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু গহন কথা বলেন। তিনি বলেন, "হে জগদম্বা, হে মাতঃ, বঙ্গভূমি ছেদন করে, জগদম্বার কর্মে আর্যরা পূর্বেই বাঁধা দিয়েছে। ফিরিঙ্গিমুক্ত বঙ্গভূমি যেখানে সমস্ত জগতের মাতা হয়ে, সমস্ত জগতকে শান্তি, সুস্থতা এবং সৌজন্যের পাঠ প্রদান করতে উদ্যত হচ্ছিল, সেখানে আর্যরা এঁরই ছেদন করে, জগদম্বার সন্তানপালনের কর্মে বাঁধা দিয়েছে।

মা, আমি তো তখন কি হচ্ছে, বা কি হতে চলেছে, এই সম্বন্ধে অজ্ঞাতই ছিলাম। তাই তখন এই ঘৃণ্য অপরাধকে আটকাতে পারিনি। তবে আজ আমি প্রস্তুত। মাতা, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন যাতে, আমি স্বয়ং মানবীয় দেহ ধারণ করে, এই আর্য আগ্রাসনের সমাপ্তি নিশ্চয় করতে পারি"।

জগদম্বা উত্তরে বললেন, "এই কাজ অতি সহজ হবে তা নয়। এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে এই শয়তানের অবতারই তোমার একমাত্র প্রতিদ্বন্ধি হবে। এই শয়তানের অবতারের জন্মগ্রহণের আগেও বহু শয়তান এই বঙ্গভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেছে। তাঁরা অনার্যের খোলস

পরে থাকবে, এবং এই বঙ্গভূমির সমস্ত কলকারখানাকে বন্ধ করে দিয়ে, এঁকে সম্যক ভাবে দরিদ্র করে তুলবে।

পুত্রী, এঁরা ভয়ানক এবং এঁরাই আর্যদের প্রথম দূত। ... এঁরা অন্য কেউ নয়, আর্যরা বঙ্গের নাশ করার জন্য যেই উত্তরখণ্ডে প্রবল অখণ্ড যজ্ঞ করেছিল, তার থেকে জাত এক ভয়ানক শয়তান প্রজাতি। আর্যদের পরিকল্পনা অনুসারে, প্রথমে এঁরা এই ভয়ানক ক্ষতিকর জাতিদ্বারা বঙ্গদেশকে পঙ্গু করে দেবে। অতঃপরে সেই শয়তানের মহাবতার বঙ্গদেশ সহ সম্যক ভারতকে নিজের পদতলে স্থাপিত করে পুনরায় আর্য আগ্রাসনের সূচনা করবে। ... তাই এই যুদ্ধ অতি সহজ হবেনা। এক জীবকটির পক্ষে এই যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন পুত্রী"।

বঙ্গমাতা উত্তরে বললেন, "মা, তোমার আমার উপর কৃপার অন্ত নেই। মহাবতার মার্কণ্ডকে আমার হৃদয়ে স্থাপিত করে আমাকে তন্ত্র দ্বারা ধন্য করেছ তুমি। তারপূর্বে মহাবতার কপিল দ্বারা সাংখ্য রচনা করে, আমার উপর কৃপাদৃষ্টি অর্পণ করেছ। অতঃপরে নিমাই ও রামকৃষ্ণ গদাধর দ্বারা আমাকে উচ্চাসন প্রদান করেছ। তাঁদের ছাড়াও অসামান্য প্রতিভায় পরিভাষিত অজস্র সন্তান প্রদান করেছ আমাকে। কলা, বিদ্যা, শিক্ষা, সাহিত্য, ক্রীড়া থেকে আরম্ভ করে নাট্য, ধর্ম, রাজনীতি, সর্বত্র তুমি আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব পদান করেছ। ... মা, এই সমস্ত কিছুর কারণে আমি তোমার কাছে ঋণী বলা ধৃষ্টতা হবে, কারণ তাকেই ঋণ বলা উচিত, যাকে শোধ করার প্রয়াস করা যায়। এই স্নেহের তো কনো পরিশোধই সম্ভব নয়।

তাই মা, একে আমি ঋণ বলতে পারছিনা, বরং তোমার প্রেম ও কৃপা বলতে চাই। আর মা, প্রেম ও কৃপা শোধ করা যায়না, কিন্তু তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করাতো যেতে পারে। তাই মা, আমি তোমার কাছে আবদার করছি, তোমার শক্তি আমাকে প্রদান করো, যাতে আমি এই শয়তানদের রাজ ও রাজত্ব উভয় থেকেই, তোমার অতিপ্রিয় এই পুণ্য বঙ্গভূমিকে রক্ষা করে, এঁকে পূর্বের মতই তোমার বিচরণক্ষেত্র করে রেখে দিতে পারি"।

মাতা এবার হাস্যমুখে বললেন, “তথাস্তু। যাও, তন্ত্রের রচনা যেই কালীঘাট থেকে হয়েছিল, সেখানেই তুমি জন্ম নাও। আমার কৃপা সদা তোমার সাথে থাকবে। অজস্র ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হবে কিন্তু তোমাকে। একাকী তোমাকে আর্য আগ্রাসনকে রুখতে হবে। অনার্যের খোলস পরা সেই আর্যরা একাকজন বিষধর সর্পের থেকে কনো অংশে কম নয়। আর তাদের কেউ তোমাকে দংশন করা থেকে নিজেদের প্রতিহত করবেনা।

সত্য বলতে, সমস্ত যুদ্ধ জয় করে, তোমার পঞ্চভূতের দেহ এতটাই ক্লান্ত হবে যে, সেই শয়তানের মহাবতার যখন তোমার সম্মুখে আসবে, তখন তোমার দেহে তেমন কনো বল থাকবেনা। ... তাই পুনরায় বিচার করে নাও, সিদ্ধান্ত নেবার আগে”।

বঙ্গমাতা নতমস্তক হয়ে বললেন, “মা, যুদ্ধ দেহবলে জয় করা যায়না। যুদ্ধ জয়ের জন্য আবশ্যক মনোবলও নয়। যুদ্ধ জয়ের জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো তোমার আশীর্বাদ ও কৃপা। যদি তোমার আশীর্বাদ ও কৃপা অক্ষুণ্ন থাকে আমার উপর, তাহলে আমি এই যুদ্ধে তোমারই মাধ্যম হবো মাত্র। আসলে মা, পরানিয়তি হলেন জগন্মাতা। কি বা আর্য আর কিবা অনার্য, কি বা শয়তান, আর কি বা শয়তানের মহাবতার, সকলেই তাঁর কাছে সন্তান। আর এক মাকে যদি তাঁর সন্তান নিধনের জন্য বাধ্য করা হয়, তা হলো শ্রেষ্ঠ অপরাধ।

মা, আমার নিজের কনো সামর্থ্য নেই। সমস্ত সামর্থ্য তোমার। কিন্তু আমি চাই যে এই যুদ্ধে আমি তোমার মাধ্যম হয়ে থাকি, যাতে জগন্মাতা নিজের সন্তানদের দমন করেছে, এই কালিমা আর্যরা তোমার উপর না ছেটাতে পারে। ... আশীর্বাদ করো মা, যেন বঙ্গভূমিকে পুনরায় শয়তান মুক্ত করে, তোমার বিচরণছেত্র রূপে এঁকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারি”।

জগদম্বা তথাস্তু বলে সেখান থেকে প্রস্থান করলে, সেই শয়তানের মহাবতার জন্মের কিছুবৎসরের মধ্যেই বঙ্গমাতা মহাধাম কালীঘাটের নিকটে, মাতা মহাকালীর আশীর্বাদ ধন্য হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, আর শুরু হলো সেই মহাসংগ্রাম, যার অন্তের কালে শুরু হয় নিয়তির মহাবতারের লীলা”।

মহাসংগ্রাম

ইতিহাস শ্রবণে মহাগ্রহী দিব্যশ্রীর উদ্দেশ্যে প্রভু ব্রহ্মসনাতন বলতে থাকলেন, "পুত্রী, মাতা যেই শয়তানের গোষ্ঠীর কথা বলেছিলেন, তাদের উত্থানে ভারতমাতা কম্পিত হয়ে গেছিলেন, দিশাহিন হয়ে গেছিলেন। এখানের সমস্ত মানুষ তখন তটস্থ হয়ে গেছিলেন, কারণ ঘরের বাইরে পা দিলে, কে যে পুনরায় ঘরে ফিরবে আর কে যে আর কনোদিনও ফিরবে না, তার কনো নিশ্চয়তা ছিলনা।

সংগ্রামের বাতাবরণ সর্বত্র, কিন্তু কি কারণে সংগ্রাম, তা কেউ জানেনা। তাঁদের নাকি বহু অমীমাংসিত দাবি, কিন্তু কি তাঁদের দাবি, তা কেউ জানেনা। যদিও, অন্য কেউ না জানলেও, তাঁরা নিজেরা সেই দাবি অবশ্যই জানতেন। দাবি ছিল, হাতবদলের। যেই শাসকগোষ্ঠী দেশের শাসন করছেন, সকলের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য প্রাণপণ দৌড়চ্ছেন, তাতে করে কেউ অধিক ভাগ পাচ্ছেনা, আর এই সংগ্রামী গোষ্ঠীর প্রয়োজন অধিক, সকলের থেকে অধিক, সর্বাধিক।

আর এই সর্বাধিকের নেশাই এই শয়তান গোষ্ঠীর সংগ্রামের মূলকারণ, যদিও সম্মুখে জনদরদি বলা ভুল হবে, জনগণকে মিথ্যা স্বপ্ন দেবার মত অনেক কথাই ছিল তাঁদের। আপামর জনতা কতটা সেই মিথ্যা কল্পনাতে ভুলেছিলেন, তা এক জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আপামর জনতা খেটে খাওয়া মানুষ, তাঁরা খুব ভালো করে জানে, কোনটি বাস্তব, আর কোনটি কল্পনা। তবে দুইপাতা বিদ্যা অর্জনকারীরা কল্পনার জগতে থাকতেই পছন্দ করেন। আর তাঁরা এই শয়তান গোষ্ঠীর কল্পনা উত্তেজক শব্দে অত্যন্ত প্রভাবিত হন।

তরবারির চাইতে কলমের জোর অধিক, জানা সত্ত্বেও, কলম ত্যাগ করে, তরবারি ধরলেন তাঁরা, এবং দলে দলে কল্পনা উত্তেজক শয়তান গোষ্ঠীর সাথে হাত মেলাতে শুরু করলেন। হতকুচ্ছিত এই শয়তান গোষ্ঠী, তবে কতটা কদর্য এই শয়তানের প্রকৃত রূপ, তার ধারনা কেউ করতে

পারছিলেন না। পারলেন তখন যখন এঁরা তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর থেকে শাসন ছিনিয়ে নিলেন।

সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করা শুরু করলেন তাঁরা, আর একবার তা করা হয়ে গেলে, তাঁদের নাট্য তাঁরা নিজেরাই ভুলে গেলেন। ত্যাগ, বিলাসিতা বিরোধ, সমস্তই যে গালগপ্প ছিল, তা আপামর জনতা বুঝে গেছিলেন, কারণ এঁরা যে মানুষের থেকে আয় করা সমস্ত অর্থকেই আপন সম্পদ জ্ঞানে কুক্ষিগত করা শুরু করে দিলেন।

নির্বাচন করার অধিকার আছে আপামর জনতার। কিন্তু এই শয়তান অত্যাচারী নবশাসক সেই অধিকারকেও ছিনিয়ে নিলেন একপ্রকার। বিরোধ করলে ঘরবাড়ি নয়, সম্যক গ্রামই উজাড় করে দিতেন; যার যা কিছু সম্পদ সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে নিতে শুরু করলেন; সরকারের চাকর করার নাম করে শিক্ষিতেরও সর্বস্ব লুণ্ঠন করা শুরু করে দিলেন, এবং সেই সমস্ত লুণ্ঠন করা ধনের একাংশ দ্বারা অর্থের বলে, অস্ত্রের বলে, আপামর জনতার নির্বাচন অধিকারও কেড়ে নিলেন।

এতেই শান্তি হয়নি তাঁদের, যেমন পরানিয়িতি বঙ্গমাতাকে বলেছিলেন, ঠিক সেই উপায়ে, একের পর এক কলকারখানা বন্ধ করে, বঙ্গভূমিকে হতদরিদ্র করে দিতে শুরু করলেন। শাসকগোষ্ঠীর সাথে যারা যুক্ত, তাদেরকেই শিক্ষকের পদে নিয়োগ করে, অযোগ্য শিক্ষকের কবলে সম্যক বঙ্গের মেধার ধ্বংসলীলা শুরু করলেন। ধ্বংস করা শুরু করলেন বঙ্গের কলা, শিল্প, নাট্যকলা, সঙ্গীতকলা, সর্বস্বকিছু।

আর এই সমস্ত কিছুর অন্তরালে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন বঙ্গমাতার অবতার, কালীঘাটের তরুণী। অকৃত্তিম অমানসিক সংগ্রাম ছিল তা। দেহের সর্বত্রে এই অত্যাচারী শাসক আঘাত করতে ছাড়েন নি। যেমন বঙ্গভূমিকে অত্যাচার করে চলেছিলেন, সমান ভাবে বঙ্গমাতার অবতারকে অত্যাচার করা শুরু করলেন। যেমন বঙ্গমাতার সম্যক হত্যার পরিকল্পনা করে চললেন, তেমনই বঙ্গমাতার অবতারেরও হত্যালীলার মঞ্চ একাধিকবার সাজালেন।

কিন্তু বঙ্গমাতার অবতার তিনি। তাই বঙ্গমাতার মতই অদম্য। আর অদম্য তাঁর বঙ্গ ও বঙ্গবাসীর প্রতি প্রেম। যতই নিষ্ঠুর হতে থাকলেন এই শয়তান প্রেরিত শাসকগোষ্ঠী, ততই অধিক মমতাময়ী হয়ে উঠলেন বঙ্গমাতার অবতার। আর বঙ্গবাসী তাই ক্রমে ক্রমে, তাঁকে আঁকড়ে ধরা শুরু করলেন। কিন্তু আঁকরে ধরলে কি হবে, নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই যে বশীভূত করে রয়েছেন এই শয়তান প্রেরিত দূত শাসকগোষ্ঠী।

কিন্তু বঙ্গমাতা মহাকালীর আশীর্বাদে, এই বশীকরণের উপায় নির্মাণ করলেন। আপামর বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, “একজনও নির্বাচনের অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন না। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নিজের মতামত নির্বাচনী তথ্যভাণ্ডারে জমা করুন। তাহলে এই শাসকগোষ্ঠী আর আপনাদের মতামত প্রদানকে আটকাতে পারবেননা”।

বঙ্গবাসী বঙ্গমাতার কথা শুনবেনা, তাও কি সম্ভব। যেমন বঙ্গমাতার অবতার বলেছিলেন, তেমনই করলেন বঙ্গবাসী। পরাজিত হলো শাসকগোষ্ঠী। অবসান হলো দীর্ঘ তিন দশকের শোষণ। কিন্তু হতাশ হলেন না শয়তানের গোষ্ঠী। যেই পরিমাণ শোষণ করেছেন তাঁরা, তাঁরা নিশ্চিত যে, বঙ্গদেশকে আর রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। কনো ভাবে আর বঙ্গদেশ নিজের মেরুদণ্ডকে আর সোজা রাখতে পারবেনা। আর এই ব্যর্থতাকে পুনরায় মানুষের কাছে দেখিয়ে, তাঁরা আবার শাসকের আসনে ফিরে, পুনরায় অত্যাচার, লুণ্ঠন করবে, এবং বঙ্গমাতার চিতাকে সজ্জ করবে।

কিন্তু শয়তান স্নেহ মমতা ও মাতৃত্বের কিই বা বোঝে! বঙ্গমাতার অবতার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে, দরিদ্র বঙ্গসন্তানদের পাশে দাঁড়াতে শুরু করে দিলেন। ধনধান্যে বঙ্গভূমি প্লাবিত হওয়া শুরু করলো। আর তাই আসতে শুরু হলো অর্থ। একদিকে যেই ঋণের বোঝায় বঙ্গমাতাকে শয়তান গোষ্ঠী মৃত্যু প্রদান করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই ঋণ শোধ করতে থাকলেন তিনি, আর অন্য দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপনে সহায়িকা হয়ে উঠলেন তিনি।

সাথে সাথে অজস্র রাজস্ব আয়ের উপায় করলেন। বঙ্গদেশের বাইরের অধিবাসীদের থেকে রাজস্ব আয়ের জন্য ভ্রমণের স্থানকে সুন্দর ভাবে সাজাতে শুরু করলেন, যাতে সেখান থেকে অধিক রাজস্ব আসতে শুরু করে, এবং সাথে সাথে যেই যেই স্থানে শয়তান শাসকগোষ্ঠী নিজের শয়তান সেনাদের নিয়োগ করে রেখে দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে অপসারিত করে, প্রবল কর্মসংস্কৃতির সঞ্চার করলেন।

ক্রমশ অধিক জনপ্রিয় হতে শুরু করলে, তিনি নিজের অর্থভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুললেন। আর ভরিয়ে তুলেই যা করলেন, তা হলো বঙ্গবাসীদের দুর্দশার অন্ত করা শুরু করলেন। স্বল্পব্যায়ে আহার প্রদান করলেন, শিক্ষার প্রসারের জন্য বৃত্তি প্রদান করা শুরু করলেন, এবং স্বামীদের কাছে প্রহৃত স্ত্রীদের হাতে অর্থ প্রদান করে, বঙ্গবাসীর অন্তরে শয়তানশাসকের যা কিছু ভীতি ছিল, তা প্রায় সম্পূর্ণ মুছে দিলেন।

প্রথম যুদ্ধে তিনি বিজয়ী। এখন তিনি বঙ্গভূমির মহারানী। তবে প্রকৃত যুদ্ধ যে তখন কেবল শুরুই হয়েছিল। শয়তানের মহাবতারের যে সবেই জাগরণ শুরু হল্যেছিল তখন। সবেই তো সেই মহাবতার অনার্য দমনের তরবারি হস্তে ধারণ করেছিলেন। অনার্যদের হনন তখন তো তিনি সবেই শুরু করেছেন।

ছল-চাতুরী ও ঋণ নেওয়া অর্থের বিনিময়ে শয়তান যেমন যান্ত্রিকতার বিস্তার করে, তেমন করেই তিনি প্রভাসের রাজত্ব অধিগ্রহণ করেন, আর তা করার পরেপরেই আর্যদের উদ্দেশ্যে জানান দিলেন যে অনার্য নিধনকারী শয়তানের মহাবতার অবতীর্ণ হয়ে নিজের কর্মের শুরু করে দিয়েছেন। জানান দেবার পদ্ধতিও অত্যন্ত ভয়াল শয়তানী ধারাতেই সম্পন্ন করেন তিনি।

প্রভাসের বুকেই এক মহা অনার্যনিধন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, শত শত অনার্যের বলি দেওয়া শুরু করে দেন, শাসকের তরবারিকে কুক্ষিগত করে রেখে। আর সেই কর্মের ফলে, আর্যরা পুনরায় সজ্জ হয়ে উঠলেন। সজ্জ হয়ে উঠলেন শামাপ্রসাদের বৃন্দগণরূপে যেই আর্যরা গাঢাকা দিয়েছিলেন, তাঁরাও। আর তাঁরা সকলে মিলে নিশ্চয় করলেন, এবার এই মহাবতারকে

ভারতভূমির শাসকের পদে উন্নীত করতেই হবে। তবেই বঙ্গের নাশ হবে, আর তবেই ভারত পুনরায় আর্যবত্র হয়ে উঠবে।

কিন্তু তা যে সহজ উপায়ে সম্ভব নয়। তাই শুরু করলেন জালিয়াতি। নির্বাচন পদ্ধতির কর্মকর্তাদের পদে স্থাপিত করলেন আর্যদের এবং শাসক করে স্থাপিত করলেন মহাবতারকে। ক্রমশ বিচারকের ভূমিকায়, ও সবস্ত রাজনীতির স্তম্ভের ভূমিকায় আর্যদের স্থাপন করলেন। যেখানে তা সম্ভব হলো না, সেখানে ভীতি সঞ্চার করে বা অর্থবিনিয়োগ করে করে, সমস্ত কিছুকে কুক্ষিগত করে নিলেন।

সমস্ত দেশের সমস্ত আদালতের সমস্ত রায় এই মহাবতারের পক্ষে আসা শুরু হলো, তা অন্যায় এবং চরম অন্যায় হলেও, আর্য মহাবতারের পক্ষেই আসা শুরু হলো। এবং এই মহাবতারের যত বিরোধী আছে, তাঁদেরকে লুণ্ঠনের মিথ্যা মোকদ্দমায় নিযুক্ত করে করে, সমস্ত অনার্য ও অনার্য সহায়ককারী ব্যক্তি ও সংস্থাকে অত্যাচার করা শুরু করে, সম্যক ভারতে এক মহা অত্যাচারের বাতাবরণ শুরু করলেন সেই মহাবতার।

আর সর্বভাবে সর্বরাজ্যের অনার্যদের নিজের পদতলে স্থাপিত হতে বাধ্য করে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বঙ্গদেশে। কিন্তু স্বয়ং বঙ্গমাতা এখানে স্থিতা মানবীয় রূপে। মানবীয়রূপে স্থিতা বলেই হয়তো, প্রথমদিকে সামান্য অত্যাচার করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু সামাল দিতে থাকলেন বঙ্গমাতা। অত্যাচারের শীর্ষে রইল বঞ্চনা, তো দ্বিতীয় স্থানে রইল প্রবঞ্চনা। তৃতীয় স্থানে রইল অরাজগতা, তো চতুর্থ স্থানে রইল বিপন্নতা।

সমগ্র ভারতে অনার্য অত্যাচারের আদলে বঙ্গদেশেও একই প্রকার অরাজগতা বিস্তার করার প্রয়াস করতে ছাড়েন না শয়তানের মহাবতার, কিন্তু বঙ্গমাতার সাথে যে সাখ্যাত নিয়তির আশীর্বাদ যুক্ত রয়েছে। তাই কিছুতেই মহাবতার সুবিধা করতে পারলেন না, কিছুতেই বঙ্গদেশে আর্যসমাজ স্থাপন করতে পারলেন না।

হাজার বঞ্চনা, সহস্র প্রবঞ্চনা, শতাধিক অরাজগতা করেও না তো বঙ্গমাতার অবতারকে টলাতে পারলেন, আর না বঙ্গবাসীকে ভ্রমিত করতে পারলেন। যেই প্রবঞ্চনার কারণে সম্পূর্ণ ভারত নতমস্তক হয়েছিল মহাবতারের কাছে, সেই প্রবঞ্চনার উত্তর দেওয়া হলো বঙ্গদেশ থেকে।

এক নয়, দুই নয়, তিন তিনবার আক্রমণ হানলো শয়তানের মহাবতার এই বঙ্গদেশের উপর, কিন্তু বঙ্গমাতা তাঁর প্রতিটি আক্রমণের উত্তর দিতে থাকলে, এবং মহাবতারকে পরাজিত করতে থাকলে, ক্রমশ বঙ্গমাতার অবতার সমস্ত ভারতে শয়তানের প্রকোপ থেকে উদ্ধারের প্রেরণা হয়ে উঠলেন। যুক্ত হলেন তাঁর সাথে সকলেই। বঙ্গসন্তানদের উপর চাপ আরো অধিক হয়ে উঠতে শুরু করলো। একদিকে বঙ্গমাতার কর্মচাপ, তো অন্যদিকে বিচারালয়কে, সংবাদমাধ্যমকে, এবং অন্যান্য মহলের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলো শয়তানের মহাবতার।

কিন্তু না তো বঙ্গমাতা আর না বঙ্গ সন্তানেরা লড়াই ছাড়লেন। মাটি কামরে পরে রইলেন সকলে। যতই আক্রমণ জরালো হলো, ততই অধিক মাটির প্রতি আকর্ষণ বাড়ল বঙ্গসন্তানদের। আর অবশেষে, বঙ্গমাতার অপরিসীম ধৈর্য, সন্তানদের প্রতি স্নেহ, এবং রাজনীতির সিদ্ধান্তকে যখন সম্পূর্ণ ভারত গ্রহণ করলো, এবং সকল অনার্যরা সংঘবদ্ধ হলেন শয়তানের প্রকোপ দূর করতে।

বিদেশিশক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এবার মহাবতার ভারতে যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি করার চক্রান্তে অংশগ্রহণ করলেন, এবং ওষধির নাম করে যান্ত্রিকতার বিষ প্রদান করতে শুরু করলেন। বঙ্গমাতা থাকতে বঙ্গভূমি ও বঙ্গবাসীর কিসের চিন্তা? সকলকে যেমন জোর করে নিজের নিজের রাজ্যের অধিবাসীদের বিষপ্রদান শুরু করলেন, বঙ্গমাতাকেও তেমনই করতে হতো। কিন্তু তিনি নির্দেশ দিলেন অত্যন্ত লঘুমানে সেই বিষ প্রদান করতে, যাতে রাজ্যবাসীর মধ্যে সেই বিষ তেমন ক্রিয়া করতেই না পারে।

সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে রোগভোগের বিস্তার হলো, বিশেষ করে শহরতলিতে। কিন্তু বঙ্গদেশ সুরক্ষিত রইলেন, আর সুরক্ষিত রইলেন সমস্ত দেশের কৃষকরা, যারাও এই আর্য মহাবতারের ক্রুর মনোভাবকে উপলব্ধি করে নিয়ে, এই বিষ ওষধি থেকে দূরে থাকেন। আর এবারে বঙ্গমাতার এই অসম্ভব জয়লাভের পর, ভারতের সমস্ত অনার্য নেতাদের বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, যদি কেউ এই শয়তান আর্য মহাবতারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করাতে পারে অনার্যদের, তা হলেন বঙ্গমাতার অবতার স্বয়ং।

আর তাই এবার সকলে বঙ্গমাতাকে মধ্যস্থলে রেখে, নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যেই বিদেশিশক্তির সাহায্যে ভারতের নির্বাচনী পদ্ধতিকে মহাবতার নিয়ন্ত্রণ করে শাসকের আসনে স্থিত ছিলেন, সেই বিদেশিশক্তিকে চারিদিক দিয়ে ঘেরার রাজনীতি করালেন তিনি। আর তার ফলে তৃতীয়বার শাসক হবার সম্মুখে এসে গেল মহাবতারের কাছে বিপদের ঘনঘটা। বিদেশিশক্তির সহায়তা এবার আর তিনি লাভ করবেন না।

নিজস্ব সামর্থ্যে জনগণের মন পেতে হবে তাঁকে। আর এমনই পরিস্থিতিতে শুরু হয় নির্বাচন প্রক্রিয়া, আর তাতে শয়তানের মহাবতারের বিশ্রী পরাজয়ের সূচনা হয়, জা চতুর্থ নির্বাচনে গিয়ে তানর পরাজয়কে নিশ্চিত করে। পরাজিত হয়ে, অনার্য শোষণ বন্ধ হলেও, আর্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে মহাবতার। কিন্তু বঙ্গমাতা পশ্চাতে থেকে একটি একটি করে আইন নির্মাণ করে, সেই সমস্ত আর্য প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে স্তব্ধ করে দেন।

অতঃপরে, সাধারণ জনতাকে উত্তপ্ত করার প্রয়াস করেন মহাবতার আর্যবিরোধী শাসক রূপে বিরোধী সরকারকে আক্রমণ করে। কিন্তু বঙ্গমাতা সকলকে বললেন, “সকলের আহার, নিদ্রা যেন সুসম্পন্ন হয়, সেই দিকে মন দিতে। আপামর জনতা সুখেশান্তিতে জীবনযাপন করতেই মনযোগী। তা যদি করতে পারেন তাঁরা, তাহলে কারুর কনো কথাই তাঁদের কানে প্রবেশ করবেনা।

সেই দিকে মনঃসংযোগ করতে থাকলে, মহাবতার ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা লাভ করতে করতে, এক সময়ে দেহত্যাগ করেন, এবং সেইকালের জন্য আর্যপ্রতিষ্ঠা স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং বঙ্গভূমি সুরক্ষিত থাকে বঙ্গমাতার অবতারের অসামান্য বৈপ্লবিক জীবনের কারণে, এবং বঙ্গবাসীর কাছে তিনি চিরস্মরণীয় থেকে, ভবলীলা ত্যাগ করে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হলেন, এবং বললেন, "মা তুমি স্বয়ং দেহধারণ করে রইলে, অথচ আমি মানবীয় বিকারে থাকার কারণে সেই সংবাদও পেলাম না! ... জানতে পারলে তোমার সাখ্যাতে সেবা করতে পারতাম"।

আমি তাঁকে হেসে বললাম, "পুত্রী, সেবা করার প্রথমাধিকার সন্তানের নয়, মাতার। আর তাই আমি সেবা পেতে আসিনি, আমি সেবা করতে এসেছি। আমার কর্মকাণ্ডের শুরু হয়েছে সবে। অনেক কর্ম এখনো বাকি। আর্যদের সমূলে বিনাশ করে, সকলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে, মোক্ষদ্বার উন্মোচন করলে, তবেই আমার কর্ম সম্পন্ন হবে। তোমার অসাধারণ বৈপ্লবিক জীবন সত্যই বঙ্গবাসীর জন্য এক উপহার। তোমার অবতার গ্রহণ সার্থক হয়েছে পুত্রী। এবার আমাকে আমার কর্ম সম্পন্ন করতে দাও"।

বঙ্গমাতা নিজের অবতারের স্থূল দেহ আগেই ত্যাগ করেছিলেন। সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করে, আবার তিনি বঙ্গভূমিতে বিলীন হলেন। আর তারপর শুরু হলো এক নতুন ক্রিয়াধারা, যা তুমি এক্ষণেও দেখছ। আর পুত্রী, স্মরণ রেখো যে, এক্ষণে যা হচ্ছে, বা আগামীদিনে যা কিছু হবে, সেই সমস্ত আমার অঙ্গুলিহেলনেই সম্ভব হচ্ছে ও হবে"।

দিব্যশ্রী বললেন, "মা ... আমি তোমার সম্পূর্ণ জীবনের বর্ণনা পেতে চাই। না... ভৌতিক জীবনের কথা শুনতে আগ্রহী নই আমি। আমি আগ্রহী আমার মায়ের কাণ্ড জানতে। আপনি তাঁর শ্রেষ্ঠসম্ভব অবতার। তাই আপনাকে মধ্যে রেখে, তিনি কিছুই করেন নি। যাকিছু করেছেন তা আপনিই করেছেন, কারণ আপনি স্বয়ং তিনিই। তাই মা, আমি জানতে চাই যে আপনি কি কি করেছেন। বা যদি ভৌতিক অর্থে প্রশ্ন করতে বলেন তবে আমার প্রশ্ন এই যে, পিতা, কৃপা করে আমাকে বলুন যে মাতা কি করলেন আপনাকে সম্মুখে রেখে"।

নিয়তি বিস্তার

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা আমি করিনি। এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছেন, আমার সত্যতা স্বীকারে অনিচ্ছাকৃত আমার অণুরা। আর তাঁরা এই রচনা করেন, তাঁদের ত্রিগুণদ্বারা। তাই পুত্রী, এই ব্রহ্মাণ্ড সঠিক রইল না রসাতলে গেল, সেই নিয়ে আমার বিন্দুবিসর্গ চিন্তা থাকেনা। তবে হ্যাঁ, এই সমস্ত ব্রহ্মাণু আমার সন্তান। আমি তাঁদেরকে জন্ম দিইনি, আমার থেকে পৃথক অস্তিত্বও সম্ভব নয় এঁদের কনো কালেই।

কিন্তু তাও তাঁরা যেহেতু আমার থেকে নিজেদের ভিন্ন বোধ করে আমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে তাঁরা এমন বোধ করে, সেহেতু আমি তাঁদেরকে আমার সন্তান না বলে অবস্থান করতে পারিনা। পুত্রী, সন্তান যদি বালু নিয়ে ক্রীড়া করে কিছু নির্মাণ করে, তার প্রতি সন্তানের জননীর কনো স্নেহ, কনো সম্বন্ধ না থাকলেও, একটি সম্বন্ধ থেকেই যায়, কারণ সেই বালু নির্মিত ক্রীড়া সেই জননীর সন্তানকে প্রীতি প্রদান করেছে।

পুত্রী, এক জননীর কাছে তাঁর সন্তানের যা যা কিছুতে প্রীতি অনুভব হয়, সেই সমস্ত কিছু অত্যন্ত প্রিয় হয়। তেমনই কারণে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সাথে আমার কনো সংযোগ বা সম্বন্ধ না থাকলেও, যেহেতু এঁর নির্মাতা আমার সন্তান, এবং যেহেতু এই ক্রীড়া আমার সন্তানকে অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করেছে, তাই এই ব্রহ্মাণ্ড আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

যেমন সেই ক্রীড়া যার নির্মিত, সেই সন্তান স্বয়ং যদি না বিনষ্ট করে সেই ক্রীড়াকে, তাহলেও তার জননী সেই ক্রীড়াকে যত্নসহকারে সামলে রাখেন, তেমনই আমার সন্তানদের নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডকে যতক্ষণ না আমার সন্তানরা স্বয়ং বিনষ্ট করেন, ততক্ষণ আমি সেই ব্রহ্মাণ্ডকে সামলে রাখি। কিন্তু পুত্রী, সন্তানকেও বুঝতে হয় যে, এই ক্রীড়া করে চলাই তাঁর জীবনের একমাত্র কর্ম নয়; তাঁকে এই ক্রীড়া একসময়ে সমাপ্ত করে, বাকি জীবনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়।

কিন্তু সন্তান যদি তা না বোঝে, তাহলে জননীর কর্তব্য কি? জননীর কর্তব্য হলো, সন্তানকে সেই ক্রীড়া সমাপ্ত করার প্রেরণা প্রদান করা, এবং সত্যে মনযোগী করে তোলা। তেমনই পুত্রী, ব্রহ্মাণুরা যখন ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের ক্রীড়াতেই দিবারাত্র মেতে থাকে, তখন তাঁদের জীবন লাভের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সত্যলাভ বা আমাতে প্রত্যাবর্তন করা, সেটিই যখন ভুলে যায়, তখন আমাকে অবতার গ্রহণ করতে হয়, এবং সন্তানকে তাঁর ক্রীড়া সমাপ্ত করে, আমার কাছে আসার আবাহন প্রদান করতে হয়।

অর্থাৎ পুত্রী, আমার অবতার গ্রহণের একটিই কারণ, আর তা হলো সন্তানকে নিজের কাছে ডেকে নেওয়া, কারণ সন্তান ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে, সমস্ত কিছু ভুলে গেছে। ঠিক যেমন সন্তান যখন মনোযোগ সহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রীড়া করে চলে, তখন জননী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন, আর সন্তান তাঁর জননীকে দেখে বোঝেন যে, তাঁর ক্রীড়ার সময় সমাপ্ত হয়েছে, আর মাতার হাত ধরে ক্রীড়া ছেড়ে চলে যান, এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই।

কিন্তু ব্রহ্মাণুরা এবারের ক্রীড়ায় অত্যধিক মেতে রয়েছে। চৈতন্য রূপে আমি এসেছি, তাতেও এঁরা ক্রীড়া ত্যাগ করেনি, রামকৃষ্ণ রূপে আমি এসেছি, তবুও এঁরা ক্রীড়া ত্যাগ করেনি। তাই এবার মাতাকে নিজের অঙ্গুলি বক্র করতেই হলো ঘৃত নিষ্কাসনের জন্য। আর সেই অঙ্গুলি হেলনের কর্ম করার জন্যই এবারের আমার অবতার গ্রহণ।

পুত্রী, মাতার কাজ কেবল সন্তানকে ক্রীড়া থেকে সরিয়ে আনাই নয়। মাতার কাজ হলো সন্তানের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করা যে ক্রীড়া থেকে সরে আসতে হয়, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ মাতার এই যে, সন্তানের মধ্যে এই চেতনাকে জাগ্রত রেখে দেওয়া, যাতে সে নিজে নিজেই সঠিক সময়ে ক্রীড়া ছেড়ে চলে আসে।

তাই এবারের অবতারের আমি চারটি অধ্যায় রাখতে আগ্রহী হই, যেখানে প্রথম অধ্যায়তে আমি আমার সন্তানদের ক্রীড়া অবসান কখন করা উচিত, কি ভাবে করা উচিত, তা বলতে পারি; দ্বিতীয় চরণে যা যা আমি বললাম, সেই সমস্ত কিছুকে সন্তানের মধ্যে স্থাপন করা যেতে পারে,

তৃতীয় অধ্যায়ে সন্তানকে ক্রীড়া থেকে অপসারিত করা যেতে পারে, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে এই চেতনা অর্থাৎ ক্রীড়া থেকে অপসারিত হতে হয়, তাকে জাগ্রত রাখা যেতে পারে।

এঁদের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের কর্মই হলো সমস্ত কর্মের ভিত্তি, আর তাই স্বয়ং আমি ৬৪ কলারূপ ধারণ করে এসেছি সেই ক্রিয়া করতে। এই অবতারে আমি কখন কি ভাবে ক্রীড়া থেকে অপসারিত হতে হয়, তা বলতে এসেছি। আমার পরে তুমি এসেছ, আমারই ৮ কলা রূপ ধারণ করে, যে সন্তানদের মধ্যে আমি যা যা বলে গেলাম, তা স্থাপন করবে। তোমার এই কর্মকে সম্ভব করবে, তোমারই পরিপূরক, যেও আমারই আরো এক ৮ কলারূপ হবে।

তোমাদের দাম্পত্য থেকে উদ্ভব হবে আমার এই ক্রীড়ার অন্তিম অবতার যিনি হবেন আমার ১৬ কলারূপ। আর তিনি তোমাদের কৃত্যকে প্রসারিত করবে, এবং আমার কথন মেনে, আর তোমাদের কর্মধারা মেনে, বহু সন্তানকে তাঁদের ক্রীড়া থেকে অপসারিত করবে। এমন কর্মধারা প্রথমবার করা হচ্ছে, তেমন কিন্তু নয়।

কালের অবধি রেখে, শঙ্কর এমনই ভাবে সন্তানদের ক্রীড়া থেকে অপসারিত করার ধারা রচনা করেছেন অদ্বৈত বেদান্ত রূপে। চৈতন্য সেই রচনা মেনেই বহুসন্তানের কাছে সেই ক্রীড়া অপসারণের বার্তা প্রদান করেছেন। আর রামকৃষ্ণ সেই বার্তা প্রদান আর রচনাধারাকে ধারণ করেই বহুসন্তানকে ক্রীড়া থেকে অপসারণও করেছেন। এমনকি এই সমস্ত কর্মের চেতনাকে অক্ষয় রাখতে বিবেকানন্দকেও নিযুক্ত করেন রামকৃষ্ণ।

কিন্তু সমস্ত কিছু একই ধারায় চালিত হলে যেমন চেতনাপ্রবাহকের কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার থাকে, তেমনটা থাকেনা যদি এই সমস্ত স্তরের মধ্যে অবধি এসে যায়। তাই এবারে আমি সেই একই কর্ম করছি, কিন্তু কনো অবধি না রেখে, আর আরো অধিক বিস্তৃত ধারাপাতে।

একটি অবতার ক্রিয়া থেকে অন্য অবতার ক্রিয়ায় এবার আমি কনো অবধি রাখিনি। আমি এসে সেই রচনা করলাম কৃতান্ত রূপে, এবং কৃতান্তের প্রবাহধারাকে অক্ষয় রাখতে, কৃতান্তিকা রচনা করে সম্যক ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাণ্ডুলিপি রাখলাম, এবং শেষে অনুশাসন রচনা

করে, আগামীদিনের সম্যক কর্মসূচিকে স্বচ্ছ রেখে গেলাম। আর তারপরেই তুমি এলে পুত্রী, সঙ্গে তোমার সঙ্গী রূপে, আমার আরো এক অংশরূপ।

তোমরা দুইয়ে মিলে আমার রচনাকে প্রসার করে, সমস্ত সেই সন্তানদের একত্রিত করবে, যাদেরকে ক্রীড়াথেকে মুক্ত করবে আমার তৃতীয় প্রকাশ যিনি ১৬ কলা রূপ আমার। আর তার পরে পরেই, এক নয়, চার চারটি মানব প্রজন্ম এই চেতনাধারাকে অব্যাহত রেখে, ৭ পিড়ি ব্যাপী কৃতান্ত ধারাকে প্রসারিত রেখে, এই ক্রীড়ায় মনোযোগ প্রদানকারী আর্যদেরকে কোণঠাসা করে দেবে, এবং বৌদ্ধধারার পর প্রথমবার জগতে মোক্ষদ্বারের স্থাপনা করবে।

পুত্রী, এমন ভেবো না যে, এই ৭ পিড়ি পর্যন্তই এই ধারা চলবে। এই সাত পিড়ির রচনা তো স্বয়ং আমিই করে যাচ্ছি। এই ৭ পিড়ির পরেও, আরো ২৩টি পিড়ি এই ধারাকে চালাতে থাকবে, এবং সর্বসাকুল্যে এই ধারা দেড় হাজার বৎসর চলবে, যতক্ষণ না পুনরায় আর্যদের উত্থান হবে। পুত্রী তুমিও জানো কেন এই শয়তানের বংশধর আর্যদের উত্থান কালে কালে আবশ্যক।

পুত্রী, আমার সন্তানরা, অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণুরা যখন যখন সুখশান্তি লাভ করে ফেলে, তখন তখন নতুন নতুন ভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্রীড়ায় মেতে ওঠে। তাই এই আর্যদেরও প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তাঁরাই এই সুখশান্তির বিনাশ ঘটায়, এবং আমাকে ব্রহ্মাণ্ডক্রীড়ার লয়ের আবশ্যতা সম্মুখে আনতে সহায়তা করে। পুত্রী, যদি এঁদের কনো গুরুত্বই না থাকতো, তাহলে এতদিনে এঁরা ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিলীন হয়ে যেত, তা নিশ্চয়ই তুমি জানো"।

দিব্যশ্রী বললেন, "প্রথম তিন পিড়ি আপনার অবতার, আপনি স্বয়ং, আপনার দুটি ৮ কলার অবতার, এবং একটি ১৬ কলার অবতার। ... পরের চারটি পিড়িকেও আপনি নির্মাণ করে যাচ্ছেন? তাঁরা কি মনুষ্য? তাঁরা কি জীবকটি?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, এই ক্রীড়া বহু পুরাতন। এই চার পিড়িকে স্থাপিত রেখে, ক্রীড়ামুক্তির চেতনাকে অব্যাহত রাখবো বলে, ১০ জন্মব্যাপী, এঁদেরকে একাকটি বিচিত্র চক্রে স্থাপিত রেখেছি। কখনো এঁরা এক স্বামীর তিন স্ত্রী, তো কখনো এঁরা এক পিতার তিন সন্তান,

তো কখনো এক শিক্ষকের তিন ছাত্র। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে, এঁদের সম্মুখে একজনকে রেখেছি, যে এই ব্রহ্মাণ্ড ক্রীড়া থেকে মুক্তির জন্য গৃহত্যাগী।

কখনো সেই বালক গৌতমের অনুগামী, তো কখনো শঙ্করের; কখনো সে তন্ত্র উপাচারি তো কখনো অঘোরী; আবার কখনো সে চৈতন্য অনুগামী, তো কখনো বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। কিন্তু সদাই তাঁদের সম্মুখে ১০ জন্ম ধরে এঁদের চারজনের সম্মুখে রেখেছি, যেখানে এঁদের যেকোনো দুই থেকে তিনজন সেই বালকের মত মমতাসম্পন্ন হয়ে, সেই বালকের সমর্থক, আর এঁদের যেকোনো এক থেকে দুইজন এই বালকের মতধারাকে আর্যমতধারা দ্বারা বিরোধ করেন।

আর এই ভাবে আমি তাঁদেরকে ১০ জন্মব্যাপী একটি টানাপড়েনের মধ্যে রেখেছি, যেখানে থেকে তাঁরা কখনো ভেবে গেছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডক্রীড়া থেকে মুক্তির উপায় থাকা উচিত, যাতে যে এই ক্রীড়া থেকে মুক্ত হতে চায়, সে মুক্ত হতে সক্ষম হয়, আবার অন্য সময়ে ভেবে গেছে যে এই মুক্তি অসম্ভব। এমন টানাপড়েনের মধ্যে রেখে, এবার আমি তাঁদেরকে আমার অবতার গ্রহণের কালেই, চারটি দেহ প্রদান করেছি।

এঁদের মধ্যে একজন বাদে সকলেই আর্যদের সংস্পর্শে স্থাপিত। একজন সার্বিক ভাবে আর্যদের মধ্যে বিরাজ করে, আর্যদের সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখছে। পুত্রী, ইনি হলেন ষষ্ঠ পিড়ি, যিনি আর্যদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এঁদের মধ্যে একজন অনার্য হয়েও বৈষ্ণবক্রীড়াকে সম্যক দৃষ্টিতে দেখে জীবনের অন্তে বৈষ্ণবকুলের প্রতি বিরক্ত হয়ে দেহত্যাগ করবেন। ইনিও আর্যদের জীবন বিপন্ন করে দেবেন, তবে তার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই যে, ইনি বৈষ্ণবদের জীবনধারা সম্পূর্ণ ভাবে সমাপ্ত করে দেবেন।

এঁদের মধ্যে একজন বঙ্গভূমির আর্যদের কুলে জন্ম নিয়েছেন। ইনি হবেন সপ্তম পিড়ি, যিনি আর্যদেরকে বঙ্গদেশ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। আর এঁদের মধ্যে একজন আর্যদের সঙ্গেই ওঠাবসা করেন। ইনি হলেন চতুর্থ পিড়ি, এবং ইনি অত্যন্ত কঠিন অবস্থান নেবেন আর্যদের বিপক্ষে।

পুত্রী, এঁদের সকলকে আমার অবতার গ্রহণের কালেই দেহধারণ করানোর দুটি কারণ। প্রথমত এঁদের সকলের কাছে কৃতান্ত শব্দটি কেবল পরিচিতই রইল না, সকলের হৃদয়ে কৃতান্ত শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা তাঁদেরকে এই মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করানোর জন্য সঠিক সময়ে টেনে আনবে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো প্রস্তুতি। যিনি সপ্তম পিড়ি হবেন, তাঁকে কেবলই অহংকার ও মদের ভেদ জানিয়ে অপসারিত করা হয়েছে। কারণ এই দেহ ত্যাগের ২৫০ বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করে, অধিক স্মৃতি তাঁর থাকবে না।

যিনি ষষ্ঠ পিড়ি হবেন, তাঁর কাছে এটুকুই বলা হয়েছে যে আর্যরা মিথ্যাচারী। তিনি স্বয়ং এক গোঁড়া আর্যসমাজে রয়েছেন। তাই আর্যদের সম্যক ভাবে দেখে নিয়ে, এই দেহ ত্যাগের ২০০ বৎসর পরে আবার দেহ ধারণ করে ইনি আসবেন। যিনি পঞ্চম পিড়ি, তাঁকে আধ্যাত্ম ও কৃতান্ত সম্বন্ধে, অর্থাৎ মহাজ্ঞান ও প্রেমের সম্বন্ধে ধারনা প্রদান করে, বৈষ্ণবদের অনাচার দর্শন করার জন্য তাঁদের কুলেই রাখা হয়েছে। ইনি এই দেহত্যাগের ১৫০ বৎসর পরে এসে, বৈষ্ণবদের বাড়বাড়ন্তকে সম্পূর্ণ সমাপ্ত করে, কৃতান্ত স্থাপনায় গতিশীল হবেন।

আর অন্তে যিনি চতুর্থ পিড়ি, তাঁকে সম্যক ভাবে কৃতান্তিক শাসনের পাঠ আমি স্বয়ং পড়াচ্ছি। যাতে সে এই দেহ ত্যাগের, এক শত বৎসর পরে এসে, সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত থাকেন কৃতান্তিক সমাজকে ব্যবস্থিত করতে। এঁর অধিক আমি তোমাকে আর কিছুই বলবো না, এই চার পিড়ির ব্যাপারে। তবে হ্যাঁ, যেমন তোমাদের ক্রিয়াধারা সম্বন্ধে আমি বিস্তারে বলে যাচ্ছি তোমাকে। এঁতে তোমারও কর্ম করতে সহজ হবে, এবং তোমার পরবর্তী কর্ণধারকেও মার্গদর্শন করতে সহজ হবে।

আর আমি জানি তুমি আমার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। তাই অতি সংক্ষেপে বলছি, আমি এখনো পর্যন্ত পরানিয়তির গ্রহণ করা সর্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরকটি অবতার, কারণ এঁর পূর্বে কখনোই ৬৪ কলা অবতার গ্রহণ করেন নি পরব্রহ্ম বা পরানিয়তি। ... আমার দেহধারণ আবশ্যক ছিল, কারণ নিয়তিতত্ত্বের ব্যখ্যা প্রদান আবশ্যক হয়েগেছিল, এবং আবশ্যক হয়েগেছিল আর্যদের ত্রিগুণকে ত্রিদেব আখ্যা দিয়ে যেই মিথ্যাচার চলছে, তার সত্যতার বিবরণ প্রদান করা।

আমার দেহধারণ আবশ্যক হয়ে গেছিল কারণ, এক ৬৪ কলা অবতারই নিয়তিবেশ ধারণ করতে সক্ষম। আর নিয়িতিবেশ ধারণ করলে, তবেই তন্ত্রের বাস্তবতা, আর্যদের বাস্তবিকতা, এবং মোক্ষদ্বারের নির্মাণের কর্মসূচির নির্মাণ সম্ভব হতো। পুত্রী, পূর্বেও বলেছি, শঙ্করের উত্তরসূরি হলেন চৈতন্য, চৈতন্যের উত্তরসূরি রামকৃষ্ণ ঠাকুর, এবং রামকৃষ্ণ ঠাকুরের উত্তরসূরি হলেন বিবেকানন্দ।

তবে এঁরা কেউই নিজের উত্তরসূরির কর্মধারাকে প্রসারিতই করে যেতে পারেননি, কারণ ৬৪ কলা অবতার না হবার কারণে, নিয়িতির নির্মিত কালের ধারনা তাঁদের ছিলনা, আর তাই পরবর্তী অবতারকে পূর্বের অবতারের সূত্রকে ধারণ করে, তবেই ক্রিয়া করতে হয়েছে, যেই পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই ভুলত্রুটি হয়েছে। তাই আমার জন্ম আবশ্যক ছিল ৬৪ কলাররূপ ধারণ করে।

কারণ আমাকে যে ৭ পিড়ির কর্মধারা নির্মাণ করে যেতে হতো, আর তা নিয়তির কলাবিদ্যাধারি অবতার না হলে যে সম্ভব হতো না। তাই পুত্রী, আমাকে আসতে হয়েছে। কৃতান্ত নির্মাণের জন্য আসতে হয়েছে যেখানের নিয়তির সত্যতার বিবরণ প্রদান করেছি আমি, যা আমি ছাড়া কেউ করতে সক্ষম হতো না। আর্যদের কীর্তি ও তন্ত্রের সত্যতা বলতে আসতে হয়েছে, যা নিয়তি ব্যতীত কারুর পক্ষেই বিবৃত করা সম্ভব ছিলনা। আর ৭ পিড়ির কর্মধারা রূপে অনুশাসনকে নির্মাণ করতে আসতে হয়েছে, যাও আমি ছাড়া আর কেউ করতে সক্ষম হতেন না।

এর অধিক আমার সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলার নেই পুত্রী। এবার আমি তোমার ও তুমি ছাড়া অন্য দুই ঈশ্বরকটি অবতারের ক্রিয়াধারা সম্বন্ধে বলবো, যা বর্তমান নয়, এই কালের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তা হলো ভবিষ্যৎ। পুত্রী, মন যদি একক ভাবে কনোকিছুতে একাগ্র হয়, তাকে বলা হয় একাগ্রচিত্ত। এই মন ও সেই বস্তুর মধ্যে অন্যভূতরা এসে গেলে, মনঃসংযোগ বিনষ্ট হয়।

এর যথার্থ বৈজ্ঞানিক কারণও আছে পুত্রী। আমাদের পঞ্চভূত হলেন মন অর্থাৎ আকাশ, বুদ্ধি অর্থাৎ জল, উর্জা অর্থাৎ অগ্নি, প্রাণ অর্থাৎ পবন, এবং দেহ অর্থাৎ ধরিত্রী। পুত্রী, জল কখনোই স্থির থাকেনা, বায়ুও, ধরিত্রীও সদাই চলমান এবং অগ্নিও। এঁদের স্বভাবই চঞ্চলতা। আর তাই যখনই মন অর্থাৎ স্থির আকাশ এবং যার উপর মনস্থাপন হবে, তার মধ্যে এই চার চঞ্চলমতি ভূত, অর্থাৎ বায়ু, জল, অগ্নি, এবং ধরিত্রী এসে যায়, সেই মুহূর্তেই একাগ্রতা ভঙ্গ হয়ে যায়।

তাই, এখন আমি যা কিছু বলবো তোমাকে, তার আর তোমার মনের মধ্যে অন্য কনো ভূতকে প্রবেশ করতে না দিয়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে শ্রবণ করো”।

ভবিষ্যৎ বিকাশ

ব্রহ্মসনাতন হাস্যবদনে বলতে থাকলেন, “পুত্রী, জীবের কাছে ভবিষ্যৎ হলো একটি ছায়া, যাকে কেউ কেউ বলেন তাঁদের অতীত ও বর্তমানের উপর নির্ভরশীল কালব্যাপ্তি, আবার কেউ বলেন যে নিয়তি নির্মিত অথচ জীবের কাছে অজ্ঞাত কালছেত্র। আমি তোমাকে বলবো যে, এই উভয় কথাই সত্য, এবং একত্রে সত্য।

পুত্রী, পূর্বেই বলেছি তোমাকে যে, পরব্রহ্মের কারণপ্রকাশ হলেন নিয়তি, সূক্ষ্ম প্রকাশ হলেন কালী এবং স্থূল প্রকাশ হলেন প্রকৃতি। অর্থাৎ এই তিন প্রকাশই স্পষ্ট ভাবে ব্রহ্ম স্বয়ং। আর ব্রহ্ম, যার ব্যাখ্যা সম্ভবই নয়, কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত কিচ্ছুরই কনো অস্তিত্ব সম্ভবই নয়, অর্থাৎ তিনি অসীম, আর ব্যাখ্যা কেবলই সসীমের সম্ভব। অসীমের ব্যাখ্যা দেবার মতই কেউ উপস্থিত থাকেন না, কারণ তিনি অসীম। আর তাই অসীমের ব্যাখ্যা সম্ভবই নয়।

কিন্তু তাও যদি ভৌতিক অর্থে ব্রহ্মকে ধারণা করতে হয়, তবে তিনি হলেন সমস্ত বৈপরীত্যের একত্রিত সমাহার। অর্থাৎ তিনি একই সাথে সাদা এবং কালো, একই সাথে সৎ ও অসৎ, একই সাথে নিরাকার ও সাকার। তেমনই ভাবে নিয়তিও তিনিই, কালীও তিনি, আর প্রকৃতিও তিনিই। তাই এঁরা সকলেও ঠিক একই ভাবে বৈপরীত্যের একত্রিত সমাহার।

আর ঠিক সেই কারণেই, তোমাকে প্রথমেই বললাম, ভবিষ্যৎ যা একটি কালের অবস্থা, অর্থাৎ কালীর কর্মধারা, তা একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের উপর নির্ভরশীল কালব্যপ্তি, আবার একই সঙ্গে তা হলো নিয়িতির দ্বারা পূর্বনির্ধারিত কালব্যাপ্তি। যদি এই দুইকে যুক্তিদ্বারা সজ্জিত করতে পারো, তাহলে যা নির্মিত হবে, তাই হলো ভবিষ্যৎ। আর এই ভবিষ্যতের গর্ভেই, তোমার ও আমার আরো অন্য দুই অংশ অবতারের ক্রিয়াধারা সঞ্চিত আছে। এবার আমি তোমার কথা ধরেই সেই কথার শুরু করছি।

পুত্রী, তোমার কর্মকাণ্ডে তুমি একাকী থাকবেনা। তোমার সাথে যুক্ত হবেন, তোমারই সহায়িকা, এবং তোমাকে যিনি নিজের আদর্শ মনে করবেন তিনি। তাঁদের সংখ্যা এক নয় একাধিক, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্যতম যিনি, তিনিও তোমারই নেই ৮ কলা ঈশ্বরকটি অবতার। পুত্রী, তুমি হলে পরানিয়িতির বিদ্যা ও জ্ঞানরূপী প্রকাশ।

তোমার আবির্ভাব না হলে, কৃতান্ত তথা কৃতান্তিকার সমস্ত অধ্যায়ের ভাবার্থ উদ্ধার অসম্ভব ছিল। তবে, তুমি তোমার কর্মের সাফল্য পাবেনা, বা বলতে পারো তুমি তোমার কর্মকে শুরুই করতে সক্ষম হবেনা। আর ততক্ষণ তা শুরু করতে পারবেনা, যতক্ষণ না তোমার সাথে পরানিয়িতির শ্রীরূপ যুক্ত হচ্ছেন।

পুত্রী, আমি আমার এই দেহের ভবলীলা ত্যাগ করার সেস অবস্থায় তোমার নিকটে তাঁকে পাবে, যিনি হবেন তোমার গুণগ্রাহী প্রেমিকা, এবং যিনি হবেন তোমার সাফল্যের চাবিকাঠি। আমি তাঁর নাম তোমাকে বলবো না, কারণ তা বলে দিলে, তোমার জীবন তোমার কাছে পূর্বে পাঠ করা গ্রন্থের পুনরায় পাঠ করার ন্যায় হয়ে যাবে, এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে উঠবে।

পুত্রী, জীবনের অনিশ্চয়তাই জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে আমাদেরকে। তাই সেই অনিশ্চয়তাগুলি অনিশ্চিত থাকাই ভালো, কারণ একবার যদি সেই অনিশ্চয়তা নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে জীবনে অগ্রগতির উদ্যমই সমাপ্ত হয়ে যায়। সেই কারণে আমি তোমাকে তাঁর নাম তো

বলবো না। তবে এটুকু অবশ্যই বলবো যে, সে তোমার জীবনে প্রবেশ করার সাথে সাথে, তুমি সাফল্যের মুখদর্শন শুরু করবে।

দেহের বয়সে সে তোমার থেকে অনেকটাই ছোট হবার কারণে, তোমার দেহাবসান ও চতুর্থ ঈশ্বরকটির উত্থানের মাঝের সময়টাতে সে-ই কৃতান্তিকদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করবে। তবে কেবল এই ভূমিকাই নয়, সেই কন্যা তোমার গুণগ্রাহী হয়ে তোমার নৈকট্য যখন কামনা করবে, তখন সে-ই তোমার জন্য প্রাথমিক অনাথ আশ্রম গঠন করবে, এবং অনাথদের সেখানে এনে রাখা শুরু করবে।

আর সেই অনাথআশ্রম থেকেই তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ১০ শিষ্যকে লাভ করবে, যাদের নিয়ে তোমার কৃতান্তিক গঠন পর্বের শুরু হবে। তবে তোমার জীবনে সেই কন্যার আগমনের পূর্বেই তুমি যা শুরু করে দেবে, তা হলো আমার দ্বারা রচিত গল্পকাহিনীগুলির উপর তুমি তোমার সঙ্গিসাথিদের সাথে চিত্রনাট্য করা শুরু করে দেবে।

সত্য বলতে, তোমার এই চিত্রনাট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তোমার কাছে সেই কন্যার আগমন হবে। তোমার ও তোমার সকল সঙ্গীসাথিদের সাথে আলাপে মুখরিত হয়ে, সেই কন্যাই প্রায় অর্ধশত অনাথকে আনবে, এবং তোমার কাছে তাঁদের অর্পণ করবে, আর যখন সে তা করবে, তখন থেকেই তোমার তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে।

তবে এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবার পরে পরে, যখন তুমি সেই কন্যাকে, এবং সেই কন্যা তোমাকে অধিক ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতে শুরু করবে, তখন সেই অর্ধশত অনাথদের শিক্ষাদান শুরু করবে, তোমার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে। আর তাঁদের থেকেই উঠে আসবে, ৪টি কৃতান্তিক। তবে তোমার প্রথম শিষ্যা হবে সেই কন্যাই।

এরপরে, তোমার সঙ্গীসাথিরা অনাথআশ্রমকে নিয়েই মত্ত থাকলে, অনাথ শিশুদের সংখ্যা এক শত হবে প্রথমে, আর সেই এক শত হবার কালে, সেখান থেকে তোমার মিত্র তথা কন্যাসমা

সেই অষ্টকলা অবতার আরো ২ অনাথকে আশ্রম থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসবে তোমার কাছে, কৃতান্তিক গড়ার জন্য।

আর যখন এই অনাথদের সংখ্যা হয়ে উঠবে দুই শত, তখন তাঁদের থেকে তোমার দ্বারা নির্মিত অবশিষ্ট ৪টি অনাথকে বেছে নিয়ে আসবে সেই কন্যা তোমার নিকটে। পুত্রী, কৃতান্তিকদের প্রথম আশ্রমের নির্মাতা তুমি নও, আর প্রথম কৃতান্তিক নির্মাতাও তুমি নও। প্রথম কৃতান্তিকের নির্মাতা ভাগ্যক্রমে আমি, আর প্রথম কৃতান্তিক হলে তুমি। আর কৃতান্তিকদের সেই কালজয়ী আশ্রম! সে আশ্রম, যা ১৫ শতক বৎসর ব্যাপী জগতের মোক্ষদ্বার রূপে চিহ্নিত থাকবে, এবং তৎপশ্চাতে ১৫ সহস্র বৎসর মহাতীর্থ রূপে পরিগণিত হবে!

সেই আশ্রমের নির্মাতাও তুমি নও, তবে হ্যাঁ, সেই আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র হবে তুমি। তুমি হয়ে উঠবে, সকলের আদরের সখী, আর শেষে যখন সকলেই সকলের সখা ও সখী হয়ে উঠবে, তখন তুমি হয়ে উঠবে প্রাণসখী, আর তারপর থেকে আশ্রমের অধ্যক্ষকে প্রাণসখী নামেই সম্ভাষণ করা হতে থাকবে। আর সেই আশ্রমের নির্মাতা হবে, তোমার এই পরমমিত্র, যিনি তোমার সমবয়সী নন।

তোমার দেহের আয়ু যখন আর মাত্র ১৫ বৎসর অবশিষ্ট থাকবে, তখন তোমার এই পরমমিত্র তোমার অন্য ১০টি কৃতান্তিকদের একত্রিত করে, এই আশ্রমের নির্মাণ করবে, যার নাম পরবর্তীদে তোমারই নাম ধারণ করে দেবে, শ্রীধাম। পুত্রী, তুমি তোমার জীবদ্দশাতেই, এই আশ্রমের বসতি সংখ্যা ৩৩ দেখে যাবে।

এবং তোমার দেহাবসানের পরেও, তোমার সঙ্গীসাথিদের নির্মাণ করা অনাথ আশ্রম চলবে, তবে তা পসমিত হয়ে যাবে, কারণ তোমার সঙ্গীদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই আশ্রম চালনায় রুচি রাখবেনা। তবে তোমার এই পরম মিত্র সেই অনাথ আশ্রমকে সঞ্চালিত করবে, এবং এক সময়ে সেই আশ্রমের বসতি সংখ্যা ৫ শত হয়ে যাবে।

পুত্রী, পরবর্তীতে এই আশ্রমকে বঙ্গসরকার অধিগ্রহণ করবেন, এবং এই কর্মের কারণে তোমার মিত্রকে বহু অর্থে ও সম্মানে ভূষিত করবে। আর তার সাথে সাথে, বঙ্গশাসক, শ্রীধামের জন্য একটি ঘণ্টার শিক্ষকতার ব্যবস্থাও করে দেবেন, যাতে এই শ্রীধামে উপযুক্ত শিশু যেতে পারে এবং কৃতান্তিক হয়ে উঠতে পারে।

তোমার এই মিত্র, নিজের আয়ুর অন্তিম ১০ বছরে যাকে পালন করবে, এবং যার হাতে শ্রীধামের দায়িত্ব দিয়ে যাবে, তিনি হলেন পরানিয়িতির ১৬ কলা অবতার, যিনি একই সঙ্গে অসামান্য মেধাবী, সাফল্যমণ্ডিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং দূরদর্শী। আর সত্য বলতে, তাঁর হাতে পরেই, শ্রীধাম মহাধামে পরিণীত হবে। যখন তোমার মিত্র দেয়ত্যাগ করবে, তখন কৃতান্তিকের সংখ্যা ১ শত হয়ে যাবে, এবং শ্রীধামের বসতি সংখ্যা হয়ে উঠবে ৩ শত।

আর এই ১ শত কৃতান্তিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন ১৬কলা অবতার প্রাণসখী হবে, তেমন আরো ২০ জন হবেন, যারা বঙ্গরাজ্যের শাসনের রাশ হাতে ধরবে, মহাসংগ্রাম করে। আর সেই শাসন একবার হাতে ধারণ করার পর, শ্রীধামকে আর অনাথের উপর আশ্রিত থাকতে হয়না, কারণ এঁরা শ্রীধামকে সমস্ত বঙ্গের গুরুকুল করে তোলে।

পুত্রী, সে এক আমূল পরিবর্তনের কাল। তুমি প্রথম প্রাণসখী শ্রীধামের, আর এই ১৬ কলা অবতার হলেন তৃতীয় প্রাণসখী। আর ইনার সময়কালে, সমস্ত বঙ্গদেশে, শ্রীধামের ৭টি শাখা হবে, আর সেই সমস্ত শাখা মিলিয়ে প্রায় ১০ সহস্র ছাত্র হবে, যাদের মধ্যে ১ সহস্র কৃতান্তিক প্রশিক্ষিত হবে।

পুত্রী, তাঁর সময়কালে, শ্রীধামের পরিবর্তন আমূল হবে। সাতটির প্রতিটি শ্রীধাম শাখার দুইটি করে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা থাকবে, যাদের মধ্যে একটি হবে তাঁদের সন্তানদের জন্য, যারা তাঁদের সন্তানদের অর্থ দ্বারা পঠনপাঠন করাতে সক্ষম। এবং দ্বিতীয় বিভাগ হবে আর্থিক ভাবে দূরস্থদের জন্য। আর এঁদের থেকে যারা কৃতান্তিক হবার যোগ্য রূপে চিহ্নিত হবে, তাঁরা শাখা

থেকে মূল কাণ্ডে অর্থাৎ শ্রীধামে যাত্রা করবে, এবং প্রাণসখীর থেকে কৃতান্তিক হবার শিক্ষা গ্রহণ করবে।

আর ইনার জীবনাবসানের পূর্বকালে, এমন হবে যে, বঙ্গদেশে নির্বাচন কেবলই এক লোকদেখানো ক্রীড়া হয়ে যাবে। সম্যক শাসন এবং সমস্ত কর্মসম্পাদনা শ্রীধামের শিষ্যরাই করবেন। আর এমন করতে করে, প্রাণসখীর জীবনের অন্তিম বৎসরে বঙ্গদেশ সমস্ত ভারতের কাছে হয়ে উঠবে এক বিস্ময়কর রাজ্য, কারণ ভারতের সমস্ত বিষয়ের সমস্ত শ্রেষ্ঠরা বঙ্গদেশ থেকেই কেবল হবেন, এমনই নয় কেবল, এর সাথে সাথে, বঙ্গদেশ সমস্ত পৃথিবীর সর্বাধিক ধনী রাজ্য রূপে চিহ্নিত হবে।

একটি মানুষও এখানে দরিদ্র থাকবেন না তখন। কৃষক হন বা শিল্পপতি, সকলেই স্বচ্ছল জীবনে অবস্থিত থাকবেন, আর জ্ঞান ও সাধনায় বঙ্গদেশে মোক্ষলাভের ভিড় লেগে যাবে। এমন অবস্থাতে বঙ্গদেশকে উন্নীত করার বৎসরেই প্রাণসখী দেহত্যাগ করে, সম্পূর্ণ ৯৬ কলা অবতার ক্রীড়ার সমাপন করবেন।

পুত্রী, প্রতিটি অবতার ক্রীড়ার তখনই সমাপন হয়, যখন তা ৯৬ কলার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। তবে সাধারণত সেই ক্রীড়া এক বা দুই সহস্র সালব্যাপী হয়, তবে এবারে তা মাত্র ১৫০ বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত হবে, কারণ মানবকুলকে একটি বিশাল পরিমাণের ধাক্কা প্রদান করা আবশ্যক হয়ে গেছিল।

পুত্রী, বঙ্গদেশের এমন উত্থানের পর, বঙ্গদেশের থেকে আর্যদের সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে এখানেই সমস্ত কিছুর সমাপ্তি হয়না, বা বলতে পারো এই হলো শ্রীধামের উত্থান বা কৃতান্তের উত্থান। বঙ্গদেশের উত্থানের পর, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ শ্রীধামের প্রথম প্রাণসখার কাছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রীধামের শাখা উন্মোচনের দাবি করলে, তাঁর আমলে ৭টি রাজ্যে একটি একটি করে শ্রীধামের স্থাপন হয়।

তাঁর পরবর্তী প্রাণসখার আমলে, সেই সংখ্যা ২০টিতে পরিণত হয়, এবং তাঁর পরবর্তী প্রাণ সখার আমলে, তা ভারতের প্রতিটি রাজ্যে স্থাপিত হয়ে যায়। সপ্তম প্রাণসখীর কালে, শ্রীধামের সংখ্যা হয়ে যায় ১ শত, কারণ একাকটি রাজ্যে একাধিক শ্রীধামের শাখা স্থাপিত হতে শুরু করে।

সপ্তম প্রাণসখীর পরে, প্রথম যিনি প্রাণসখা হয়েছিলেন, তিনি পুনরায় জন্ম নিয়ে, এবারে প্রাণসখী হয়েই আসেন, এবং ইনার আমলেও আমূল পরিবর্তন হয়, তবে এবার সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের সংবিধানের বদল হয়, এবং নবসংবিধান রচিত ও স্থাপিত হয়। এবং কেবল তাই নয়, এই নবসংবিধানের সাথে সাথে সমস্ত শাসনভার শ্রীধামের ছাত্রদের হাতে চলে যায়, এবং কৃতান্তিকরা হয়ে ওঠেন ভারতের নবধর্মযাজক এবং কৃতান্ত হয়ে ওঠে ভারতের মহাধর্ম। এবং তিনিই হন প্রথম প্রাণসখী যিনি প্রাণসখী থাকাকালীনই মোক্ষ লাভ করে, সমস্ত মানবকুলের কাছে এক মহাবার্তা প্রচার করে যান কৃতান্ত সম্বন্ধে।

পুত্রী, এতো মাত্র অষ্টম প্রাণসখী; এরপরেও আরো ২২টি প্রাণসখী আসেন, এবং নবসংবিধান তথা কৃতান্ত তথা কৃতান্তিক পরিবর্তীতে কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, বরং গোটা পৃথিবীর ৩০টি দেশ কৃতান্তকে নিজেদের ধর্ম এবং ভারতের নবসংবিধানকে নিজেদের সংবিধান রূপে স্বীকার করলে, ভারত ১৫০০ বৎসরের কৃতান্তকালের অন্তের দুই শত বৎসর সমস্ত পৃথিবীর ধনীতম তথা উন্নততম দেশ হয়ে অবস্থান করে।

কিন্তু তারপর থেকে প্রাণসখীরা দুর্বল হতে শুরু করে, এবং পরবর্তী দুই শত শালের মধ্যেই ভারত পুনরায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা হারিয়ে ফেলে, এবং ক্রমশ কৃতান্ত জগতের শ্রেষ্ঠতম এক ধর্মসম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত হতে শুরু করে, এবং আরো এক শতবৎসরের পর, পুত্রী, তোমার মিত্রের নির্মাণ করা শ্রীধাম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থধাম হয়ে উঠে, কৃতান্তের ইতিহাস সকলকে আরো সহস্র সহস্র বৎসর শোনাতে থাকে।

অতি সংক্ষেপেই বললাম সমস্ত ভবিষ্যৎ। এর কারণ এই যে, এই ভবিষ্যৎ অনেকেই পাঠ করবেন, কিন্তু যেমন তোমাকে বললাম ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনে গেলে, জীবনের উদ্যমই সমাপ্ত হয়ে যায়, তেমনই সকলের জন্যই সেই উদ্যমকে ধারণ করে রাখার জন্যই এই সংক্ষেপ কথন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে মধ্যে অজস্র টানাপড়েন থাকবে, অজস্রবার আর্যরা ও বৈষ্ণবরা বাঁধা প্রদান করবে। মিত্রতা হবে কৃতান্তের সাথে ইসলামের, এবং ইসলাম কৃতান্তের যুদ্ধকে একসময়ে নিজেদের যুদ্ধ রূপেই ধারনা করবে।

পরবর্তীতে বৌদ্ধরাও ইসলামদের ধারাকে অনুসরণ করবে, এবং কৃতান্ত এর পর থেকে সমস্ত সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ জিততেই থাকবে, এবং মানবযোনির কাছে মহাপ্রেমের, মহাসমন্বয়ের, এবং ভেদভাবশূন্য মহাজ্ঞানের প্রচার করতে থাকবে।

বিরোধ কেবল ধর্মসম্প্রদায়ের থেকেই আসবেনা, কারণ বৈষ্ণব আর্যরা তো রাজনীতিতেও যুক্ত। এই আর্যদের যুদ্ধে একসময়ে পূর্বের সংবিধানের প্রণেতা অনার্যরাও আর্যদের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ ভাবে কৃতান্ত করবে না, কারণ আপামর জনতা সেই যুদ্ধ করবে কৃতান্তের হয়ে। তবে হ্যাঁ, আর্যরা ধর্মসম্প্রদায়ের সংগ্রামে যুক্ত থাকুন বা রাজনীতিতে, দুর্নীতি, অনাচার, হিংসা, এবং ঈর্ষাই এঁদের অস্ত্র। তাই সেই সমস্ত কিছু কৃতান্তকে অবশ্যই সহ্য করতে হবে, এবং সময়ে সময়ে, বহু বহু শ্রীধামের শিক্ষার্থীদের, শিক্ষকদের, এবং কিছু কৃতান্তিকদেরকেও এই সমূহ সংগ্রামে শহীদ হতে হবে।

তবে সেই সমূহ কথা আমি এখানে বলবো না। বরং সময়ে সময়ে ঐতিহাসিকদের হস্তে আমি বিরাজ করে, সকলের কলম দ্বারা আমি সেই কথার প্রত্যক্ষদর্শন সমস্ত মানবকুলের জন্য বলতে থাকবো, কারণ এই সংগ্রাম মানুষের সংগ্রাম, এই সংগ্রাম মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম, এই সংগ্রাম মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দাবির সংগ্রাম, এই সংগ্রাম মানুষের আমার কাছে বলার সংগ্রাম যে- আমরাই সেই যোনি, যেই যোনি তোমার সর্বাধিক প্রিয়, কারণ এই যোনি থেকেই, আমরা সমস্ত ভ্রমের নাশ করে, আমরা তোমার ক্রোড়ে ফিরে যেতে সক্ষম”।

দিব্যশ্রী বললেন, "আচ্ছা মা, আমার মনে একটি বিশয়ে কৌতূহল জাগছে। ... আচ্ছা, মার্কণ্ড মহামুনি তাঁর মহাপুরাণে দেখিয়েছেন যে, দক্ষ হলেন আর্য, আর তিনি শিবকে অনার্য বলতেন, আর যেমন আর্যরা অনার্যদের অসভ্য বর্বর, ইত্যাদি বলেন, তেমনই বলতেন, আর সতী তাঁর কন্যা, এবং তিনি আর্যদের ত্যাগ করে অনার্য শিবের কাছে চলে গেলেন। আসলে এমন বলার অর্থ এই যে, আমার বারবার এমন মনে হচ্ছে যে, এই কাহানী যেন মার্কণ্ড মহামুনির নিজের জীবনের কাহানী। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পাচ্ছিনা, এই ব্যাপারে। আপনি কি এ ব্যাপারে আমাকে আলোকপাত করতে পারবেন?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক বিচার করেছ পুত্রী। আসলেই, মার্কণ্ড মহাপুরাণ হলো মহামুনি মার্কণ্ডের আত্মকথা, যেখানে সম্যক আর্যকুলকে তিনি ব্রহ্মাপুত্র ও নারায়ণভক্ত করে দেখিয়েছেন, এবং সেই আর্যকুলের তিনি স্বয়ং যতটা সম্মুখীন হয়েছেন, তাকে দক্ষ ও দক্ষের রাজত্ব করে দেখিয়েছেন।

অন্যদিকে, পিপলাদ, যাকে আর্যরা একপ্রকার উপনিষদের সঞ্চালক বলে বহিষ্কার করে দিয়েছেন, তাঁকে অনার্যকুলের শিরোমণি শিব করে দেখিয়েছেন। এবং এও দেখিয়েছেন যে তিনি স্বয়ং অর্থাৎ আদিশক্তির অবতার সতী কি ভাবে আর্য ধারাপাতের থেকে নির্গত হয়ে, অনার্য শিব অর্থাৎ পিপলাদের কাছে গেলেন। এও দেখিয়েছেন যে, এই যাত্রার কারণে তাঁর কতটা তিরস্কার করা হয়, আর এও দেখিয়েছেন যে সেই তিরস্কারের কারণে, তিনি আর্যদের দান করা দেহকে ত্যাগ করে, পুনরায় পার্বতী বেশে তন্ত্রের রচনা করলেন।

অর্থাৎ পুত্রী, মার্কণ্ড মহাপুরাণ সম্যক ভাবেই মহামুনি মার্কণ্ডের আত্মকথা। তবে হ্যাঁ, তিনি নিজেকে মাতার অবতার বলে স্ত্রীরূপে প্রদর্শন করেছেন, তাই এই সত্য অধরাই থাকে। যদিও, বেদব্যাস তা উদ্ধার করেছিলেন, আর তাই শিবপুরাণে, সমস্ত রুদ্রাবতার লিপিবদ্ধ করার কালে, তিনি আর্যদের দ্বারা চিহ্নিত পিপলাদকে প্রথম রুদ্রাবতার রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন"।

দিব্যশ্রী উৎসাহী হয়ে বললেন, "এমন আর কনো বিচিত্র আত্মকথা আছে মা!"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “আছে তো। ... দেখো, আমি তোমাকে একটি আত্মকথার বিবরণ দিচ্ছি। তুমি চিহ্নিত করতে পারো কিনা দেখো যে, সেটি কার আত্মকথা”।

আত্মকথা

আত্মকথা নাকি সাধনধারা!

মহারণ

ব্রহ্মসনাতন হাস্য বদনে বললেন, “বেশ পুত্রী, আমি তাহলে সেই আত্মকথার শুরু করছি তোমার কাছে। মনোনিয়োগ করে শোনো, কারণ তোমাকে বলতে হবে যে এটি কার আত্মকথা। একটি রাজ্য, অর্থাৎ একটি ব্যক্তি। তাঁর আত্ম বা অহম হলেন তাঁর রাজা। সেই রাজা দুর্বল হলেও, শাসকরূপে প্রজার খুব পছন্দের, কারণ তাঁর মনপ্রান প্রকৃতিকেন্দ্রিক।

কিন্তু সেই আত্মের আরো এক মুখ থাকে, যা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়, কারণ সে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, অর্থাৎ কেবল স্বয়ংকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি অন্ধ। এই আত্ম বা রাজা একসময়ে মৃগয়া গেলেন, অর্থাৎ আনন্দউৎসবে মাতলেন, আর সেই আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা থাকাকালীন, তিনি একটি অপকর্ম করে ফেললেন।

অপকর্মটি কি? অপকর্মটি হলো একটি শিক্ষকের অপমান করে ফেললেন তিনি। আর তাই সেই শিক্ষক রাজাকে বললেন যে, বাছা তুমি আমাকে নয়, এক শিক্ষককে অপমান করেছ। শিশু তুমি, তাই, অজ্ঞানতা বশেই সেই অপমান করেছ। কিন্তু অপমান তো অপমানই হয়। আর যেহেতু তুমি শিশু, তাই তুমি অপমানের জ্বালা কি, তা বুঝতেই পারছ না। যেদিন প্রথমবার অপমানের জ্বালা অনুভব করবে, সেদিনকেই তোমার মৃত্যু হবে।

রাজা বললেন, একি বললেন আচার্য! ... আমি যে এক রাজা! ... পীড়া সহ্য করলে, তবেই যে সন্তানপ্রাপ্তি হয়। আর অপমানের থেকে শ্রেষ্ঠ পীড়া কিই বা হতে পারে! ... আপনি আমাকে অপমান সইতে না পারার অভিশাপ দিয়ে দিলেন, তাহলে আমি সন্তানের পিতা হবো কি করে? আর তা যদি না পারি, তবে আমার রাজ্যকে উত্তরাধিকার কি ভাবে দেব?

কিন্তু রাজার এই কথার আর কনো উত্তর এলো না, কারণ তাঁর সেই শিক্ষক অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, দেহত্যাগ করে দিয়েছেন। ... দুখী রাজা, দুঃখের সাথে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে দুঃখের সাথে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দ্বারা এক মহাপাপ হয়ে গেছে, তিনি এক শিক্ষককে অপমান করে ফেলেছেন। তাই তাঁর এই অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁকে বনবাসে যেতে হবে।

রাজা গেলেন বনবাসে, আর আত্মকেন্দ্রিক আত্মরূপ, অর্থাৎ সেই রাজার এক অন্য মুখ এবার রাজসিংহাসনে আঢ়ুর হলেন। পূর্বের রাজা মনোদুঃখে বনবাসী হলেও, প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট ভাব তাঁর অক্ষুণ্ণই থাকে, কারণ তিনি তো আত্মকেন্দ্রিক নন, অন্ধ নন। তাই প্রকৃতি একদিন তাঁর সম্মুখে এসে বললেন, রাজন, তুমি কেন চিন্তিত?

আত্ম বললেন, দেবী আর আমি রাজন নই। আমি রাজ্য ত্যাগ করে এসেছি। আমি এখন শুধুই আপনার সন্তান। হ্যাঁ স্বয়ং নিঃসন্তান, তাই দুখী, কিন্তু আপনার সান্নিধ্য লাভে খুশী।

প্রকৃতি বললেন, আমি থাকতে আমার প্রতি অনুগত সন্তানকে আমি দুখী কিভাবে থাকতে দিই? বলো রাজন, তুমি কেমন সন্তান চাও। আমি তোমাকে ততগুলি সন্তান প্রদান করবো, তেমন তেমন সন্তান প্রদান করবো, যেমন যেমন তুমি চাইবে। আর আমার বচন স্মরণ রেখো রাজন, এই সন্তানরাই রাজাসন গ্রহণ করবে একসময়ে।

আনন্দিত আত্ম বললেন, দেবী, যদি আমার সন্তানই রাজাসনে স্থপিত হয়, তবে তো প্রজার কল্যাণ উদ্দেশ্যে, সেই সন্তানকে অসীমিত ধৈর্য থাকতে হবে! দেবী আমাকে সেই সন্তানই প্রদান করুন। ... দাঁড়ান দাঁড়ান, কৃপা করে অপেক্ষা করুন। কেবল ধৈর্য থাকলেই তো আর

প্রজাশাসন সম্ভব হবেনা, শত্রুর থেকে রাজ্যকে সুরক্ষাও প্রদান করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে তো সাহস আর জেদেরও প্রয়োজন। ... কিন্তু... বিদ্যা আর কৌশল ছাড়া, সাহস, জেদ, বা ধৈর্য ধারণ করে আমার সন্তান অবস্থান করে, তবে তাঁকে অসৎ সংসর্গেও পরতে হতে পারে। তাই দেবী, আমাকে একটিই সন্তান প্রদান করুন যিনি একাধারে ধৈর্য, জেদ, সাহস, বিদ্যা ও কৌশল সম্পন্ন হবে।

প্রকৃতি হাস্যবেশে বললেন, পুত্র একই দেহে এতগুণ প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই আমি তোমাকে পাঁচ সন্তান প্রদান করলাম, তোমার কথিত পাঁচ গুণদ্বারা সুসজ্জিত করে।

আত্ম বললেন, দাঁড়ান দেবী। একটি কথা বলুন আমাকে। আপনার প্রদত্ত সন্তান তো আমার ভ্রাতা হবে, আমার সন্তান কি করে হবে তাঁরা? আপনিও আমার জননী, আর তাঁদের জননীও আপনিই!

প্রকৃতি হেসে বললেন, রাজন, রাজা হয়েও এ কেমন মূর্খের ন্যায় কথা বললে তুমি! ... ভূপতি তুমি। ভূদেবী তোমাকে সন্তান প্রদান করবেনা তো কে করবে? ... রাজন, এই ভূমিকে রাজা হয়েও প্রত্যক্ষ করলে না এতদিনে! এই ভূমি একাধারে মাতা ও স্ত্রী। ... এই বৃক্ষকে দেখ রাজন, এর জননী আমি অর্থাৎ ভূমি। আবার এঁর বীজকে আমিই আমার গর্ভে ধারণ করে, সেই বীজের থেকে উৎপন্ন বৃক্ষেরও জননী আমি। তা আমি যদি পত্নী না হতাম, তাহলে এই বৃক্ষের বীজকে নিজের গর্ভে কেন ধারণ করতাম!

রাজন আর কনো কথা বললেন না, পঞ্চসন্তান লাভ করলেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভূমিদেবীর কটুবাক্যে অপমানিত বোধ করলেন। নিজের অন্তরে বললেন, সত্যই তো আমি অযোগ্য ভূপতি, ভূপতি হয়ে এই সহজ সত্য আমি জানতে পারলাম না যে, ভূমিই জননী, আর ভূমিই পত্নী! এই সহজ সত্য উপলব্ধি করতে পারলাম না যে, যেই মাতা, সেই পত্নী! পত্নীও মাতারই আরেক স্বরূপ! আরেক প্রবাহ! আমি তো সত্য সত্যই রাজা হবার যোগ্য ছিলামনা।

এমন যখন আত্মদংশন করছিলেন রাজন, তখন আচম্বিক তাঁর মধ্যে অপমানের জ্বালার উদ্বেগ হয়, আর রাজন মৃত্যুর মুখে পতিত হয় অন্তিমকালে শিক্ষকের প্রদত্ত অভিশাপকে স্মরণ করতে করতে। পিতার প্রয়াণে, পিতৃহারা সন্তানদের প্রকৃতি কি করে পরিত্যাগ করতে পারেন। তাই পৃথিবী তাঁদের দেখভাল করতে শুরু করলেন।

অন্যদিকে যখন পূর্বরাজার পঞ্চসন্তানের জন্ম হচ্ছে, এই বার্তা বর্তমান অন্ধ রাজা, অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক আত্ম জানতে পারেন, তখন তাঁর আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা সঙ্কটাপন্ন হয়ে যায়। তিনি বিচার করতে থাকেন যে, প্রাক্তন রাজার সন্তানই তো রাজ্য ও রাজত্ব দাবি করবে এসে! ... তখন কি উপায়ে তাঁদেরকে অপসারিত করা যাবে রাজ্যের ভার প্রদান করা থেকে! ...

এমন বিচার করে, ভূমিদেবীর উদ্দেশ্যে অন্ধরাজা বললেন, হে ভূমিদেবী! এ তোমার কেমন একচোখোমি! তুমি প্রাক্তন রাজাকে সন্তান দিলে, আর বর্তমান রাজাকে নিঃসন্তান রেখে দিলে! ... আমাকেও সন্তান দিতে হবে। আমি ভূপতি, তোমার পতি আমি। তোমাকে আমার আদেশ মানতেই হবে। আমাকে সন্তান প্রদান করতেই হবে। ...

ভূমিদেবী সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে বললেন, আমি পত্নী হবার সাথে সাথে জননীও। কিন্তু তোমার পত্নীকে মনে পরল, কিন্তু জননীকে মনে পরল না! তো বেশ, আমি তোমাকে সন্তান প্রদান করবো। তোমার সমস্ত পূর্বজন্মের স্বরূপ আমি তোমাকে প্রদান করবো, এবং এই জন্মের স্বরূপও আমি তোমাকে প্রদান করবো। আর তাই তোমাকে আমি এক শত একটি সন্তান প্রদান করছি। তবে আমার কথা স্মরণ রেখো, তোমার কনো সন্তানই, তোমার ভাব অনুসারেই, কখনোই মাতৃত্বের কদর করবে না। রাজা ও রাজপুত্রের কাছে রাজ্য হলেন জননী। আর তোমার সন্তানরা কখনোই এই রাজ্যের কদর করবেনা। কিন্তু যখন এই রাজ্যের উপর, তাঁদের মাতার উপর তাঁরা জোর করে অধিকার স্থাপনের প্রয়াস করবে, তখনই তাঁদের বিনাশ হবে।

এত বলে, এক শত একটি সন্তান প্রদান করলেন প্রকৃতি অন্ধরাজাকে। কেউ ক্রোধ, তো কেউ লোভ; কেউ হিংসা, তো কেউ শঙ্কা; এমন ভাবে মহাবলশালী একশত পুত্র, এবং একটি কুটিল কন্যা লাভ করলেন অন্ধরাজা।

রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, কুলগুরু রূপে প্রাণ তো ছিলই অন্ধ অহমের কাছে, এবার পুত্রীর বিবাহ দিলেন জলতত্ত্ব, অর্থাৎ বুদ্ধির সাথে, এবং রাজ্যকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করে নেবার প্রয়াস করলেন। কিন্তু এরই মধ্যে, রাজ্যের সত্ত্বা প্রথম রাজার পঞ্চপুত্রকে নিয়ে এলেন রাজ্যে, এবং একশত পাঁচ রাজপুত্রকে প্রাণের সম্মুখে অর্থাৎ কুলগুরুর সম্মুখে রেখে শিক্ষা প্রদান করতে শুরু করলেন।

সেই শিক্ষাপ্রদানের কিছুকাল পরে, প্রাণবায়ু সত্ত্বার সম্মুখে এসে বললেন, আমার যা শেখানোর ছিল, তা শিখিয়ে দিয়েছি। এবার রাজপুত্রদের শ্রেয় কনো গুরুর প্রয়োজন।

সেই কথা শ্রবণ করে, সত্ত্বা চিন্তা করলেন, উদরের কথা। বিচার করলেন তিনি যে, উদরের থেকে শ্রেষ্ঠ গুরু কে হতে পারে! উদরচিন্তাই জীবকে সর্বস্ব শিক্ষা প্রদান করে। ... যেমন ভাবা তেমন কাজ। উদর হলেন রাজকুমারদের পরবর্তী গুরু। প্রশিক্ষণ প্রদত্ত হলো, পঞ্চ সৎগুণ অসামান্য শক্তিধর ও মেধাধর হয়ে উঠলেন, আর সাথে সাথে অন্ধরাজার একশত পুত্রের জন্য চিন্তারও কারণ হয়ে উঠলেন।

আর তাই নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার দিকে মনযোগী হলেন অন্ধরাজার একশত পুত্র। শক্তিবৃদ্ধির মধ্যে প্রথম যার সাথে মিত্রতা করলেন, তিনি হলেন গুরুপুত্র, অর্থাৎ উদরের সন্তান উর্জ্জা বা অগ্নি। একদিকে ভগ্নীপতিরূপে বুদ্ধি বা জলতত্ত্ব রয়েছে, অন্যদিকে সখারূপে রইল উর্জ্জা বা অগ্নিতত্ত্ব। কুলগুরু রূপে প্রাণবায়ু বা পবন তো রয়েছেই তাঁদের সাথে, মাতার বেশে ধরিত্রীও রয়েছে। কেবল সত্ত্বা আর মন বা আকাশতত্ত্ব তাঁদের সাথে নেই।

এই সমস্ত কিছুর সাথে রয়েছে তাঁদের পরমমিত্র মহাত্মাকাঙ্ক্ষা, যে শূদ্র হয়েও মহাবীর। কিন্তু এই সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও, শঙ্কা থাকে সত্ত্বাকে নিয়ে। সত্ত্বা কিছুতেই পঞ্চসৎগুণের সঙ্গ

ছাড়বে না। আর তারা যদি না ছারে সেই সঙ্গ, তাহলে কিছুতেই ধরিত্রীদেবী আর প্রাণবায়ুও তাঁদের সঙ্গ ছাড়বে না।... অর্থাৎ প্রয়োজন একচ্ছত্রের। তা কি করে সম্ভব?

যদি গুরুদেবের প্রিয়শিষ্য হওয়া সম্ভব হয়, তবে সত্ত্বা তাঁদের অনুগামী হয়ে উঠবে। এমন বিচার করে গুরুদক্ষিণা দেবার পণ নিয়ে গুরুদেব উদরের সম্মুখে গেলেন আত্মকেন্দ্রিক অহমের একশতপুত্ররা।

কিন্তু এখানে উদরের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার সম্মুখীন হলেন তাঁরা। উদর বললেন, হৃদয় দেশে যাও, আর হৃদয়ের নৃপতিকে ধরে নিয়ে এসো। হৃদয় আমার বন্ধু হয়েও, আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করেনা। ... যাও আর তাঁকে বেঁধে নিয়ে এসো, এই হলো আমার গুরুদক্ষিণা।

পারলেন না অসৎগুণের একশত ভ্রাতারা, নিজেদের সঙ্গে মহাত্মকাঙ্ক্ষা এবং গুরুপুত্র, উর্জ্জাকে সঙ্গে নিয়েও পারলেননা। কিন্তু তাতে তাঁদের ক্ষেদ নেই, কারণ গুরুদেবের আত্মকেন্দ্রিক ভাবের দর্শন তাঁরা পেয়ে গেছেন। তাই একবার যদি গুরুদেবকে স্বার্থ দেখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সৎগুণদের থেকে গুরুদেবকে অপসারিত করাই যায়।

গুরুদক্ষিণার ভার এবার পরলো সৎগুণদের কাছে, আর তাঁরা হৃদয়দেশে প্রবেশ করে, বিক্রম প্রদর্শন করলে, হৃদয়ের নৃপতি তাঁদের বীরত্বের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, এবং বন্দি হলেন তাঁদের। উদর হৃদয়কে বন্দিবেশে দেখে, তাঁর থেকে অর্ধেক রাজ্য ছিনিয়ে নিলেন, আর হৃদয়কে বাধ্য করলেন উর্জ্জাকে স্বীকার করতে, কারণ উর্জ্জাকে সেই অর্ধেক রাজ্য প্রদান করে দিলেন উদর।

কিন্তু এই সমস্ত কিছু যখন হচ্ছিল, তখন সমস্ত রাজ্যের প্রজা সৎগুণদেরকেই ভাবীরাজা রূপে স্বীকার করতে চাইলেন, আর তা অসৎগুণদের কাছে হয়ে উঠলো বিশেষ মাথাব্যাথার বিষয়, এমনকি অন্ধরাজার জন্যও তা হয়ে উঠলো এক বিশেষ চিন্তার বিষয়। কিন্তু অন্ধরাজার কুটিলবিচার এবার এর নিরাময় করতে প্রয়াসশীল হলেন।

তিনি যুক্ত হলেন অসৎগুণদের সাথে, আর সৎগুণদের প্রেরণ করলেন যকৃত অঞ্চলে। সেখানে মাদক প্রদান করলেই অগ্নিসম্পাত হবে, আর সৎগুণদের বিনাশ হবেই, মাদকের প্রভাবে। ... কিন্তু একদিকে যখন এই সমস্ত কিছু হচ্ছিল, এবং সৎগুণদের হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল, তখন হৃদয়ের নৃপতি উদরের থেকে অপমান লাভ করে, উদরের প্রভাবকে বিনষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক মহাযজ্ঞ করলেন।

সেই যজ্ঞ থেকে জন্ম নিলেন যমরাজ এবং জন্ম নিলেন স্বয়ং পরাচেতনা, তাঁর নবদুর্গা রূপের সিদ্ধিদাত্রি রূপ সারণ করে। উদরের প্রভাব থেকে রাজ্যকে মুক্ত করার দৈববাণী হলো যমরাজের জন্য, আর অর্ধনারীশ্বর রূপী হৃদয়ের পূর্ব সন্তানের জন্য দৈববাণী হলো যে তিনি হবেন সত্ত্বার বিনাশের কারণ। আর সর্বশেষে সিদ্ধিদাত্রির ক্ষেত্রে এই নির্দেশ এলো যে সম্পূর্ণ রাজ্যকে সৎহস্তে স্থাপিত করবেন তিনি।

অন্যদিকে অন্ধরাজার কুটিল বিচার অসৎগুণদের সাথে একত্রিত হয়ে যকৃতে প্রেরণ করলেন সৎগুণদের, এবং তাঁদের দহনের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু বাঁধ সারলেন, আত্মের আরো একগুণ। ইনি হলেন আত্মের সেই গুণ, যা রাজ্যের কল্যাণচিন্তায় রত, আর তাই তিনি জানেন যে এই পঞ্চসৎগুণই হলেন তারা, যারা রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করতে সক্ষম। তাই দহন করে তাঁদের হত্যা করা হবে, সেই সত্য তাঁদের সম্মুখে রাখলেন এই আত্মগুণ।

আর তা শ্রবণ করে, যকৃতে মাদকদ্বারা অগ্নিসম্পাত তো করালেন সৎগুণরা, কিন্তু প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, যকৃত থেকে সকলের অজান্তে যকৃত ত্যাগ করলেন। যকৃতের অগ্নি অসৎগুণদের আশ্বস্ত করলো যে সৎগুণদের হত্যা সম্পন্ন হয়েছে, আর তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠলো। অন্যদিকে, সৎগুণরা ক্রমশ মস্তকের দিকে অগ্রসর করতে থাকলেন।

পথে, পরাচেতনার কালরাত্রি রূপের সাথে সাখ্যাত হতে, কালরাত্রি জেদের সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হলেন। পথে, একাধিক অসৎগুণের সাথে সম্মুখীনও হতে হলো, আর সর্বক্ষেত্রে জেদ তাঁদের নাশ করতে থাকলেন। অতঃপরে, পরমাত্ম তাঁদের কাছে উদিত হয়ে তাঁদের নির্দেশ

দিলেন যাতে তাঁরা হৃদয় দেশে যাত্রা করেন, কারণ সেখানে পরাচেতনার মহারূপ সিদ্ধিদাত্রীর স্বয়ম্বরসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সেখানে যাত্রা করলে, সৎগুণরা দেখলেন যে, কনো অসৎগুণই সিদ্ধিদাত্রীকে লাভ করতে পারলেন না, আর যখন মহাত্মকাঙ্ক্ষা তাঁকে জয় করতে এগিয়ে এলেন, তিনি সরাসরি বলে দিলেন, কনো আকাঙ্ক্ষীকে তিনি বিবাহ করবেন না। অবশেষে সাহস তাঁকে জয় করলে, সকল অসৎগুণ একত্রে হৃদয়দেশে আক্রমণ করতে সচেষ্ট হলেন। সেখানে চেতনার দুই পুত্র, বিবেক ও বিচারও উপস্থিত ছিলেন।

বিচার অসৎদের আক্রমণ দেখে প্রতিরোধ করতে উদ্যত হলে, বিবেক হেসে বললেন, ভ্রাতা, আমি পরাচেতনার ধনুশ, তো পরাচেতনার পঞ্চমহাবাণও এখানে উপস্থিত। তাঁদের সামর্থ্য একটু দেখে নেবেন না!

পঞ্চবাণকে সম্মুখে আসতে হলো না, কেবল জেদ আর সাহসই সমস্ত অসৎগুণদের পরাজয়ের মুখ দেখালেন। আর সেই সমস্ত কিছুর মধ্যে আরো এক কাণ্ড হলো। আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ড চলমান, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্ফীতি সম্ভব। তাই আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই ত্রিগুণদ্বারা সুরক্ষিত। ত্রিগুণের প্রদত্ত সুরক্ষা কবচ সর্বদাই উপস্থিত থাকে আকাঙ্ক্ষার সাথে। আর তাই মহাত্মাকাঙ্ক্ষা নিজেকে অপরাজেয় মনে করতেন।

কিন্তু চেতনা যে ত্রিগুণ নন। ভগবান নন তিনি। ভগবান তিনি যার কাছে ভক্ত উপস্থিত হতে সক্ষম। কিন্তু চেতনার কাছে যে কনো ভক্তের আগমনের অধিকারই নেই। কারণ চেতনা যে ঈশ্বর, সমস্ত ভগবানের, শয়তানের ইষ্ট তিনি, একমাত্র অস্তিত্ব তিনি। তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্য ভক্তি ব্যর্থ, ভক্তও ব্যর্থ। তাঁর কাছে একমাত্র তিনিই উপস্থিত হতে পারেন, অর্থাৎ যিনি নিজের ব্রহ্মাণু হবার ভ্রম ত্যাগ করে ব্রহ্মস্বরূপ হয়েছেন, তিনিই উপস্থিত হতে পারেন। আর উপস্থিত হতে পারেন, সন্তান, কারণ তিনি যে সকলের মা।

যার মধ্যে তাঁর ভাব একমাত্র জননী, জননীস্বরূপ নন, জননীর ন্যায় নন, জগজ্জননী নন, একমাত্র জননী, জন্মজন্মান্তরের জননী রূপে যিনি পরাচেতনাকে দর্শন করেন, তিনিই তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারেন। তাই তাঁর ধনুশ থেকে নির্গত সাহসকে প্রতিরোধ করে এমন কনো কবচই সম্ভব নয়। যার গর্ভে, সহস্র লক্ষাধিক ব্রহ্মাণু নিবাস করে, আর প্রতিটি ব্রহ্মাণুর অন্তরে স্বস্ব ত্রিগুণ নিবাস করে, সেই ভগবানরা ঈশ্বরের বাণকে কিভাবে নির্বাপিত করবেন!

তাই সাহসের বাণ ভেদ করে দিল মহাত্মাকাঙ্ক্ষার কবচ। আর তা করতেই, তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য অসৎগুণদের প্রেরণা প্রদান করলেন, আর পথে বললেন যে, সৎগুণরা যকৃতে নিহত হননি, কারণ একমাত্র সাহসেরই সামর্থ্য আছে, তাঁর কবচকে ভেদ করার, আর তা হয়েছে এই স্বয়ম্বর সভায়। যিনি সিদ্ধিদাত্রীকে ধারণ করলেন, তিনি অন্য কেউ নন, স্বয়ং সাহস।

সমস্ত সৎগুণ একত্রে সিদ্ধিদাত্রীর থেকে সিদ্ধিলাভ করলেন, এবং হৃদয়দেশের রাজা, তথা যমরাজ, এবং বিচার বিবেক সেই সিদ্ধিলাভের অনুষ্ঠানকে মহাসমারোহে পালন করলেন। সত্ত্বা, প্রাণ, এবং সকলে সৎগুণদের জীবিত থাকার বার্তা পেলে, তাঁরা এসে তাঁদেরকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু অন্ধরাজার চিন্তা বৃদ্ধি পেল। এবার তো সৎগুণরা রাজসিংহাসনের দাবি করবেন। প্রকট হলো তাঁর কুটিল বুদ্ধি, তাতে যুক্ত হলেন সমস্ত অসৎগুণ, উর্জ্জা, বুদ্ধি এবং মহাত্মাকাঙ্ক্ষা। আর সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলে, সেই সিদ্ধান্তকে নাট্যে রুচিশীল অন্ধরাজা, সত্ত্বার সম্মুখে নাট্যদ্বারা স্থাপন করলে, সৎগুণদের মলদ্বারের অঞ্চলে প্রেরণ করলেন সকলে।

কিন্তু যাদের সাথে সাখ্যাত সিদ্ধিদাত্রী রয়েছেন, এবং বিবেক রয়েছেন, তাঁদেরকে কেই বা প্রতিরোধ করতে সক্ষম! দহন হলো মলদ্বারের দেশের লোমাবলির জঙ্গল, লাভ হলো মহাস্ত্র কুণ্ডলিনী চক্র, আর সেই চক্রকে ধারণ করলেন বিবেক। আর! ... আর মায়াসুরের রক্ষণ হলো,

আর সেই মায়াসুরের বলে, স্থাপিত হলো মূলাধারচক্র। চেতনার বিকাশ শুরু হলো সৎগুণদের, এবং সমস্ত রাজ্যে।

কিন্তু মূলাধারের জাগরণের পর কি? বিবেক বললেন, ভেদভাবকে অপসারণ করতে হবে, তবেই সমস্ত রাজ্যকে সৎগুণদের অধিকারে আনা সম্ভব, আর তবেই রাজ্যের কল্যাণ সাধন সম্ভব। তাই ভেদভাবকে বিনাশ করতে বিবেক জেদ এবং সাহসকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে। প্রবল বলশালী ভেদভাব, কারণ সে ব্যাধির দুগ্ধ পান করেছে। মায়াবীও সে, কারণ সে তো ভেদ, দুইখণ্ডে জাত, কিন্তু ব্যাধি রাক্ষসী তাঁকে একত্রিত করে প্রাণ দিয়েছে।

তাই, ভেদভাব নিজের স্থাপত্যকে যখন স্থায়ী করার জন্য, আমিত্বের আরাধনায় মত্ত, এবং উপবাসরত, তখন জেদের দ্বারা ভেদভাবকে সকলের সম্মুখে স্থাপিত করলেন, দুই খণ্ডে চিরে। বিপন্মুক্ত হলো সৎগুণদের অগ্রগতির নীতি। এবার আগ্রাসনের শুরু। সিদ্ধিদাত্রীর সিদ্ধিলাভে যেন সৎগুণদের মধ্যে বিভেদের রচনা না হয়, তাই নিয়ম নির্মিত হলো যে যেকোনো একটি সৎগুণই সিদ্ধিদাত্রীর থেকে সিদ্ধি লাভ করবেন একটি সময়ে। একটি বছর তাঁর সিদ্ধিলাভ হলে, পরবর্তী সৎগুণ সেই সুযোগ পাবেন। আর যদি কনো সৎগুণ অন্য সৎগুণের সিদ্ধিলাভের কালে, সিদ্ধিদাত্রীর সিদ্ধিপ্রদানের সভায় প্রবেশ করেন, তবে তাঁকে নির্বাসনে যেতে হবে।

সমস্তই পরাচেতনার লীলা। নবদুর্গার মাত্র দুই দুর্গাকে তাঁরা লাভ করেছেন, কালরাত্রি আর সিদ্ধিদাত্রী, অন্য সাত দুর্গা লাভ করা বাকি তখনও সৎগুণদের তাই এই লীলা। সাহসকে অনুপ্রবেশ করতে হলো রাজ্যের সুরক্ষার জন্য, আর তাঁকে নির্বাসনে যেতেও হলো। সেই নির্বাসনের কালে, তিনি লাভ করলেন শৈলপুত্রীকে, কুষ্মাণ্ডাকে এবং কাত্যায়নীকে। জেদ ধারণ করলেন চন্দ্রঘণ্টাকে। বিদ্যা ধারণ করলেন স্কন্ধমাতাকে, এবং কৌশল ধারণ করলেন মহাগৌরিকে, এবং সেই সময়কালেই ধৈর্য ধারণ করলেন ব্রহ্মচারিণীকে।

সমস্ত রাজ্যজয় সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠান করে, সৎগুণরা সমস্ত রাজ্যকে বার্তা দিলেন যে এবার থেকে সমস্ত রাজ্য সৎগুণদের প্রভাবে স্থাপিত থাকবে, আর তা সম্ভব হয়েছে বিবেকের কারণেই।

বিবেকের গুরুত্বকে প্রাধান্য না দেওয়া হয় যাতে, তাই ভেদভাবের অনুচর, বাচালতা সম্মুখে এসে বিবেককে কটুবাক্য বলতে থাকলেন, আর তাই বিবেক তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে, বাচালতার থেকে মুক্তি প্রদান করলেন সমস্ত রাজ্যকে। তবে এই অনুষ্ঠানের কালে, সুপ্ত ক্রোধ ক্রোধাগ্নিতে পরিণত হয়ে গেল, সৎগুণদের বৈভব দর্শন করে। আর তাই অন্ধরাজাকে বাধ্য করলেন, এক দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান করার জন্য, যেই দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ ছলনার মাধ্যমে সৎগুণদের সর্বস্ব হনন করবেন তিনি।

ভয় পেলেন অন্ধরাজা। রাজি করালেন এবং আশ্বস্ত করলেন তাঁরই কূটবুদ্ধি। রাজার আদেশ গেল সৎগুণশ্রেষ্ঠ ধৈর্যের কাছে। সিদ্ধিদাত্রীর সাথে সমস্ত সৎগুণভ্রাতাদের নিয়ে তাঁরা অন্ধরাজার সম্মুখে এলেন, আর শুরু হলো দ্যূতক্রীড়া।

ধৈর্যের অতি, ক্ষয়ের প্রধান কারণ। আর সেই অতির কারণেই সর্বস্ব খোয়ালেন সৎগুণরা। সমস্ত পরাচেতনার লীলা। সৎগুণদের অন্তরের অগ্নিকে প্রজ্বলিত না করলে, অসৎগুণদের বিনাশ অসম্ভব, আর অসম্ভব অন্ধরাজার আধিপত্য থেকে মুক্তি। তাই সৎগুণদের সর্বস্ব হনন করিয়েও শান্ত হলেন না পরাচেতনা। স্বয়ং সিদ্ধিদাত্রী নিজের মানকে সম্মুখে রেখে, সমস্ত অসৎশক্তির সাথে পরিচয় করালেন সৎগুণদের।

সত্ত্বা এই মানহানিতে নিরুত্তর, অন্ধরাজা ও তাঁর সমস্ত অসৎসন্তানরা নিরুত্তর, প্রাণ নিরুত্তর, বুদ্ধি উগ্র, উদর নিরুত্তর, উর্জ্জাও নিরুত্তর, মহাত্মাকাঙ্ক্ষার উগ্রতা প্রত্যক্ষ, অন্ধরাজার কুটিল বুদ্ধিও উগ্রতার চরমসীমায়। সাহস ও জেদ সকলের বিনাশ করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন, বিদ্যা ও কৌশল অন্ধরাজার কুটিলতার সম্যক বিনাশ করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু ধৈর্য তখনও নিজের অতিধৈর্যকেই ধারণ করে রইলেন। তাই সিদ্ধিদাত্রী সকল সৎগুণদের প্রতিজ্ঞার মান

রাখতে, স্বয়ংই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন, অসৎগুণদের অহংকারকে চুর চুর করে দিলেন, কারণ তাঁরা তাঁর মান হরণে ব্যর্থ হলেন।

অন্ধরাজা এইসমস্ত কিছুতে ভীত হলেন। সিদ্ধিদাত্রীর প্রতি কৃপা করবেন, এমন অহংকার পূর্ণ অঙ্গিকার করলেন, আর সিদ্ধিদাত্রী এই অঙ্গিকারকে কাজে লাগিয়ে, সকল সৎগুণদের মুক্ত করালেন। কিন্তু অসৎগুণ ও অন্ধরাজার কুটিলবুদ্ধি নিজেদের এইরূপ পরাজয় স্বীকার করলেন না, আর তাই সৎগুণদের বনবাসের নির্দেশ শোনালেন অন্ধরাজার মুখ থেকে। আর শোনালেন যে সৎগুণদের একটি বৎসর ছদ্মবেশে থাকতে হবে, আর যদি সেই কালে তাঁদের ছদ্মবেশকে ভেদ করা যায়, তাহলে পুনরায় বনবাস ও ছদ্মবেশের আদেশ বহাল হবে।

সম্পদ সমস্ত ছিনিয়ে নিলেন, আর শুরু হলো সৎগুণদের তপস্যার কাল। মূলাধার স্থাপিত হয়েছিল এবং মনিপুর অর্থাৎ স্বর্গলোক নিশ্চিত হয়েছিল মলদ্বারের বনাগ্নির কালেই। সেখানে আকাশতত্ত্ব অর্থাৎ ইন্দ্র এসে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলে সাহস ও বিবেকের সাথে, এবং সেই যুদ্ধে মন অর্থাৎ আকাশতত্ত্ব পরাজিত হতে, মনিপুর জয় হয় সৎগুণদের। সেই যুদ্ধেই, কুণ্ডলিনী সর্পের নিধন হয়ে মূলাধার নিশ্চিত হয়, আর মায়াসুরের থেকে মায়াপ্রাসাদ লাভ করে স্বাধিষ্ঠান লাভ হয়।

এই বনবাসের কালে, বিদ্যা অর্জন করে অনাহত লাভ হয়, অক্ষয়পাত্র লাভ করে সিদ্ধিদাত্রী বিশুদ্ধ প্রদান করেন সৎগুণদের। শেষে কৈলাসপতি আসেন সাহসের আজ্ঞাচক্র যাত্রাকে প্রতিরোধ করতে, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হলে, আজ্ঞাচক্রও লাভ হয়ে যায় সৎগুণদের। সাধনা চরম স্তরে উপস্থিত হলে, এবার সৎগুণরা অজ্ঞাত অবস্থায় স্থাপিত হলেন, এবং নিজেদের শক্তিসঞ্চয় করলেন, অসৎগুণদের বিনাশের উদ্দেশ্যে।

কিনু ধৈর্যচ্যুতি তখনও ঘটেনি। তখনও ধৈর্য অসৎগুণদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন না। তাই এবার বিবেক সম্মুখে এলেন, এবং বললেন যে তিনি স্বয়ং অসৎগুণদের সভায় যাবেন, এবং সৎগুণদের জন্য স্থান কামনা করবেন। সেখানে সত্ত্বা থাকবেন, প্রাণ থাকবেন, উর্জ্জা

থাকবেন, মহাত্মাকাঙ্ক্ষা থাকবেন, অন্ধরাজা ও তাঁর কুটিলতা থাকবেন, স্বয়ং ধরিত্রী থাকবেন, বুদ্ধি থাকবেন, এমন কি সমস্ত অসৎগুণরা থাকবেন। যদি তাঁরা সৎগুণদের অবস্থান করার স্থান প্রদান করেন, তাহলে যুদ্ধের কনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বিবেকের আর্জি রাখা হলো না, আর তাই যুদ্ধই নিশ্চিত করা হলো। সৎগুণদের সাথে জুড়লেন বিবেক, তাঁদের মার্গদর্শক রূপে, বা বলা চলে চেতনার ধনুশ হয়ে, অসৎগুণদের সৎগুণরূপী বাণ দ্বারা বিঁধতে। আর জুড়লেন হৃদয়দেশ, ও তাঁর দুই সন্তানরূপে অবস্থানকারক স্বয়ং লিঙ্গহীন ভাব এবং যমরাজ। সঙ্গে রইলেন বিবেকের অনুগামীরা।

বিচার যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেন, কারণ তাঁর এখানে কনো ভূমিকা নেই, বিশেষ করে যখন বিবেক স্বয়ং চেতনার দূত হয়ে অবস্থান করছেন যুদ্ধে। আর অসৎদের সঙ্গে প্রায় সকলেই রইলেন। রইলেন পঞ্চভূত, যাদের মধ্যে ধরিত্রীও নিজের যোগদান একপর্বে প্রদান করেন। বুদ্ধি, উর্জ্জা, প্রাণ সাখ্যাতে যোগদান করলেন যুদ্ধে অসৎগুণের তরফ থেকে। আর যোগদান করলেন স্বয়ং সত্ত্বা, এবং উদর।

যুদ্ধের শুরুতে সত্ত্বা একাকীই যুদ্ধক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়ালেন। সৎগুণদের মধ্যে সাহস তাঁকে প্রতিরোধ করতে থাকলেও, তাঁর দমন করতে পারলেন না। এমন সময়ে সত্ত্বাকে যুদ্ধবিরাম প্রদানের উদ্দেশ্যে, বিবেক স্থাপন করলেন লিঙ্গবৈষম্যহীনতাকে। সত্ত্বা সন্দিহান হলেন, আর বিবেকের নির্দেশে সাহস, অসংখ্য বাণের সহ্যায় সত্ত্বাকে শায়িত করলেন।

সম্মুখে এলেন উদর এবং উদরপুত্র উর্জ্জা। প্রবল অহংকার নিয়ে হৃদয়কে আক্রান্ত করলেন উদর। আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে, সাহসের বীজকে স্কন্ধমাতার স্কন্ধকে হত্যা করালেন। উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন সাহস। পণ করলেন যে বুদ্ধির বিনাশ করবেন তিনি। বুদ্ধি পলায়ন করলেন, কিন্তু সাহস তাঁকে সমস্ত রণক্ষেত্র অতিক্রম করেও দমন করলেন। মুণ্ডচ্ছেদ করে, বুদ্ধির অহমিকা দমন করলেন সাহস।

এবার সম্মুখে এলেন সাহস এবং উদর, গুরুশিষ্য। প্রবল যুদ্ধের দ্বারা, সাহস উদরকে নিরস্ত্র করেদিলেন। কিন্তু গুরু তিনি, তাই তাঁর দমন করলেন না। আর সাহস যখন দমনে রুচি রাখলেন না উদরের, তখন আর কেউ তাঁকে দমন করতে পারলো না। তাই বিবেক ধৈর্যের কাছে গিয়ে ধৈর্যকে উর্জ্জার বিনাশ হয়ে গেছে, এই কথা বলতে বললেন। ধৈর্য যতশক্তিশালীই হননা কেন, সমস্ত শক্তি তাঁর ধনুশের কারণেই, অর্থাৎ বিবেকের কারণেই।

আর বিবেক চেতনা দ্বারা পরিচালিত। তাই চেতনার আবাহনকে প্রত্যাখ্যান করার সামর্থ্য যে ধৈর্যেরও নেই। আর তাই ধৈর্যের বাণী প্রকাশিত হলো, উদর ভারাক্রান্ত হলো, আর যমরাজ স্বয়ং তাঁর অহমিকা দমন করলেন অর্থাৎ তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। পতন হলো উদরের, সম্মুখে এলেন উর্জ্জা, বাণ প্রদান করলেন সহস্র চিন্তার। জেদ আক্রান্তও হলেন, কিন্তু বিবেক তাঁর রক্ষা করলেন।

এবার সম্মুখে এলেন মহাত্মাকাঙ্ক্ষা। প্রবল বলধারণ করে, মনবল অর্থাৎ আকাশতত্ত্ব দ্বারা সাহসের দমনে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু চেতনার ইঙ্গিতে বিবেক সম্মুখে প্রেরণ করলেন কালরাত্রির আশীর্বাদ অর্থাৎ জ্ঞানকলসকে। জ্ঞানকলসকে মন বা আকাশতত্ত্বই একমাত্র বিনাশ করতে সক্ষম। তাই মহাত্মাকাঙ্ক্ষাকে আকাশবাণ মুক্ত করতেই হলো, আর অতঃপরে সাহস মহাত্মাকাঙ্ক্ষার অহমিকা দমন করলেন তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে।

এরপরে জেদের তাণ্ডব শুরু হলো। একে একে সমস্ত অসৎগুণের বিনাশ করতে থাকলো জেদ। আর তাঁর সম্মুখে এবার এলো কামনা। কামনার সাথে প্রবল যুদ্ধ হলো জেদের। কিন্তু জেদের প্রকোপকে কামনা সইতে পারলো না। এই কামনার হাত ধরেই সিদ্ধিদাত্রীর মান হননের প্রয়াস হয়েছিল। তাই সেই কামনার ছাতি ছিঁড়ে দিলেন জেদ, এবং ভয়ানক মৃত্যু প্রদান করলেন কামনাকে।

ক্রোধ এবার পলাতক, নিজের মদমত্ততাকে সম্মুখে রাখবেন না, হত্যা হতে দেবেন না নিজের মদভাবের। তাই মায়ার আশ্রয় নিলেন। কিন্তু নিজের মিত্রের এমন অবস্থা দেখে, ক্রুদ্ধ হলেন

উর্জ্জা। যমরাজকে জয় করলেন তিনি, লিঙ্গবিহীনভাবের থেকেও মুক্ত করে দিলেন রাজ্যকে, আর সৎগুণ ভেবে, সিদ্ধিদাত্রীর পঞ্চসিদ্ধির নাশ করলেন।

সৎগুণরা শোকাহত হলেন। সাহস উর্জ্জাকে আক্রমণ করে দিলেন। উর্জ্জা সাহসের ভয়ে পলাতক হলেন। নাট্যধারণ করলেন, কিন্তু জেদের হাতে ধরা পরে গেলেন, বিবেকের প্রেরণায়। আর চেতনার প্রেরণাতেই উর্জ্জার শক্তিকে বিনাশ করে, উর্জ্জাকে পলাতক হতে দিলেন। প্রাণদান দিলেন প্রাণকে। আর বিদ্যা কৌশল বিনাশ করলেন অন্ধরাজার কুটিলতাকে।

আর এবার মদমত্ত ক্রোধকে দমন করলেন জেদদ্বারা। ধরিত্রী মদমত্ত ক্রোধকে লৌহশরীর প্রদান করেছিলেন, কিন্তু চেতনার প্রভাবে মদমত্ততার দণ্ডায়মান থাকার দুই উরুকে ধরিত্রী বরদানে ভূষিত করলেন না। জেদের বলে মদের উরুভঙ্গ হলো। বিনাশ হলো সমস্ত অসৎগুণের। অন্ধরাজার চেতনার উদয় হলো, কিন্তু তাঁর সর্বস্ব হনন হয়ে যায়। আর এই ভাবে সৎগুণরা বিরাজ করলেন রাজ্যে।

এবার বলো পুত্রী, এই কথা কার আত্মকথা, আর এই কথার সারকথাই বা কি?”

মহাগুহ্য কথা

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, “এই কথা তো মা, বেদব্যাসের জীবনী। ... তাঁর আত্মকথা। আর সেই আত্মকথাকে আমরা মহাভারত নামে চিনি।

এখানে প্রথম রাজা বা আত্মের প্রথমাবস্থা হলেন পাণ্ডু, আর অন্ধরাজা হলেন ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডুর প্রকৃতি হলেন কুন্তি ও মাদ্রী, এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃতি হলেন গান্ধারী, যিনি ধরিত্রী বেশে পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও নিজের অংশগ্রহণ করে, দুর্যোধনকে লৌহশরীর প্রদান করেন।

সত্ত্বা হলেন ভীষ্ম, আর উদর হলেন দ্রোণাচার্য, যার সন্তান হলেন উর্জ্জা অর্থাৎ অশ্বত্থামা। আর প্রাণ হলেন কৃপাচার্য। উর্জ্জা পদানত হয়ে পলাতক হলেও জীবিত থাকেন, যেমন সাধকের মধ্যে

থাকেন, না থেকেও। আর প্রাণ সিদ্ধপুরুষের মধ্যেও কুলগুরু হয়ে থাকেন, আর তাই কৃপাচার্যও জীবিত থাকেন। উদর সর্বদাই হৃদয়কে নিজের অধিকারে রাখতে চান, আর তাই চেয়েছিলেন, আর সেই হৃদয় হলেন দ্রুপদ।

অসৎসন্তানরা হলেন কৌরবভ্রাতারা, এবং অন্ধরাজার কুটিল বুদ্ধি হলেন শকুনি। মহাত্মাকাঙ্ক্ষা হলেন কর্ণ, আর বুদ্ধি হলেন জয়দ্রথ। হৃদয়ের অপমানের পর যজ্ঞ থেকে আসেন যমরাজ অর্থাৎ ধৃষ্টদমুম্ন্য, আর হৃদয়ের পূর্বসন্তান লিঙ্গবৈষম্যহীন ভাব অর্থাৎ শিখণ্ডী। আর চেতনার নয়রূপ হলেন পাণ্ডবদের সমস্ত স্ত্রীরা, যারা সকলে মিলে নবদুর্গা।

অন্যদিকে ভেদভাব হলেন মায়াবী, আসুরিক জরাসন্ধ, আর বাচালতা হলেন শিশুপাল। আর আপনি প্রশ্ন করলেন না, এই সমস্ত কিছু ভেদ কি? এই সমস্ত কিছুর ভেদ হলো, চেতনার বিকাশ।

বিস্তারে বলতে গেলে, এঁর ভেদ এই যে শিশুকালে আমাদের আত্ম যদি প্রকৃতিপ্রেমী হয়, তবে তাঁর মধ্যে সৎগুণের উদয় হয়, আর সৎগুণরা একসময়ে চেতনাকে লাভ করেন। কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের আত্ম আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকার কারণে তিনি অন্ধ হন। আর যেহেতু আত্মই আমাদের রাজা, তাই অন্ধরাজার শাসনেই আমরা অবস্থান করি।

অন্ধরাজার অন্ধত্বের কারণে অসৎগুণদের জন্ম হয়, এবং উপদ্রব বারে। ক্রমে অসৎগুণরা অন্ধরাজার আশকারা পেয়ে পেয়ে, মহাত্মাকাঙ্ক্ষার সাথে সখ্যতা করে, এবং উর্জ্জাকেও সঙ্গে নিয়ে নেয়। শেষে তাঁরা সমস্ত সত্ত্বাকে, উদরকে, উর্জ্জাকে, বুদ্ধিকে, প্রাণকে তথা মহাত্মাকাঙ্খাকে নিজের সাথে রেখে, সৎগুণদের এমনকি স্বয়ং জগন্মাতা চেতনা, যিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তাঁরও অসম্মান করেন।

আর সেই অসম্মানের থেকে জন্ম নেয় সাধকের মহারণ, অর্থাৎ সাধক নিজের অন্তরে যেই কুরুক্ষেত্রের জন্ম দেয়, যেখানে চেতনার প্রেরণায় বিবেক রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ ধনুশ সৎগুণদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের বাণ রূপ প্রদান করে, অসৎগুণের বিনাশ করে। সত্ত্বাকে অর্থাৎ ভীষ্মকে

অকৃতকার্য করে দেয়, উদরের অহমিকার ছেদন করে, বুদ্ধির ও আকাঙ্ক্ষার অহংকার ছেদন করে, তাই মস্তক ছেদ করে। উর্জ্জাকে দমিত করে, এবং প্রাণকে সুরক্ষা প্রদান করে। কামনাকে ভয়ানক মৃত্যু প্রদান করে অর্থাৎ দুঃশাসনকে ও তাঁর ভ্রাতাদের ভয়ানক মৃত্যু প্রদান করে, এবং অবশেষে মদমত্ততাকে অকৃতকার্য করে, হত্যা করে।

কিন্তু মা, আমার এই সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে। যদি প্রথম জীবনে কারুর মধ্যে চেতনার প্রতি আনুগত্য না থাকে? অর্থাৎ যদি চেতনার উদয় না হয় কারুর মধ্যে? এই উদয় আপনার মধ্যে হয়েছিল, আপনি বলেছিলেন। বেদব্যাসের মধ্যে হয়েছিল, শঙ্করাচার্যের মধ্যে, চৈতন্যদেবের মধ্যে, রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু মা, এঁরা সকলেই তো ঈশ্বরকটি! ...

জীবকটির মধ্যে তো এই চেতনার উদ্বেগ হয়ই না। তাহলে কি তাঁদের পক্ষে সাধনা সম্ভব নয়? অর্থাৎ আমার প্রশ্ন এই যে, যদি চেতনার উদয় না হয়, তাহলে তো এই অন্ধরাজার অধীনেই চিরকাল থাকতে হবে! আর তাহলে তো সাধনা কনো কালেই সম্ভব হবেনা। ... তাহলে জীবকটির কি কনো উপায় নেই?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "তোমার থেকে ঠিক এই ভাবধারাই আশা করছিলাম পুত্রী। ... সেই ঈশ্বরকটি, ঈশ্বরকটি কি করে হয়, যে কেবলই আত্মকেন্দ্রিক, যে কেবল নিজের উদ্ধারেরই চিন্তা করেন। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকে দেখো, আঁটটি জীবের বেদনা দেখে ব্যাথিত হন তিনি, নিজের বেদনা দেখে নয়। আর সেই বেদনার কারণ ও নিরাময়ের উপায় সন্ধান করতে তিনি রাজপ্রাসাদের সুখ ত্যাগ করে বনবাসী হন। ... সমস্ত পরাচেতনার সন্তানের প্রতি যদি প্রেমই না থাকে, তবে তিনি অবতার কি করে হলেন! ...

তবে পুত্রী, এই ক্ষেত্রেও আমাকে নিজের থেকে কিছু বলতে হবেনা। কারণ এঁর উত্তর স্বয়ং মহামুনি মার্কণ্ডই প্রদান করে গেছেন"।

দিব্যশ্রী ব্যকুল কণ্ঠে বললেন, "কি ভাবে মা? ... কোন কথার মাধ্যমে?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “সতীর কথা তো তুমি জানোই পুত্রী। ... সতী যখন নিজের আদিশক্তি স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই, আত্মদাহ করেন, তখন তো সেই পরিস্থিতিই তৈরি হয়, যেই পরিস্থিতির কথা তুমি বললে। ... অর্থাৎ, দক্ষ অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব অহম উপস্থিত থাকে, আর তাঁকে প্রতিরোধ করার মত চেতনাও থাকেনা। ... কি তাই না?”

দিব্যশ্রী বললেন, “শিব তখন উদ্যম হয়ে ওঠে, নিজের জটার থেকে বীরভদ্র, মহাভৈরবের জন্ম দেয়, আর বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে, আত্মকেন্দ্রিক ভাবের, অহমের নাশ করে। ... কিন্তু সাধকের জীবনের কোন কথাকে বলে এই কথা?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বলেন, “যখন চেতনা উপস্থিত থাকেনা সাধকের মধ্যে, কনো পাণ্ডুর অস্তিত্ব থাকেনা, কেবলই ধৃতরাষ্ট্র উপস্থিত থাকে, কেবলই দক্ষ উপস্থিত থাক, তখন আত্মেরই মহারুদ্র স্বরূপ এই আত্মকেন্দ্রিক ভাবের নাশ করে। পুত্রী, এই আত্মকেন্দ্রিক ভাব আমাদের আত্মের হয়, যে অন্য কনো কিছুকে দেখতে চায়না, নিজেকে ছাড়া।

অন্য কনো কিছুর প্রতি যদি তাঁর নজরও যায়, তাহলে এই কারণে যায় যে, সেই অন্য কিছু তাঁর আত্মকে কনো না কনো ভাবে উদ্ভাসিত করে, প্রকাশিত করে, বা প্রতিষ্ঠা প্রদান করে। পুত্রী, কম বেশি সমস্ত সাধারণ মানুষই আত্মকেন্দ্রিক হন। কেউ কেবলই নিজের সুখ চিন্তা করেন, আর সেই সুখ তখনই সম্ভব, যখন নিজের পতি, পত্নী, বা সন্তান, বা পিতামাতা সুখী থাকবেন, এমন বিচার করে, কেবলই সেই কয়জনের সুখের জন্য জীবনযাপন করেন, যেই কয়জন সুখী হলে, তিনি স্বয়ং সুখী হবেন।

আবার কারুর এই সুখচিন্তা আরো একটু অধিক বিস্তৃত হয়, যেখানে নিজের অধীনস্থ এবং তিনি নিজে যার অধীনস্থ কর্মচারী তাঁর সুখের চিন্তাও করেন। আরো একটু বিস্তৃত হলে, এই আত্মকেন্দ্রিকতা নিজের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের, অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিগুষ্ঠি, এঁদেরও সুখচিন্তা করেন। আবার আরো একটু এই আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাসার্ধ বিস্তারিত হলে, এঁর মধ্যে নিজের সাথে সংলগ্ন জাতি, প্রবাসী, সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগন, ইত্যাদিও প্রবেশ করে।

কিন্তু মানবসমাজের জন্য সর্বাধিক ভয়ঙ্কর তিনি হন, যার ব্যাসার্ধ কেবলই স্বয়ং হয়। সেই স্বয়ং-এর মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতাপিতা, ভ্রাতাভগিনী, বন্ধু জ্ঞাতি, অধীনস্থ বা উচ্চপদস্থ, গুরু বা আচার্য, অনুগামী ও অধোগামী, কেউ থাকেন না, অর্থাৎ যিনি কেবল স্বয়ং-এর সুখ চিন্তা করেন, আর সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য তিনি যেকোনো কারুকে নিয়ে বানিজ্যিকরনও করতে পারেন। ইনি আবার ভয়ানক হয়ে ওঠেন, যখন এই আত্মসুখী ভাবকে তিনি লুকিয়ে রাখার জন্য, অন্য সকলের চিন্তা করছেন, এমন নাট্য করা শুরু করেন।

পুত্রী, এই চরমস্তরের আত্মসুখী ব্যক্তিকে শয়তান বলা হয়, আর যিনি এমন আত্মসুখী হয়েও, নাট্য করেন যে তিনি আত্মসুখী নন, তাঁকে আমরা বলি শ্রেষ্ঠ শয়তান, বা অসুররাজ। ... দক্ষ ঠিক এমনই ছিলেন, আর ধৃতরাষ্ট্রও। ... কিন্তু ধরিতরাষ্ট্রের সম্মুখে স্বয়ং নবদুর্গা ছিলেন, এবং ছিলেন তাঁর ধনুশ অর্থাৎ বিবেক বা কৃষ্ণ, আর সেই ধনুশের পঞ্চবাণ অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব। কিন্তু দক্ষের সম্মুখে কেবলই চেতনা ছিলেন, যিনিও নিজের স্বরূপকে লাভ করার পূর্বেই আত্মদাহ করেন।

মার্কণ্ড মহামুনি এখানেই জীবকটিদের উদ্দেশ্যে বলতে নারাজ ছিলেন যে, চেতনা জাগ্রত না হলে সাধনা হবেনা। ... বা সত্য বলতে, ঠিক এই স্থান থেকেই তিনি তন্ত্রমতের রচনা করেন, যা এই দক্ষদের মুণ্ডচ্ছেদ করে, তাঁকে সাধক গোড়ে তোলে। আর এই তন্ত্রের আচার সমূহ এই উদ্দেশ্যেই ধাবিত যে, আত্মের তমগুণকে উত্তেজিত করা হবে, সেই উত্তেজিত তমগুণের মধ্যে চেতনার সমস্ত তত্ত্ব, অর্থাৎ পার্বতীর দশমহাবিদ্যাকে স্থাপন করা হবে, এবং তাঁর ফলে তমগুণের অন্তর থেকে বীরভদ্র অর্থাৎ উগ্র ভৈরবের জন্ম হবে।

পুত্রী, মার্কণ্ড নিজের কথার সামপ্তি করেন নি, কেবল সতীর কথা বলে। মূলত, তাঁর কথার তো শুরুই হয় সেখান থেকে। পরবর্তীতে পরাচেতনা পার্বতী বেশে আসেন, এবং বিরক্ত শিবকে পদতলে পিষ্ট করে, তাঁর অহমিকার নাশ করে, তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে, তাঁকে বিবেক ও বিচারের পিতা করে তোলেন। আর যেই পদ্ধতি অনুসারে মাতা পার্বতী নিজের অন্তরে এই মহাকাল্যকে উদ্ভাসিত করেন, তা হলো দশমহাবিদ্যা।

এঁতে প্রথমেই তমগুনি আত্মকে আত্মসাৎ করেন তিনি ধূমাবতী বেশে, আর তাঁকে নিজের অন্তরে তাঁর সত্য প্রকাশিত করে করে দেখান যে তিনিই কমলাবেশে সমস্ত সম্পদ ও শ্রীর প্রতিষ্ঠাত্রী, তিনিই বাক ও বাকসংযমী বশীকরণ ধারার প্রতিষ্ঠাত্রী বগলা। দেখান যে তিনিই বিদ্যা প্রদত্তা ভেদভাবের নাশক মাতঙ্গী, এবং তিনিই ত্যাগ ও স্নেহের জননী ছিন্নমস্তা। আরো দেখান যে তিনিই হলেন মৃত্যুর দেবী ভৈরবী, আবার জীবনের দেবী পঞ্চভূতের জননী ত্রিপুরাসুন্দরী ললিতা। আরো দেখান যে তিনিই সমস্ত ষোড়শপুরের জননী ভুবনেশ্বরী, এবং তিনিই স্বয়ং আত্মেরও জননী তারা, আর অন্তে তিনি দেখান যে তিনিই একমাত্র সত্য, স্বয়ং নিরাকার নিঃশব্দ মহাশূন্য মহাকালী।

এই সমস্ত তত্ত্বই আত্মকে বিরক্তি থেকে মুক্ত করে, তাঁকে শব রূপে শায়িত করে কালীর সম্মুখে এবং তিনি কালীকে অর্থাৎ পরাচেতনাকে ধারণ করে, সদাশিব হয়ে ওঠেন, এবং বৈরাগী হয়ে, বিচার ও বিবেকের জন্ম দিয়ে সাধক হয়ে ওঠেন। এই ধারার অনুসরণ করেই তন্ত্রের রচনা পুত্রী, যেখানে সাধক নিজের অন্তরকে পরাচেতনা, আদি পরাশক্তি মহাকালীর দশমহাবিদ্যার কাছে সমর্পণ করেন, এবং বাহ্যে সমস্ত ভেদভাব ত্যাগ করে, সমস্ত সুখচিন্তা ত্যাগ করে, নরাধমের ন্যায় জীবনযাপন করেন।

এবং এমন করে, তিনি নিজের অন্তরে সমস্ত চেতনাতত্ত্বকে তমগুণের মধ্যে প্রকাশিত করে জাগ্রত করেন ভৈরবকে, আর সেই ভৈরবই বিনাশ করেন আত্মকেন্দ্রিক অহমের। আর একবার তা হয়ে গেলে, তিনি পূর্ণ ভাবে সাধক হয়ে যান, কারণ তাঁর অন্তরেও বিচার ও বিবেকের জন্ম হয়, এবং সমস্ত তারকাসুরের নাশ করে, তিনি হয়ে ওঠেন সিদ্ধ, তন্ত্রসিদ্ধ সাধক।

অর্থাৎ পুত্রী, যার অন্তরে চেতনার জাগরণ হয়নি, তাঁর জন্য উপায় রূপে দেখিয়ে গেছেন মার্কণ্ড এই ভৈরবের জাগরণী মন্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র"।

দিব্যশ্রী ব্যকুল হয়ে বললেন, "তাহলে কি তন্ত্র ছাড়া কনো উপায় নেই সাধারণ মানুষের। সেই গৃহত্যাগ করে, বনবাসে গিয়ে, নরাধমের জীবনযাপন করে, তবেই তাঁর পক্ষে সাধন সম্ভব! ...

আর কনো ভাবে কি সাধনা হয়না মা! ... ভক্তিমত, বা অন্যকিছু? ... আচ্ছা মা, কৃতান্তও তো এই ভৈরবের কথা বলেছেন, অখণ্ডের অন্তরে এই ভৈরব জাগ্রত হতে, তবেই কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার নাশ হয়। তবে কি কৃতান্তিক হতেও বনাঞ্চলে যেতে হবে? ... আপনি তো যাননি বনাঞ্চলে! ... কৃপা করে আমার দ্বন্দ্বের মীমাংসা প্রদান করুন মা। ... ভক্তিমতের বিস্তার কি? আর কৃতান্তও কি ধারার কথা বলে, আমাকে তা বলুন। ... আসলে আমি সাধারণ মানুষের সাধনার জন্য সহজ পথ খুঁজছি। আমাকে সাহায্য করুন মা"।

গুহ্য কৃতান্ত

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "বেশ, আমি তোমাকে সেই কথা বলছি। ... আর তার পূর্বে অবশ্যই বলবো যে, কৃতান্ত ধারার নির্মাণই হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে যা তোমারও প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সহজ সাধন পথ। ... তবে কৃতান্তের পথের কথা বলার পূর্বে আমি তোমাকে ভক্তির কথা বলবো। ...

পুত্রী, ভক্তি ঈশ্বরলাভ করাতে ব্যর্থ। হ্যাঁ, ভগবান লাভ করাতে সক্ষম ভক্তি। আর ভক্তি তাঁর দ্বারা কখনোই লব্ধ নয়, যিনি সম্পূর্ণ ভাবে আত্মকেন্দ্রিক। ... এই সামান্য কথা বলে, এবার তোমাকে আমি ভক্তির বিষয়ে গভীর ভাবে বলছি শ্রবণ করো।

পুত্রী, প্রথমেই জেনে নাও ভক্তি কি? পুত্রী, ভক্তি হলো হৃদয় দেশ থেকে নির্গত হওয়া একটি ভাব, যা এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি প্রতিফলিত হয়, আর তাতে মিশ্রিত থাকে ধারণা, বিশ্বাস ও সম্মান, এই তিন ভাব।

অর্থাৎ, প্রথম কথাই এই যে, ভক্তি কনো আবেগ নয় যে, তা মস্তিষ্কপ্রসূত হবে। এটি একটি ভাব, অর্থাৎ এঁর উদয় হয় হৃদয়দেশ থেকে। পরবর্তী কথা এই যে, এই ভাব প্রতিফলিত কার উপর হয়? কনো অন্য ব্যক্তির প্রতি এবং কনো অন্য বস্তুর প্রতি প্রতিফলিত হয়। আর এঁর উপাদান কি কি? এঁর উপাদান ধারণা, বিশ্বাস ও সম্মান।

এবার এই ধারণা কি? যা কিছু ধারণ করা হয়, বা ধারণ করা যায়, বা ধারণ করা হয়েছে, তাই হলো ধারণা। হ্যাঁ পুত্রী, ধারনার তিনটি স্তর হয়, প্রথমটি যা ধারণ করা হয়, অর্থাৎ ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তা ধারণ করা হলেও তা ধারণা আর তা ধারণ করা না হলেও ধারণা। যেমন ধর পুরাণ সমূহ হলো দিব্যগ্রন্থ। এটি একটি ধারণ করার নির্দেশ। তা তুমি যদি ধারণ করো, তাও এটি একটি ধারণা, আবার যদি না করো, তাও এটি একটি ধারণা।

অপরদিকে দ্বিতীয় ধারণার স্তর হলো তাই, যা ধারণ করা যায়। সমস্ত কিছু ধারণা করার উপযুক্তই নয়, যেমন ব্রহ্ম বা মহাশূন্য। মহাশূন্যকে বা ব্রহ্মকে ধারণা করাই অসম্ভব। কিন্তু ভৌতিক যা কিছু, যেমন ধরো দেশ, সময়, প্রকৃতি, রাজনীতি ও বিদ্যা ধারণা করা সম্ভব। যিনি এই সমূহের মধ্যে কনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু ধারণা করে উঠতে পারেন নি, তাঁকেও ধারক বলা হয়।

আর তৃতীয় হলো যিনি ধারণা করে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। কি কি ধারণা করে নিয়েছেন? অবশ্যই যাকিছু ধারণা করা যায়, অর্থাৎ দেশ, সময়, প্রকৃতি, রাজনীতি ও বিদ্যা। তিনি এই সমূহের মধ্যে কনো একটিকে ধারণ করে নিয়েছেন।

অর্থাৎ বুঝতে পারছ তো পুত্রী, এই ধারণ করা যেহেতু তিনপ্রকার, তাই ভক্তিও তিন প্রকার হয়। প্রথম প্রকার ভক্তি হলো সেই ভক্তি, যেখানে ধারণা করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে; দ্বিতীয় হলো যেখানে ধারণা করার সামগ্রী লাভ হয়েছে, আর তৃতীয় প্রকার ভক্তি হলো যেখানে ধারণা করা হয়েছে।

এবার কথা এই যে, যখন কনো কিছুকে ধারণা করা হয়নি, তখন সেই বস্তু বা সামগ্রীর সমষ্টিকরন বা একত্রীকরণ আমাদের অন্তরে মদ বা অহমিকার জন্ম দেয়। যেমন ধরো, আমি কনো গ্রন্থ পাঠ করিনি, কিন্তু সেই গ্রন্থকে আমি আমার বাড়িতে সাজিয়ে রেখেছি। এই ক্ষেত্রে একটি অহমিকার জন্ম হয়, আর সেই অহমিকা থেকে একটি চাহিদা বা কামনারও জন্ম হয়। অর্থাৎ যেমন গ্রন্থের কথা বললাম, তেমন ক্ষেত্রেই, এই কামনার জন্ম নেয় যে, আমার তারিফ

করবে অনেকে, কারণ আমার কাছে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহ আছে। আর তাই, প্রথম দুই ধরনের ধারণার থেকে অহমিকা ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। অর্থাৎ যেখানে ধারণার কেবলই নির্দেশ লাভ হয়েছে বা ধারণার সামগ্রীর একত্রীকরণ হয়েছে, কিন্তু ধারণা করা হয়নি, সেখানে জন্ম নেয় আকাঙ্ক্ষার, কামনার এবং সেই ধারণা মিশ্রিত ভক্তি হয়ে ওঠে সকাম ভক্তি।

তৃতীয় যেই ধারণা, অর্থাৎ যেখানে গ্রন্থপাঠ হয়েছে, সেখানে আকাঙ্ক্ষার বিস্তারের সম্ভাবনা থাকলেও তা কমে যায়, আর যদি কামনা থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে ভক্তি, তখন তা হয়ে ওঠে নিষ্কাম ভক্তি। এবার আরো একটি গুহ্য ভাবে বিচার করো পুত্রী। ধারণা কার করা হবে? বিদ্যা অর্থাৎ গ্রন্থাদির, প্রকৃতির, সময়ের। এঁরা সকলেই ভৌতিক বা সূক্ষ্ম, অর্থাৎ সকলেই এই অনিত্য বা মিথ্যা বা কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ।

তাই যখন এই কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডের কনো প্রকাশকেই ধারণ করে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্পণ করছো, তখন যে কনো ভাবেই তোমার ভাব সত্যকে স্পর্শ করতে সমর্থ নয়। পুত্রী, কল্পনার উপর বিশ্বাস কখনোই সত্যকে ধারণ করায় না, কারণ কল্পনা স্বয়ংই সত্য নয়। তেমনই পুত্রী, গ্রন্থাদির কথা যদি বলো, প্রকৃতির কথা যদি বলো, সময়ের কথা যদি বলো, এঁরা সকলেই সত্যকে প্রকাশ করতে ব্যকুল, কিন্তু তাও এঁদের প্রকাশের মধ্যে কোথাও না কোথাও অসত্য স্থাপিত থাকে, আর তা থাকে বলেই, তারা এই অলিক কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডে অস্তিত্বে থেকে যায় সর্বক্ষণ।

তাই ধারণা করা হলেও, তা সত্যের স্পর্শ প্রদান করতে পারেনা। আর তাই ভক্তি সত্যের উদ্দেশ্যে ধাবমান হলেও, সত্যে স্থাপিত হতে ব্যর্থ। কেন? কারণ ধারণা এই করা হয় যে, সময় সত্য, প্রকৃতি সত্য, গ্রন্থ সত্য, এবং গ্রন্থের বর্ণনা সত্য। কিন্তু এঁদেরকে সত্য মানার কালে, গ্রন্থের পাঠক, বা সময়ের দর্শক, বা প্রকৃতির অনুধাবক অসত্য হয়ে যাচ্ছেন না, অর্থাৎ আমি অসত্য হচ্ছি না।

আর আমি কি পুত্রী? আমি হলো ব্রহ্মাণু। ব্রহ্মাণু কি? ব্রহ্মাণু হলো ব্রহ্মের অণু। আর ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম মানে অভেদ্য এবং সমসত্ত্ব। অভেদ্যকে কি ভাবে ভাগ করা সম্ভব? অসম্ভব তাই না! যদি তা অসম্ভবই হয়, তাহলে অণু অর্থাৎ অভেদ্যের ভাগ কি করে সত্য হয়? অসম্ভব। অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুই সম্ভব নয়, ব্রহ্মের অণুই অসত্য। তাহলে ব্রহ্মাণু কি করে সত্য হতে পারে?

পারেনা সত্য হতে, আর তাই যতক্ষণ 'আমি' থাকে, ততক্ষণ সত্যলাভ সম্ভবই নয়, কারণ এই 'আমি'ই যে শ্রেষ্ঠ অসত্য। কিন্তু ভক্তিকে এবার দেখো। ধারণা থাকে, সেই ধারণাতে বিশ্বাসও থাকে। সেই বিশ্বাসের ফলে ধারণা যার প্রতি, তাঁর প্রতি সম্মানও থাকে। কিন্তু এই ধারণা কার? এই বিশ্বাস কার? এই সম্মান কে করছেন? —'আমি'। আর আমি কি? অসত্য। অর্থাৎ ভক্তি সত্যকে ধারণ করতে অক্ষম, যদিও তা অবশ্যই সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে।

তাই পুত্রী, ভক্তি অবশ্যই প্রগতি, কিন্তু তা গন্তব্য নয়। সত্যলাভ হলো আমাদের গন্তব্য। আর সত্যলাভ তখনই সম্ভব হবে, যখন 'আমি' দুর্বল হয়ে যাবে, এই 'আমি' পরনির্ভর হয়ে যাবে, এই 'আমি' অহেতুক হয়ে যাবে, এই 'আমি' অনিত্য হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তিতে তা হয়না। ভক্তিতে, 'আমার ধারণা', 'আমার ভাব', 'আমার বিশ্বাস', 'আমার সম্মান' এই সমস্ত থেকেই যায়।

হ্যাঁ অবশ্যই সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রার পথে ভক্তি আসে, তাই ভক্তি সত্যের দিশায় যাত্রার নিশান, কিন্তু ভক্তি কখনোই সত্যলাভের নিশান নয়। ভক্তিলাভের পরেও বহুদূর যাত্রা করলে, তবেই সত্যলাভ সম্ভব। সেই জন্যই প্রথমেই বলেছিলাম পুত্রী, ভক্তি ভগবানকে লাভ করাতে পারে, ঈশ্বরকে নয়।

এবার ভগবান আর ঈশ্বরের ভেদ বোঝা আবশ্যক। ভগবান হলেন জগতসংসারের তিনি, যাকে আজকের বাণিজ্যিক জগতে বলো ম্যানেজার অর্থাৎ ব্যবস্থায়ক। এবার ব্যবস্থায়ক অনেক হতে পারেন, আর হনও, যেমন বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থায়ক, অর্থদপ্তরের ব্যবস্থায়ক, সামগ্রী দপ্তরের ব্যবস্থায়ক ইত্যাদি। তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের একটি ব্যবস্থায়ক হলেন সত্ত্বগুণ, যাকে আর্যরা বলেন

ব্রহ্মা; দ্বিতীয়জন হলেন রজগুণ, যাকে আর্যরা বলেন বিষ্ণু; আর তৃতীয়জন হলেন তমগুণ, যাকে আর্যরা বলেন শিব।

এবার, এই ব্যবস্থায়কদের অধীনস্থ থাকে দেবরা, যারা অন্য কিছুই নন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আমাদের দেহের, আর এঁদের কর্ণধার হলেন আর্যদের মতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন ও ধরিত্রী, এই পঞ্চভূত, আর আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে তাঁরা হলেন, আমাদের মন বা আকাশতত্ত্ব বা ইন্দ্র, বুদ্ধি বা জলতত্ত্ব বা বরুণ, উর্জ্জা বা অগ্নিতত্ত্ব, প্রাণবায়ু বা পবনতত্ত্ব, এবং দেহ বা ধরিত্রীতত্ত্ব।

আর এঁদের সবার উর্ধ্বে অবস্থান করছেন কে? বৌদ্ধরা যাকে বলেন বিনায়ক, আর্যরা যাকে বলেন গণেশ, বেদব্যাস যাকে বলেছিলেন কৃষ্ণ, আর বাস্তবে যিনি হলেন বিবেক। ... পুত্রী, যেমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, সমস্ত ব্যসবস্থায়কের উপরে থাকে ম্যানিজিং ডিরেক্টর, তেমনই হলেন বিনায়ক বা গণেশ বা কৃষ্ণ বা বিবেক। চেতনার থেকে জাত, ব্রহ্মসন্তান গণেশ বা বিনায়ক সমস্ত অন্য ব্যবস্থায়কের নিয়ন্ত্রক, এবং তাঁদের শিরোপরে স্থিত।

আর এঁরাই হলেন সকল ভগবান অর্থাৎ ব্যবস্থায়ক। এঁদের সঙ্গে বিচার অর্থাৎ আর্যরা যাকে বলেন কার্ত্তিক তাঁকেও পাবে, আরো অনেককে পাবে। কিন্তু ঈশ্বর কি? ঈশ্বর তিনি যিনি অব্যাক্ত, যিনি অচিন্ত্য, যিনি অখণ্ড, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি মহাশূন্য, যিনি সম্পূর্ণ রূপে নিরাকার। আর তিনি হলেন ব্রহ্ম, অর্থাৎ মহাশূন্য, অর্থাৎ তিনি যার দর্শন হলে ধ্যান হয়ে যায়, যাকে লাভ হলে সমাধি হয়ে যায়, আর যাতে বিলীন হলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে যায়।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইনাকে বলেন মালিক, যিনি একাধিক রূপসম্পন্ন হলেও এককই এবং কনো দ্বৈততা নেই তাঁর মধ্যে। ইনি সমস্ত ব্যবস্থায়কের জননী, সমস্ত ব্যবস্থায়কের উৎস, এবং সমস্ত কিছুর সত্য। কিন্তু আমরা এই সত্যের আভাস পাই কি করে? এই সত্যই সমস্ত ব্যবস্থায়ককে এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন, যাকে আমরা বলে থাকি ব্রহ্মের কারণরূপে প্রকাশ বা নিয়তি।

মালিক তিনি। তিনি কেবল শীর্ষব্যবস্থায়কদের বেঁধে রেখেই ক্ষান্ত হননা। তিনি নিম্নব্যবস্থায়ক অর্থাৎ ভূতদেরকেও বেঁধে রেখেছেন, চতুর্বিংশতিতত্ত্বকেও বেঁধে রেখেছেন। কিরূপে বেঁধে রেখেছেন? সূক্ষ্ম বেশে বেঁধে রেখেছেন সময়ের নিয়ন্ত্রক বা কালের নিয়ন্ত্রকরূপে, যাকে মহামুনি মার্কণ্ড কি নাম দিয়েছেন? মহাকালী।

এখানেই কি তাঁর বন্ধন শেষ? কি করে হতে পারে? তিনি তো মালিক, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই গর্ভে অবস্থান করছে। তাই কেবল কারণপ্রকাশ বা সূক্ষ্মপ্রকাশে তিনি সমাপ্ত হতে পারেন কি ভাবে? স্থুলপ্রকাশে তিনিই প্রকৃতি, পরাপ্রকৃতি, অর্থাৎ তাঁর থেকেই আমরা আমাদের সকলে নিজের নিজের প্রকৃতি, নিজের নিজের চরিত্র ধারণ করে থাকি। আর ঈশ্বর হলেন তিনি।

কিন্তু তাঁকে ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন করা সম্ভবই নয়। না আমি তুমি, না অন্য কেউ, আর না এই ব্যবস্থায়ক, অর্থাৎ আর্যদের মতে দেব, ত্রিদেব বা স্বয়ং বিনায়কও তাঁর নিকট ভক্তিবলে উপস্থিত হতে পারেন না। কেন পারেন না? কারণ তিনি ভক্তি স্বীকারই করেন না। কেন করেন না? কারণ তিনি তো অদ্বৈত। ভক্তি তো অদ্বৈত নয়, ভক্তিতে তো 'আমি' উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ 'আমি' ও 'সে' অর্থাৎ দ্বৈত।

তাই ভক্তি তিনি স্বীকার করেন না বলা ভুল হবে। সঠিক বলতে গেলে, ভক্তির কনো মান্যতাই নেই তাঁর কাছে। তাঁর দর্শন পেতে গেলে, তাঁকে লাভ করতে গেলে, নিজের 'আমিত্ব'কে সম্পূর্ণ ভাবে বিসর্জন দিতে হয়। ... 'আমি' বলে কিচ্ছু থাকবে না। ... শুধুই তিনি, শুধুই সত্য, সেই সত্যে কনো 'অ' যুক্ত নেই, তাই কনো অসত্যের অস্তিত্বই নেই।

অর্থাৎ পুত্রী, যতক্ষণ 'আমি করছি', 'আমি মানছি', 'আমি বিশ্বাস করি', 'আমার বিশ্বাস', 'আমার ভক্তি', 'আমার জ্ঞান', 'আমার বৈরাগ্য' এই সমস্ত থাকে, ততক্ষণ তাঁর সম্মুখে পৌঁছান অসম্ভব, সম্পূর্ণ ভাবে অসম্ভব। তবে উপায় কি?

ঈশ্বর পেতে গেলে, ঈশ্বর হতে হয়। ব্রহ্মলাভ করতে গেলে, শঙ্করের 'অহম ব্রহ্মস্মি' হতে হয়। ... নিজের সমস্ত নিজস্বতা ত্যাগ করতে হয়। নিজের দেহবোধ, নিজের পঞ্চভূতের বোধ,

নিজের গুণবোধ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে হয়। জ্ঞান, বিবেক, বিচার সমস্ত ঝোরে গেলে, তবেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ হয়।

পুত্রী, যতক্ষণ জননীর গর্ভের একটি নাড়ির সাথেও সন্তানের যোগাযোগ থাকে, ততক্ষণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়না। যতক্ষণ একটি পুষ্পের পাতাও ফলের সাথে যুক্ত থাকে, ফল ততক্ষণ পক্কতার দিকে যাত্রা করেনা। ঠিক তেমনই, যতক্ষণ আমাদের মধ্যে লেশমাত্র আমিত্বের বোধও অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ আমাদের জননীর সম্মুখীন হতে পারিনা আমরা, ব্রহ্মলাভ হয়না।

সমস্ত আমিত্ব, সমস্ত আমার গুণ, সমস্ত আমার বিশ্বাস, সমস্ত আমার ধারণা, সমস্ত আমার বিচার, সমস্ত আমার জ্ঞান, সমস্ত কিছু যখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়, তখনই তাঁর দর্শন লাভ হয়। কনো দিব্যদৃষ্টি, কনো কারুর কৃপা, কনো কারুর প্রদত্ত বরদান, কনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। আর তাই এই সমস্ত কিছুর কনোটিই তোমাকে তাঁর সম্মুখে নিয়ে যেতে ব্যর্থ।

পুত্রী, জ্ঞান, বিচার, বৈরাগ্য, সুচরিত্র, সমস্ত কিছুর প্রয়োজন ততক্ষণই যতক্ষণ না তাঁর সকাশে উপস্থিত হচ্ছ। একবার তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে গেলে, জ্ঞান, বিচার, বৈরাগ্য, সুচরিত্র, ইত্যাদির একটির প্রতিও যদি আসক্তি রাখো, তবে তাঁর দর্শন অসম্ভব। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই সত্যকে কি বলতেন জানো? বলতেন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়, তারপর দুটি কাঁটাকেই ফেলে দিতে হয়।

অর্থাৎ, অজ্ঞানতা, বদ্ধধারণা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থচিন্তা, কামনা, মোহ, ইত্যাদি হলো প্রথম কাঁটা। সেই কাঁটাকে তুলতে হয় দ্বিতীয় কাঁটা অর্থাৎ জ্ঞান, বিচার, বৈরাগ্য এবং সুচরিত্র দ্বারা। আর একবার তা তোলা হয়ে গেলে, যেমন অজ্ঞানতাকেও ফেলতে হয়, তেমন জ্ঞানকেও; যেমন বদ্ধধারণাকে ফেলতে হয়, তেমন বিচারকেও; যেমন আত্মকেন্দ্রিকতাকে স্বার্থ চিন্তাকেও ফেলতে হয়, তেমন সুচরিত্রকেও; যেমন কামনা মোহকেও ফেলতে হয়, তেমন বৈরাগ্যকেও। তবেই তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব।

এক কথাতে বলতে হলে, পুত্রী, এক ঈশ্বরই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। ব্রহ্মের দর্শন ব্রহ্ম বিনা কেউ লাভ করেন না। তাই পুত্রী, জ্ঞান আহরণ আবশ্যক অজ্ঞানতার দূরীকরণের জন্য, কিন্তু সেই জ্ঞান অজ্ঞান, দুইকেই ফেলতে হয়। বৈরাগ্য আবশ্যক, কামনা ও মোহের থেকে মুক্ত হবার জন্য, কিন্তু তাও ফেলতে হয়। ... সমস্ত কিছুর থেকে মুক্ত হতে হয়।

সমস্ত শব্দের থেকে মুক্ত হয়ে নিঃশব্দ হতে হয়; সমস্ত দৃশ্যের থেকে মুক্ত হয়ে অদৃশ্য হতে হয়; সমস্ত ভেদের থেকে মুক্ত হয়ে অভেদ্য হতে হয়; সমস্ত বিচারের থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিচার হতে হয়; সমস্ত ব্যখ্যার থেকে মুক্ত হয়ে অব্যাক্ত হতে হয়; সমস্ত চিন্তার থেকে মুক্ত হয়ে অচিন্ত্য হতে হয়; সমস্ত কল্পনার থেকে মুক্ত হয়ে অকল্পনীয় হতে হয়; সমস্ত অন্ধকার ও আলোকের থেকে মুক্ত হয়ে মহাশূন্য হতে হয়।

তবেই সেই পরাশূন্যের দর্শন লাভ হয়, ব্রহ্মলাভ হয়, আমাদের সর্বকালের একমাত্র জননীর সাখ্যাত প্রাপ্তি হয়। ... আর একবার তা হয়ে গেলে, ওই যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন, তেমন সমস্ত বুঝে যাই আমরা। আর কিছু বোঝা বাকি থাকেনা।

তখন আর আমরা বলিনা যে আমার ভক্তি, আমার জ্ঞান, আমার বৈরাগ্য, আমার বিচার, আমার বিশ্বাস, আমার শ্রদ্ধা, আমার মমতা... কিচ্ছু বলতে পারিনা। সাধক রামপ্রসাদ যেমন বলেছিলেন, 'আমার আমার করতে লাগে লাজ', তেমন হয়ে যায়। তখন বলতে ইচ্ছা হয়, মিরার মত, 'তুম ভাই সরবর, মে ভাই মাছিয়া'। অর্থাৎ তখন বলতে ইচ্ছা হয় যে, আমার বিশ্বাস ততখানিই, যতখানি তুমি দিয়েছ; আমার ভক্তি, সেও তোমার দান; আমার জ্ঞান, সেও তোমার কৃপা; আমাকে যেই চেতনা দিলে, তাও তোমারই প্রেম।

তখন আর ভক্তি থাকেনা, তখন প্রেম হয়ে যায়। প্রেম আর ভক্তির ভেদ কি? প্রেমে কনো দুই-এর অস্তিত্ব থাকেনা, সমস্ত কিছু একাকার হয়ে যায়। এক তুমি আছো, আর কনো কিছু নেই। তুমিই আছো, আমি তো না কনোদিন ছিলাম, আর না কনোদিন সম্ভব। এই আমি যে এক

অজ্ঞানতার থেকে জাত, কল্পনার বিকাশ, যা সর্ব্বৈব ভাবে মিথ্যা। এক তুমিই সত্য, আর দ্বিতীয় কনো সত্য সম্ভবই নয়। এক তোমারই অস্তিত্ব সম্ভব, আর দ্বিতীয় কনো অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

মালিক নেই, তো কনো কোম্পানিও নেই, ম্যানেজারও নেই। তাই এক মালিকই সত্য। এক মালিকই অস্তিত্ব, বাকি সমস্তই মালিকের ধারক, বাকি সকলেই নিজেকে নিজেকে মালিক মনে করে অভিনয়ে মত্ত, কিন্তু কাক যতই ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে নিক, সে ময়ূর হয়ে যায়না। তেমনই তুমিই ছিলে, তুমিই আছো, আর এক ও একমাত্র তুমিই থাকবে।... একবার স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে, সমাধি থেকে প্রত্যাবর্তন করলে, এই ভাবই থাকে, যেখানে কনো 'আমি' থাকেনা, আর এই ভাবকে বলা হয়, সমর্পণ।

আর পুত্রী, এই চরমে উন্নীত হবার ক্ষেত্রে বাঁধা কি কি? বাঁধা হলেন কল্পনা, কল্পনার থেকে উদ্ভূত চিন্তা ও ইচ্ছা, এবং এই সমস্ত কল্পনা ইচ্ছা ও চিন্তার ধারক অর্থাৎ অহংকার। আর তাই সাধক যদি এই চার শত্রুকে, অর্থাৎ অহংকার বা আমিত্ব, কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার দমন করতে পারেন, তবে অনায়সেই ব্রহ্মময়ীর সম্মুখে উপস্থিত হতে সক্ষম। আর কৃতান্ত এই অন্তিম সাধনার কথাই বলেছে। প্রাথমিক সাধনার কথা তো মহাভারতে ব্যাস, এবং মার্কণ্ড মহাপুরাণে মার্কণ্ড বলেইছেন। বিচার করার উপায় সম্বন্ধে পিপলাদ উপনিষদে বলেছেন, অন্তিম গন্তব্য সম্বন্ধে শঙ্কর বলে গেছেন। তাই সেই সকল কিছুর সম্বন্ধে পুনরায় বলার কেন প্রয়োজন! তাঁদের ব্যাখ্যার বিস্তার করলেই সেই কাজ হয়ে যায়। কিন্তু যেই সামান্য কথা বলা ছিলনা, তাই বলার জন্য কৃতান্ত"।

দিব্যশ্রী মাঝে বাঁধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু মা, এই ভাবের চরমে উন্নীত হওয়া যে, প্রায় অসম্ভব, এমনই বোধ হচ্ছে শুনে। ... আর কি কনো দ্বিতীয় মার্গ নেই?"

ব্রহ্মসনাতন মৃদু হেসে বললেন, "আছে তো। ... আর সত্য বলতে, আমি স্বয়ং, মার্কণ্ড, রামকৃষ্ণ ঠাকুর, সকলেই সেই পথেই চলে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। ... তবে, আমাদের চলার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল, আর বিশেষত্বটি এই যে, আমরা কেউ সেটিকে মার্গ জেনে, সেই মার্গে

চলিনি। উপরন্তু, আমরা সকলেই সেই পথে চলে, তাঁকে লাভ করে, তবে জেনেছি যে এমন একটি মার্গও আছে। আর আরো একটি গোপন কথা কি জানো পুত্রী! আমরা মার্গ বলে সেটিকে জানতাম না, তাই তাঁর কাছে যেতে পেরেছি।

মার্গটি হলো মাতৃত্ব। পুত্রী, তিনি জগন্মাতা। না, তিনি পিতা তো কিছুতেই নন, কারণ তাঁর স্বভাব পিতার সাথে মেলে না। তাঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি, তাঁর স্নেহ করার পদ্ধতি, তাঁর আশকারা দেবার পদ্ধতি, তাঁর প্রেম ও মমতা প্রসারের ধারা, আর তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাব, এটি কনোটিই পিতার সাথে মেলে না, এক ও একমাত্র শ্রেষ্ঠ সম্ভব মাতার সাথে মেলে।

তিনি সমস্ত রূপেই মা। নিয়তি বেশেও সর্বসকলের একমাত্র জননী; মহাকালী বেশেও তিনি সর্বসকলের দিবারাত্র দেখভাল করা কালনিয়ন্তা রূপে জননী, আর প্রকৃতি বেশেও তিনি সর্বক্ষণ সকলকে স্নেহ প্রদানে জননী।

হ্যাঁ, তিনি পিতা তো ননই, কেবল ও কেবল মাতা। পিতার পুত্র সন্তান চাই, পুত্রীসন্তান হলে মুখ ফিরিয়ে নেন; গৌর বর্ণের সন্তান চান, শ্যাম বর্ণের হলে মুখ ফিরিয়ে নেন; কিন্তু মাতা! ... মাতা যে সাদা কালো, পুত্র কন্যা, কনো কিছুই দেখেন না। যে যেরকমই হন না কেন, তিনি তাঁর জননী, আর তিনি তাঁকে স্তনদান করেন।

পিতার নেশামুক্ত সন্তান চাই, বাধ্য সন্তান চাই, তাঁর ইচ্ছামত চলা সন্তান চাই। কিন্তু মাতা! নেশা করেছে বলে পিতা সন্তানকে ভাত দিতে না বললেও, মাতা লুকিয়ে লুকিয়ে ভাত দেন, আর বলেন দেখিস বাবা রাগারাগি করে, তারপরেও ওইসব ছাইপাঁশ কেন গিলিস! সন্তান অবাধ্য হলে, পিতা বলেন বাড়ি থেকে বার করে দেব, মাতা বলেন যা আমি তোর সাথে কথা বলবো না, কিন্তু বাড়ি থেকে বার করে দেবার কথা মাতা মুখেও আনতে পারেন না।

পিতা যদি বাড়ি থেকে বার করেও দেয় সন্তানকে, মাতা ঠিক সন্তানের দেখভাল করতে থাকেন। কারুকে না কারুকে বলে, সন্তানের কাছে আহারের সামগ্রী দিতে থাকেন। ছেলে যখন বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যায়, মা অনেক ধরনের রান্না করে ছেলের সাথে দিয়ে দেয়। বাবা বলেন, কত

খাবে একা! এত কিছু কেন দিচ্ছ! ... মা ছেলের থেকে লুকিয়ে স্বামীকে বলেন। সব বন্ধুরা ভাগ বসাবে। সবাইকে দিয়ে তো আমার বাবু খেতেই পাবে না, তাই বেশি করে দিলাম।

সংসার দুর্বিপাকে পরলে, বাবা সন্তানকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিতেও পিছুপা হননা, কিন্তু মাতা! ... মাতা নিজে বেশ্যা হয়ে যান, নিজেকে নিজে বিক্রি করে দেন, তাও সন্তানের গায়ে একটি আঁচও পরতে দেন না। যদি দেখেন যে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, আত্মহত্যাই একমাত্র উপায়, তবে আগে নিজের সন্তানকে হত্যা করেন, তারপরে নিজেকে হত্যা করেন, কারণ তিনি জানেন, তাঁকে ছাড়া তাঁর সন্তান একদণ্ডও বাঁচতে পারবেন না।

জগদম্বার সমস্ত স্বভাব ঠিক এমনই। তিনিই সত্য, সমস্ত সন্তান তাঁর স্বেচ্ছায়, তাঁকে ত্যাগ করে স্বয়ম্ভু হয়েছেন, তাঁকে ভুলে রয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই একদণ্ডও সন্তানদের থেকে পৃথক থাকেন না। নিয়িতি বেশে, কালী বেশে, প্রকৃতি বেশে, নিরন্তর সেবা করে চলেন প্রতিটি সন্তানের। নিরন্তর মার্গদর্শন করতে থাকেন।

সেই সমস্ত মার্গদর্শনের পরেও, মাতার কথা কারুর মনে পরে না, সকলে নিজেদের অহমকে প্রতিষ্ঠিত করতেই ব্যস্ত। তাহলেও তিনি মাতা। তাই সেই অহমকে প্রতিষ্ঠা করারই মার্গদর্শন করতে থাকেন, আর বলেন যদি এই করেই তুই সুখী, তাহলে তোর মা-ও এই ভাবেই সুখী। সন্তানের সুখেই মাতা সুখী।

বিরক্ত হয় তাঁর সন্তানেরা, কারণ তাঁদের কল্পনাকে প্রকৃতি, সময় বা নিয়তি কেউ মান্যতা প্রদান করেনা। গালমন্দ করে সন্তানরা তাঁদের মাতাকে, তিরস্কার করতেও ছাড়েনা, অপমান তো করেই। কিন্তু মা যে তিনি, শত তিরস্কার, শত অপমান, শত গালমন্দ হজম করে নেন, কিন্তু বলতে ছাড়েন না যে, বাছা, তোমার একার কল্পনাতে তুমি প্রতিষ্ঠা পাবেনা। যখন তোমার কল্পনার সাথে জড়িত সকলের কল্পনার সাথে তোমার কল্পনাকে মিলিয়ে নিতে পারবে, তখনই তোমার কল্পনা ফলিভুত হবে, আর তুমি প্রতিষ্ঠা পাবে।

প্রতিষ্ঠা লাভ করলে, সন্তান অহংকারে বশীভূত হবে, আর অহংকারে বশীভূত হলে, যেই মাতাকে এখন ভুলে রয়েছেন, সেই মাতার থেকে আরো দূরে চলে যাবেন। কিন্তু মাতা তিনি, তাই তো সন্তান সেই অহংকার করেই আনন্দ পাচ্ছে, তাই মাতাও সেই মার্গই তাঁকে দেখাচ্ছেন। তাঁর নিজের কিচ্ছু চাওয়াপাওয়া নেই। হ্যাঁ, দিনান্তে সকলে তাঁর সন্তান হয়েও, তাঁর ক্রোড় খালি, তাই বেদনা অবশ্যই আছে। কিন্তু সন্তান সুখে থাকছে, তাই মাতাও সন্তানের সুখে সুখী বলে মানিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে।

পুত্রী, ইনি কখনোই পিতা হতে পারেন না। পিতা নিজের সুখের জন্য সন্তানকে রেসের মাঠের ঘোড়াও করে দিতে পিছুপা হননা। অন্যদিকে মাতা সন্তানের সুখের জন্য নিজেকে ঘোড়া করে রেসের মাঠে স্বয়ং দৌড়াতেও ছাড়েন না। ... আমাদের জগদম্বা ঠিক এমনই। জন্ম জন্মের মা তিনি। নিজের সন্তানদের মার্গদর্শন প্রদানের জন্যই, স্ত্রীদের জননী করেন তিনি, তাঁদের গর্ভবতী করেন তিনি, আর তাঁদের মাতৃত্বের সুখ প্রদান করে, তাঁরই সন্তানদের তাঁদের ক্রোড়ে রেখে দেন, ঠিক যেমন কৃতিকাদের কাছে দেবী পার্বতী স্কন্ধকে রেখে দিয়েছিলেন।

তাই জননী এক ও একমাত্র তিনি। অন্য সমস্ত জননীও আমাদের জননী, কারণ তাঁর সন্তানকে তাঁরা ধারণ করে, আমাদের পালন করেন সেই জননীরা। কিন্তু আমাদের সকলের প্রকৃত জননী? এক ও একমাত্র ব্রহ্মময়ী, যিনিই কারণবেশে নিয়তি, সূক্ষ্ম বেশে কালী, আর স্থূল বেশে প্রকৃতি। ...

পুত্রী, যখন এই ভাব ঠিক ঠিক অন্তরে বসবে, আর নিজের সমস্ত ভূত অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ ও উর্জ্জা, সমস্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সমস্ত ত্রিগুণ, বিচার, বিবেক সার্বিক ভাবে এই সত্যকেই মানবে, বিনা কনো নাট্যে, বিনা কনো প্ররোচনায়, বিনা কনো প্রকার অছিলায়, বিনা কনো প্রকার শর্তে, বিনা কনো প্রকার প্রমাণ করার প্রয়াসে, তখনই ব্রহ্মাণু তাঁর আভাস লাভ করেন, কারণ তখন সমস্ত বাঁধা স্বতঃই ব্রহ্মাণুর থেকে সরে যায়।

তখন ব্রহ্মাণু ঠিক ঠিক অনুভব করেন যে সমস্ত জীব, সমস্ত অজীব তাঁর জননীই, তাঁর গুরুই, কারণ তাঁর মা যে অনন্ত, তাঁর মা-ই যে সমস্ত কিছু হয়ে উপস্থিত রয়েছেন, তাঁকে স্নেহদানের জন্য। আর যখন এই অনুভব হয় ব্রহ্মাণুর, তখন গরু, ছাগল, হাতি, কুমির, মাছি, মৌমাছি, ঝিনুক, শামুক, কাক, চিল, অজগর, বিছা, এমনকি পাথর, উদ্ভিদ, বট, দূর্বা, সমস্ত কিছুই তাঁর গুরু হয়ে ওঠে, কারণ সমস্ত কিছুই যে তাঁর মা।

ছোট বড়, গরিব বড়লোক, অন্যসম্প্রদায়ের মানুষ, আদিবাসী, বর্বর, উন্মাদ, অভয়লিঙ্গ, সকলে তাঁর গুরু হয়ে ওঠে, সম্যক প্রকৃতি তাঁর গুরু হয়ে ওঠে, কারণ তাঁর জননীই যে সর্বস্ব কিছু হয়ে রয়েছেন। তাই সকলের সমস্ত কথার থেকে তিনি শেখেন, সমস্ত কিছুর থেকে তিনি স্নেহ লাভ করেন। সকলেই তাঁর জ্যেষ্ঠ। প্রতিটি কালের মুহূর্ত থেকে তিনি শেখেন, কারণ তাঁর জননী যে স্বয়ং মহাকালী। প্রতিটি পরিস্থিতি থেকে তিনি শেখেন, কারণ তিনি জানেন যে নিয়তিই সমস্ত পরিস্থিতির কারক, আর নিয়তি যে তাঁর জননী, ব্রহ্মময়ী মা।

আর সেই শিক্ষা পেতে পেতে, সে কখন যে সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠে, আর কখন যে ঈশ্বরীর সম্মুখে পৌঁছে গিয়ে তাঁর সমাধি হয়ে যায়, সে নিজেই জানতে পারেনা। সে কি সাধনা করেনা! সে ভয়ানক সাধনা করে, সমস্ত জীব, অজীবের থেকে শিক্ষা গ্রহণের সাধনা, প্রতি পলকে শিক্ষা গ্রহণের কঠিন সাধনা। কিন্তু তাও তিনি সাধনা করেন না। কেন? কারণ তিনি তো কেবল নিজের মাতার প্রেমের আস্বাদন করতে সমস্ত কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন, শিক্ষা গ্রহণ করে পণ্ডিত হবেন বলে নয়।

বুঝতে পারছো পুত্রী, শিক্ষালাভ তাঁর কাছে নিজের জননীর প্রেম আস্বাদন হয়, অন্য কনো ভাব, অর্থাৎ পণ্ডিত হবার ভাব, জ্ঞানী হবার ভাব, কনো কিছু তাঁর অন্তরে থাকেই না। সত্য বলতে এই যে, তাঁকে অন্যরা জ্ঞানী বললে, তবে তিনি জানতে পারেন যে তিনি জ্ঞানী হয়েছেন, তার পূর্বে তিনি জানতেও পারেন না যে তিনি জ্ঞানী হয়েছেন, কারণ তিনি যে জগন্মাতার স্মেহ ও প্রেম আস্বাদনেই মত্ত ছিলেন।

অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণই উদ্দেশ্য নয়, আত্মকে ভুলে যাওয়াই উদ্দেশ্য। জ্ঞানলাভ সাধনা নয়, ভক্তিলাভও সাধনা নয়, পুণ্যলাভও সাধনা নয়, কনো কিছুই সাধনা নয়। সাধনা একমাত্র নিজেকে ভুলে যাওয়াতে। আর যিনি জগন্মাতাকে নিজের প্রকৃত মাতা, আর সকল জীব, সকল অজীবকে তাঁরই প্রতিচ্ছবি, প্রতিনিধি জ্ঞানে, সমস্ত কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন আর মাতার প্রেমকে আস্বাদন করতে থাকেন, তিনি সেই প্রেম আস্বাদনের নেশায়, কখন যে নিজের পঞ্চভূতের খেয়াল রাখতে ভুলে যান, নিজের ত্রিগুণের খেয়াল রাখতে ভুলে যান, সেটিই ভুলে যান, কারণ তিনি যে নিজের নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছেন।

তাই এই হলো সেই সাধন, যার দ্বারা সমস্ত আমির নাশ হয়, আর তা স্বতঃই হয়, কনো প্রয়াস ছাড়াই হয়, আর সেই সাধনাই আমাকে দিয়ে করিয়েছেন মাতা, রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে দিয়ে করিয়েছেন, মার্কণ্ডকে দিয়ে করিয়েছেন, আর সহজ উদ্ধারের মার্গ প্রশস্ত করে রেখেছেন সমাজে।

আর পুত্রী, এই যে কৃতান্তে কর্তার অন্ত দেখো, এই হলো সেই কর্তার অন্ত হবার উপায়। যখন সমস্ত কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তাই দূর হয়ে যায় অন্তর থেকে, তখন স্বতঃই কর্তার নাশ হয়ে যায়, আর সেই ক্ষণের খবরও থাকেনা আমাদের কাছে।

পুত্রী, এই কালে আমরা কনো কল্পনা করতে পারিনা, আর সত্য বলতে কল্পনা করার প্রয়োজনও বোধ করিনা, কারণ আমাদের কাছে একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে যে, আমাদের জননী সর্বক্ষণ আমাদের খেয়াল রাখেন, রাখছেন, মার্গ দর্শন প্রদান করেন সকলের চরণ দিয়ে, সকলের বচন দিয়ে, সকলের কর্ম দিয়ে, স্বয়ং সময়কে সম্মুখে স্থাপন করে, পরিস্থিতি নির্মাণ করে।

তাই কল্পনার প্রয়োজনই বোধ হয়না, কেবলই সময়কে, পরিস্থিতিকে, এবং প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করতে থাকি, মার্গদর্শন লাভ করতে থাকি, আর তাঁর শাবকের ন্যায় জীবনযাপন করতে থাকি। প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে আমাদের কাছে যে, আমাদের ইচ্ছা করার কনো মানেই হয়না, কারণ আমরা

আমাদের ভালো যা বুঝি, তার থেকে ঢের ভালো বোঝেন আমাদের মা, আর তিনি সর্বক্ষণ তাই সম্মুখে রাখছেন, যা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর তাই এটি লাভের ইচ্ছা, ওটি যাতে না হারিয়ে যায় সেই ইচ্ছা, কনোরূপ ইচ্ছার কনো প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকেনা।

আর অন্তে চিন্তা! চিন্তা কি জন্য করা হয়? আমার কিসে ভালো, কিসে মন্দ, কি করলে আমার ভালো হবে, আমার প্রিয়জনদের ভালো হবে, কি করলে আমার বা আমার প্রিয়জনদের মন্দ হবে, এই নিয়েই তো চিন্তা! ... ওই যে বললাম, আমাদের জননী আমাদের কিসে ভালো, কিসে মন্দ, সেই বিষয়ে আমাদের থেকে ঢের ভালো বোঝেন, জানেন, আর নিরন্তর তা আমাদের সম্মুখে আনতে থাকেন। তাই চিন্তার ও প্রয়োজন নেই।

আর পরে রইল অহং বা আমিত্বের বোধ, তাই তো! ... পুত্রী, এই আমিত্বের বোধ তো জন্মই নিয়েছিল আমাদের কল্পনার কারণে। কল্পনা না থাকলে যেই ব্রহ্মের ছেদনই সম্ভব নয়, তাঁর অণুর ভান কি করে আসবে আমাদের কাছে! ... কিন্তু যখন কল্পনাই নেই, যখন কল্পনার দুই হস্তস্বরূপ, চিন্তা ও ইচ্ছাই নেই, তখন আর অহং-এর ভানই বা কি করে থাকতে পারে।

সম্যক ভাবে এই ভাবই বিনষ্ট হয়ে যায় যে আমি কর্তা, আমি কিছু করি, আমাকে কিছু করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা স্পষ্ট বুঝে গেছি যে, না তো কনো কালে আমরা কর্তা ছিলাম, আর না কর্তা হওয়া আমাদের পক্ষে বা কারুর পক্ষে সম্ভব। কর্তা ভাব স্বয়ংই একটি মহাভ্রম। আর আমাদের কনো দ্বন্ধ থাকেনা এই বিষয়ে, কারণ আমরা যে আমাদের পৃথক অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে ফেলেছি। এক আমাদের জননী আছেন, আর কেউ নেই, আর কিচ্ছু নেই, আর কিচ্ছু সম্ভবই নয়, আর সমস্ত কিছুই ভ্রম, সমস্ত কিছুই কল্পনা, অলিক কল্পনা, অসত্যের বিস্তার।

আর এই কথা বলার জন্যই কৃতান্ত। কৃতান্ততে কি দেখবে তুমি? এই দেখবে যে বলা হয়েছে এক মাতা সর্বাম্বাই কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার নাশ করতে সক্ষম, আর তা করার জন্য, তাঁকে কিচ্ছুটি করতে হয়না। তাঁর সম্মুখে সম্যক ভাবে কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা দণ্ডায়মান হলেই, তাঁরা চিরতরে ভস্ম হয়ে যায়। কেন এমন বলা হলো?

কারণ আমরা যে কর্তা নই। আমরা নিজের ইচ্ছা করে ইচ্ছাকে নষ্ট করতে পারি কি করে? কল্পনার নাশ করবো আমরা, সেও যে এক কল্পনা, তবে কল্পনার নাশ হলো কি করে? চিন্তার নাশও এক চিন্তা, তাহলে চিন্তার নাশ হলো কি করে? আমরা কিচ্ছু করতে পারিনা, আমরা কেবল সমর্পণ করতে পারি, আমাদের সেই মায়ের কাছে সমর্পণ করতে পারি, যিনি একমাত্র অস্তিত্ব, যিনি সর্বক্ষণ নিয়তি, কালী, ও প্রকৃতি বেশে আমাদের দেখভাল করে চলেছেন, অনলস ভাবে, নিরন্তর ভাবে।

তাই আমরা কেবলই নিজেদেরকে সমর্পিত করতে পারি, মা সর্বস্ব হয়ে উঠতে পারি। আর যদি তা হতে পারি, যদি এই মা সর্বস্ব হওয়ার মধ্যে কনো প্রকার ছলনা, নিয়ম পালন, বা কনো কিছু বিধিবিধান না থাকে, শুধুই প্রেম থাকে, তবে স্বতঃই আমরা কালের থেকে, প্রকৃতির থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে করে, একসময়ে আমাদের কর্তার থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারি, আর যাই তেমন হই, তাই, কল্পনা, চিন্তা আর ইচ্ছাকে পরমসত্যের সম্মুখে স্থিত করতে পারি। আর যেহেতু তাঁরা ভ্রম মাত্র, তাই সত্যের দর্শনমাত্রেই তাঁরা ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আর রইল তোমার পরবর্তী কথা? বনবাসে যাওয়া কি তবে আবশ্যক? পুত্রী, মা কি বনে থাকেন, শহরে থাকেন না বা গ্রামে থাকেন না, বা অট্টালিকায় থাকেন না, বা আকাশে থাকেননা, মাটির তলায় থাকেন না, এমন কনো ব্যাপার আছে? মা যে সর্বত্রই মা, মা যে সর্বক্ষণই মা, মা যে সমস্ত অবস্থাতেই মা।

তাই প্রয়োজন নেই গৃহত্যাগের, প্রয়োজন নেই বনবাসের। প্রয়োজন এই বিশ্বাসের যে, জগন্মাতাই আমাদের একমাত্র মা, আমাদের জন্মজন্মান্তরের মা। আর প্রয়োজন বৈরাগ্যের, অর্থাৎ সম্মুখে যা আসবে, তাই সাগ্রহে গ্রহণ করা। কেন? কারণ আমাদের মায়ের কনো অণু হয়না, সমস্ত অণু, যারা নিজেদের অণু বলছেন, ব্রহ্মাণু বলছেন, তাঁরা যে ব্রহ্মাণু, সেটি তাঁদের ভ্রম, বাস্তবে তাঁরা ব্রহ্ম স্বয়ং, অর্থাৎ আমাদের মা স্বয়ং।

আর তিনি সর্বক্ষণ সমস্ত অণুর রূপে, কালের রূপে, আমাদের যা প্রয়োজন তা প্রদান করেই চলেছেন, যা করা আবশ্যক সেই পরিস্থিতি প্রদান করেই চলেছেন। তাই সমস্ত কিছুই আমাদের মায়ের নির্দেশ, সমস্ত কিছুই আমাদের মায়ের মার্গদর্শন এই স্পষ্ট ধারণা নিয়ে, বৈরাগ্য ধারণ করে, যা সম্মুখে এসেছে, বিনা বিচারে তা গ্রহণ করা আবশ্যক, আর যা সম্মুখে আসেনি, তা বিনা বিচারে বর্জন করা উচিত।

বিনা বিচারে কেন? কারণ বিচার আবশ্যক হলে, বিচারই প্রদান করতেন আমাদের মা। যখন বিচার করে, আমরা মীমাংসায় উপস্থিত হতে সক্ষম, তখন তিনিই আমাদের অন্তরে বিচার প্রদান করেন। এঁর অন্যথা নিজেকে কর্তা সাজিয়ে বিচার করতে যাওয়ার অর্থ, আমরা আমাদের সেই মা, যিনি আমাদের উদ্ধারের জন্য, যিনি আমাদের ভ্রমের নাশের জন্য, যিনি আমাদের প্রেমদানের জন্য নিরন্তর অনলস পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁর সেই পরিশ্রমকেই আমরা অপমান করছি।

তাই পুত্রী, সংসার ত্যাগের কনো আবশ্যকতা নেই। যা প্রয়োজন তা হলো, সম্মুখে যা আসছে তাই গ্রহণ করা, পরিস্থিতি যেই যোগদান আমাদেরকে প্রদান করতে বলছে, সেই যোগদান প্রদান করা। যদি সাধক এটুকু করে, নিজের মাতাকে স্মরণ রেখে, অনায়সে তাঁর সাধনা সপ্তমে উঠবে, এবং অনায়সে তাঁর সাধনা পূর্ণ হয়ে, তাঁকে মোক্ষ প্রদানও করবে। এই কথা বলার জন্যই কৃতান্ত পুত্রী”।

অনুশাসন

কৃতান্তিক শাসনের খুঁটিনাটি

প্রশ্নসূচিকা

মহাভারতের কথন ধারণ করে, দিব্যশ্রী বললেন, “মা, এ তো এক বিকট সমস্যা! আর্যরা যে দিবারাত্র মিথ্যা পাঠ করিয়ে গেছে আমাদেরকে! সেই মিথ্যাকে সত্য মানা মানুষদের আমি সত্য প্রদান করবো কি করে? যাদের পিতামাতা আছেন, তাঁদের কাছে এই সমস্ত সত্য প্রদান অসম্ভব। তাই, ধরে নেওয়া যাক, যেমন আপনি বলেছেন, সেই অনুসারে অনাথ শিশুদের সেই শিক্ষা প্রদান করা গেল। কিন্তু তারপরেও যখন সেই অনাথরা সমাজের মধ্যে নিজেদের কদম রাখবে, সমাজকে তো সেই মিথ্যাগুলিকেই সত্য জ্ঞান করতে দেখতে থাকবে! তাহলে তাঁদেরকে এই সত্যের পথে রাখবো কি করে?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, সমাজে সত্য স্থাপনা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়। একটি কথা সমাজে অনেকে বলতে থাকলে, সমাজ সেই কথাকেই সত্য কথা ধরে নেয়। এতাবৎকাল অসত্যকে সেই ভাবেই মানুষ সত্য জ্ঞান করে এসেছে। একই ভাবে, এবার সত্যকে সমাজে সত্য রূপে স্থাপিত করে দেবে।

আর তা করার জন্য, প্রথমশ্রেণীর দ্বিতীয়শ্রেণীর, এবং এমন ভাবে বেশ কিছু শ্রেণীর অনাথ শিশুদের, যাদেরকে তুমি সত্য পাঠ প্রদান করবে, বা তোমার পরেও তোমার উত্তরসূরি সেই

সত্য পাঠ প্রদান করবেন, তাঁদেরকে একটি নূতন সমাজ স্থাপন করে, সেই সমাজেই স্থাপিত রাখবে, যাতে সেই সমাজের বাইরে তাঁদেরকে গিয়ে জীবনযাপন করতে না হয়।

ধরে নাও, কাহিনী অবলম্বনে নাটক প্রদর্শন করে, তাঁদের অর্থআয় সম্ভব হলো, এবং ক্ষেতি করে, তাঁদের উদরপূর্তি ঘটলো। যখন এই সত্যজ্ঞাত অনাথ সন্তানের সংখ্যা বহু হয়ে যাবে, তখন যখন এঁরা সমাজে নিজেদের কদম রাখবে, তখন কিন্তু আর তাঁরা একজন নন সত্যকে সত্য বলার ক্ষেত্রে। তখন সত্যকে সত্য বলার জন্য অনেকে উপস্থিত থাকবে। আর তাই সমাজ তাঁদের কথনকে সত্য মানতে কিছুদিনের মধ্যেই বাধ্য হবে।

পুত্রী, রাতারাতি ফললাভের প্রয়াসের কারণেই মানুষ বিপ্লব করে, বিদ্রোহ করে। কিন্তু যদি এই রাতারাতি ফললাভের লালসা না রেখে, জীবনমৃত্যুকে কেবলই একটি পৃষ্ঠা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া জেনে অগ্রসর হয়, তখন মানুষের স্বভাবকে মেনেই সেই কর্ম করা যায়, এবং সেই ক্ষেত্রে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের কনো প্রয়োজনই নেই।

পুত্রী, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের কারণে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীর ইতিহাসের পাতায় নাম ওঠে। এবার তুমি বলো আমায়, কোনটি আবশ্যক, সমাজে সত্য স্থাপিত হওয়াটা, নাকি ইতিহাসের পাতায় কিছু নশ্বর শরীরের নাম লিখে রাখাটা! পুত্রী, ধর তোমার ইতিহাসের পাতায় এমন নাম লেখা হলো, কারণ তুমি বিপ্লব করেছ, আর তুমি এই দেহ ত্যাগ করে, অন্য দেহ ধারণ করে, সেই ইতিহাস নিজেই পাঠ করছো? সেই ইতিহাসে তোমারই অন্য শরীরের কীর্তি পাঠ করে কি তোমার মধ্যে গর্বের অনুভব আসবে!

যদি এই সমস্ত কিছুই নশ্বর হয়, তবে এই ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম স্থাপন করে কৃতিত্ব অর্জনের প্রয়াস কেন পুত্রী? কেন না এমন ভাবে সেই কাজকেই করা যায়, যাতে ওই যে তোমরা বলো, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না... তেমন করা যায়! ... পুত্রী, মানুষের স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে কর্ম করো। কর্ম তুমি করো, আর কর্মের পরিণামকে প্রকাশ করার অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ সময়ের হাতে ছেড়ে দাও।

পুত্রী, সময় স্বয়ং আমি। তোমার কর্ম যদি আমার সমস্ত সন্তানের কল্যাণের উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহলে আমি স্বয়ং সময় ও প্রকৃতির বেশে, সেই সমস্ত কর্মকে সকলের মধ্যে স্থাপন করে দেব। ঠিক তেমনই ভাবে পুত্রী, রাতারাতি পরিবর্তন আনার প্রয়াস করে, তুমি সত্যের সঙ্গ কি করে দিচ্ছ! ... সত্য তো এই যে পরিবর্তন প্রতিমুহূর্তে হয়, কিন্তু কখনোই তা রাতারাতি প্রকাশিত হয়না।

তাই সত্যকে সত্য মেনেই প্রকাশিত হতে দাও। ... অনাথ সত্যজ্ঞ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে মন দাও, তবে তা কারুর উপর বলপ্রয়োগ করে বা বিদ্রোহ করে নয়। একটি একটি করে অনাথ শিশুকে মাতৃত্ব প্রদান করে, তাঁকে সত্যের সাথে পরিচয় করাও। আর যখন এই অনাথদের সংখ্যা এমনই হয়ে যাবে যে, সমাজের একটি অংশরূপে তাঁরা নিজেদের স্থাপিত করতে পারবে, তখন তাঁদেরকে সমাজে স্থাপিত করে দাও। ...

অনেকে একই কথাকে সত্য মানার কারণে সমাজ তাঁদের কথা শুনতে থাকবে, এবং কিছুকাল পরে তাকে সত্য বলে মানতেও থাকবে, আর এমন ভাবেই বিদ্রোহ এবং বিপ্লব না করেই, সত্যকে স্থাপিত করা সম্ভব হবে সমাজে”।

দিব্যশ্রী বললেন, “কিন্তু মা, সেই অতিসংখ্যার অনাথ সত্যজ্ঞরাও বা কি ভাবে সেই মানুষদের বোঝাবে যে সতীর কথা মার্কণ্ডেরই কথা, বা মহাভারতের কথা বেদব্যাসের নিজের জীবনী! ... তাঁরা যে এই সমস্ত কিছু সম্বন্ধে অন্য ধারণা ইতিমধ্যেই নিজেদের মনে স্থাপিত করে রেখেছে!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, এমন ধারণা রাখছো কেন যে, তোমার ছাত্রছাত্রীরা জনে জনে গিয়ে সকলের ভুল ভাঙাতে থাকবে! ... কেন করবে, এমন কাজ? পুত্রী, পূর্বেও জনে জনে প্রচারের কাজ করেছেন অনেকে। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু করেছেন, বিবেকানন্দ করেছেন, আর্যরা করেছেন, আরো অনেকে করেছেন। কিন্তু লাভ হয়েছে কনো কিছুতে?

পুত্রী, এই প্রচারের ধারাই জগতে আজও প্রসিদ্ধ। এই একই ধারা মেনে, আজকেও যাকে তোমরা বলো মার্কেটিং ও বিজ্ঞাপন, সেই প্রথা চলছে। এতে প্রভাব বিস্তার হয়। হয়না তেমন

নয়। কিন্তু তা অত্যন্ত সাময়িক। স্বল্প কিছু সময়ের জন্য তা বিস্তার পায়, আর যখনই সেই প্রচারের উদ্যোক্তা কালের নিয়মে অপসারিত হয়, তৎক্ষণাৎ, এই প্রচার স্তব্ধ হয়ে যায়, আবার যে কে সেই। তাই পুত্রী, এই প্রচারের পুরানো পন্থার পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক।

পুত্রী, নতুন ধারার প্রচারের শুরু করো। প্রচার না করাও একটি প্রচার। পুত্রী, দিদিমা বা ঠাকুমা যেই বাক্সতে কারুকে হাত দিতে দেননা, সকল নাতিনাতনির সেই বাক্সের দিকেই নজর থাকে। দিদিমা বা ঠাকুমা কি সেই বাক্সের প্রচার করলেন? না, তিনি প্রচার করলেন না, বরং তিনিই সঠিক ভাবে প্রচারটা করলেন, কারণ তিনি সকল নাতিনাতনির অন্তরে সেই বাক্সকে খোলার প্রবণতা ও আগ্রহকে জাগ্রত করলেন।

ঠিক একই ভাবে পুত্রী, তোমার ছাত্রছাত্রীরা যখন বহুসংখ্যায় সমাজে বিরাজমান হবে, অথচ তাঁরা কনো প্রচার করবে না, তখন সমস্ত সমাজের নজরই তোমার ছাত্রছাত্রীদের জীবনদর্শনে পরিণত হয়ে যাবে। ... আর সেটিই হলো প্রচার।

আর কেবল এই নয়, কারুকে ভুল বা মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করার প্রবণতাও এক মুর্খামি, কারণ তা শত্রুতার নির্মাণ করে। যখন তোমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে সমাজ পৌঁছাবে, তখন যদি তাঁরা এই বলা শুরু করে যে, আর্যরা মিথ্যা বলেছে, বা ব্রাহ্মণরা মিথ্যা বলেছে, বা আধুনিককালের বিজ্ঞান সমানে আমাদের মিথ্যা বলে চলেছে, সেই কথা সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্য করুক আর না করুক, তাঁদের এই কথন তাঁদের অসংখ্য শত্রুকে জন্ম দিয়ে দেবে।

তাই পুত্রী, সর্বদা আক্রমণের চিন্তা কেন? সর্বদা ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম তোলার প্রবণতা কেন? কেন সহজ ভাবে সহজ কাজকে সঞ্চালিত করার প্রয়াস করো না? ... পুত্রী, সত্যের বিবরণ প্রদান করো। ইতিহাসকে ব্যক্ত করো। শ্রবণকর্তা বিচার করবেন, কি সত্য আর কি অসত্য। কারুর উপর কনো ক্রীড়া করে, সেই ক্রীড়ার ফলকে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসে মানুষ কেবলই অন্যকে পরাধীন করে। না তো সে নিজে স্বাধীন থাকে, আর না অন্যকে স্বাধীনতা দেয় সে।

যখন কারুকে কেবলই সত্য ইতিহাস ব্যক্ত করবে, সত্য বিজ্ঞান ব্যক্ত করবে, সত্য দর্শন ব্যক্ত করবে, তা মানুষ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করবেনা। তারা সেই কথা শুনবেন, গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন, বিচার করবেন। আর সেই বিচারের পর, যদি তুমি সত্যই বলে থাকো, তবে অধিকাংশ বিচারশীল মানুষই বিচারের শেষে তা গ্রহণ করবে। আর সেই গ্রহণ করা, তাঁদের নিজেদের গ্রহণ করা হবে, জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবেনা।

তাঁরা স্বতন্ত্র ভাবে, নিজেরা নিজেদেরকে সত্যের সাথে যুক্ত করে নেবে। তবেই তো সত্যের বাস্তবিক বিস্তার সম্ভব হবে। তাই নয় কি? কারুকে যদি, আমি বলছি তাই মানো, এই ভাবে চাপিয়ে দাও, তাহলে সত্য স্থাপিত হয় কি করে? যেই সত্য স্থাপনের প্রক্রিয়াই পরাধীনতা প্রদান, তা সত্য কি করে হতে পারে!

তাই সত্য বলো, কারুর নিন্দা করো না। ... সকলেই স্বরূপে ব্রহ্ম, তাই সকলেরই বিচারশক্তি আছে। সকলেই বিচার করতে সক্ষম। তাঁরা বিচার করবেন, এবং স্বতঃই সত্যকে গ্রহণ করবেন। হ্যাঁ, তোমার কথা শ্রবণ করতে চাইবেন না পথমে। তাই অনাথ ছাত্রছাত্রী নির্মাণ করে, তাঁদের মাধ্যমে তোমার কথাকে একমুখ থেকে অজস্র মুখে নিয়ে চলে যাও। তাঁদের কথাও শ্রবণ যদি না করার প্রবণতা থাকে, তাই প্রচারের অনন্য একটি উপায় ধারণ করে, তা প্রচার করো। তবে তারমানে এই নয় যে, সত্যকে কারুর উপর জোর করে স্থাপিত করে, যিনি এতকাল অসত্যের কাছে পরাধীন ছিলেন, তাঁকে আজ নতুন ভাবে সত্যের কাছে পরাধীন করে দেবে"।

দিব্যশ্রী বললেন, "বেশ বুঝলাম মা এবার। ... অনবদ্য তোমার উপায়। ... তোমার উপায়ই বলে দেয় যে, মা কেমন হয়। মা সন্তানের উপর প্রভাব তো বিস্তার করে, কিন্তু সেই প্রভাব বিস্তারের মধ্যেও থাকে কেবলই কল্যাণ চিন্তা, আর সন্তানের প্রতি অপার স্নেহ। মা কখনই সন্তানের উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী হননা। ... কিন্তু মা, আমার এই ক্ষেত্রে কিছু জানার আছে।

আসল কথা এই যে, কেবল ইতিহাসেরই সত্য লুক্কায়িত করা হয়নি। সত্য দর্শনেও লুক্কায়িত করা হয়েছে, আর সত্য বিজ্ঞানেও লুক্কায়িত করা হয়েছে। ... সেই কালে আর্যরা দর্শনের নাম করে, অসত্যের বিস্তার করেছিল, আর আজকের আর্যরা বিজ্ঞানের নাম করে অসত্যের বিস্তার করে চলেছে। তাই মা, আমি তোমার থেকে সেই মিথ্যা ও সত্য দর্শনের সম্বন্ধে জানতে চাই।

আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কনো সন্তানের উপর আমি কনো প্রকার জোর প্রদান করবো না। কারুকে পরাধীন করার প্রয়াস করবো না। কারুকে বলবো না যে, কি কি মিথ্যা দর্শন বা মিথ্যা বিজ্ঞান তাঁরা জেনেছে। কারুকে সেই কথা শেখাবোও না, বলবোও না। কিন্তু মা, আমাকে ও আমার ছাত্রছাত্রীদের তো অসত্য ও সত্য দুইই জানতে হবে, তাই না!

সত্য তো জানতেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে অসত্যও। কাল এমন যেন না হয় যে, আমার ছাত্রছাত্রী আমার থেকে সত্য জেনে সমাজে গেলেন, আর সমাজে যেতে, তাঁর মুখের উপরে কিছু মানুষ বলে দিলেন, এ তো সত্য জানেই না, বাবু এই হলো সত্য। ... আর সেই অসত্যকে সত্য বলে আখ্যা দিতে আমার ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এমন যেন না হয়, তার জন্য আমাদের সত্যকে জানা যতটা আবশ্যক, অসত্যকে জানাও ততটাই আবশ্যক। ... তাই মা, আমাকে সেই দর্শনের ও বিজ্ঞানের মধ্যে আর্যরা যেই অসত্য ব্যক্ত করেছে, তার বিবরণ প্রদান করে, তার সত্যতা প্রদান করুন।... কৃপা করুন মা”।

দর্শন সত্য

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “বেশ, প্রথমেই আমি তোমাকে দর্শন সংযুক্ত যে সমস্ত অসত্য বিস্তারিত আছে, আর তাদের সত্যতা ব্যক্ত করছি শ্রবণ করো।

পুত্রী, ব্রহ্মাণ্ড অসত্যেরই প্রকাশ, কারণ সত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ করেননি, বরং সেই ব্রহ্ম যিনি সমসত্ত্ব হবার কারণে, তাঁর কনো অণু হওয়া সম্ভবই নয়, তাঁরই কিছু অসম্ভব হয়েও স্বয়ং স্বয়ংকে অণু মানেন, তাঁরা নিজেদেরকে প্রকাশিত করে স্বয়ম্ভু হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের

প্রকাশ করেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এক চরম অসত্য, যার লেশ মাত্রও সত্য নয়, অথচ, যারা নিজেদের স্বরূপ ভুলে স্বয়ম্ভু হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ করেছেন, তাঁরা যেহেতু সেই ব্রহ্মই, তাই এই ব্রহ্মাণ্ড অসত্য হয়েও সম্পূর্ণ ভাবে অসত্য নয়।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে অসত্য না হলেও, এই ব্রহ্মাণ্ড এক অলিক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়, আর সেই কল্পনার ভিত্তি হলো ভ্রম। কিসের ভ্রম? ব্রহ্মাণুদের স্বরূপ ভ্রম। সেই স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রমিত হবার কারণেই এই ব্রহ্মাণ্ড। তাই এই ব্রহ্মাণ্ড অবশ্যই বিভ্রান্ত, আর বিভ্রান্ত হবার কারণে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থাপিত সত্য একটিই আর তা হলো যন্ত্রণা।

সাদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রমিত হয়ে স্বয়ম্ভু রূপে আত্মপ্রকাশিত ব্রহ্মাণু সর্বদাই বেদনাগ্রস্ত, সদাই নিরানন্দময়, আর সদাই আনন্দের সন্ধানী। কিন্তু ভ্রমিত হবার কারণে, তাঁরা এই সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞাত যে, তাঁদের নিরানন্দের কারণ হলো তাঁদের স্বরূপ ভ্রম, আর তাই তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ করতেই থাকে, সেই আনন্দের সন্ধানের উদ্দেশ্যে, আর সমানে অধিক থেকে অধিক ভাবে নিরানন্দ অনুভব করতেই থাকে।

এর বিপরীতে, কিছু অণুর মধ্যে এই চেতনার উদয় হয়েছে যে, এই বিস্তারের ডামাডোলের কারণেই তাঁদের নিরানন্দ, আর তাই তাঁরা সংযমের পথে চালিত। পুত্রী, এই দুই, অর্থাৎ বিস্তারপ্রেমী এবং সংযমপ্রেমী, এই দুই ধারার অণুদ্বারাই এই ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্বশীল এবং গতিশীল। যারা সংযমপ্রেমী, তাঁরা সমস্ত সময়ে সংযমের অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত থাকেন, আর যারা বিস্তারপ্রেমী, তাঁরা সর্বক্ষণ এই সংযমপ্রেমীদের সংযমের অধ্যয়ন থেকে বিরত করার প্রয়াস করে।

আর এই প্রয়াসের ফলে, সংযমের প্রয়াসে ব্যর্থ হবার কারণে, সর্বক্ষণ সংযমপ্রেমীরা বিকল্পের সন্ধান করেন। আর তাই যেমন বিস্তারপ্রেমীরাও গতিশীল, তেমনই সংযমপ্রেমীরাও গতিশীল না হতে চেয়েও গতিশীল, আর এই দুই অণুর গতিশীলতার কারণে, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড গতিশীল, আর

এই গতিশীলতাই আমাদেরকে কিছুতেই মানতে দেয়না যে ব্রহ্মাণ্ড হলো এক ভ্রম, আর এই ভ্রমের থেকে আমাদের মুক্ত হওয়াই হলো জীবনের এবং ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ্য।

এই দুইপ্রকার যে অণুদের কথা বললাম, এঁদের কনো ভারসম্য থাকেনা ব্রহ্মাণ্ডে, কারণ এখনও পর্যন্ত সংযমপ্রেমীরা নিজেদের সংযমকে ধারণ করে রাখার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও ধারণা লাভ করেন নি। আর যাতে তাঁরা এই জ্ঞান ও ধারণা লাভ করেন, তার কারণেই আমি তুমি ইত্যাদি সমস্ত ঈশ্বরকটি অবতাররা বারেবারে আসি।

অপরদিকে, এই বিস্তারপ্রেমীদের দাপটই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বাধিক, কারণ তাঁরা বিস্তারের উপায় লাভ করেছে, এবং সংযমপ্রেমীদের বিরক্ত করতেও তাঁরা সফল হয়ে এসেছে এখনোপর্যন্ত। এই সংযমপ্রেমীদেরকে আমরা বলে থাকি সাধক, যারা সংযমের সাধ ধারণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা থেকে এবং ব্রহ্মাণুর ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে, জীবনমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে, ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে উঠতে ব্যস্ত ও মার্গসন্ধানী।

এঁদেরকে যারা অনুসরণ করেন, বা করার প্রয়াস করেন, তাঁদেরকে আমরা বহু ভাবে নামাঙ্কিত করি, যেমন দেব, গন্ধর্ব, পিতৃ, ইত্যাদি, যেখানে দেব হলেন এই সাধকদের রক্ষা করার ভূমিকায় স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ; গন্ধর্ব এই সাধকদের বার্তাকে সর্বসমক্ষে স্থাপনার জন্য সঙ্গীতের রচয়িতা; এবং পিতৃ এই সাধকদের অনুসরণ করার উপযোগিতা ব্যক্ত করতে ব্যস্ত থাকেন। আর সাধকরা আমার তোমার, অর্থাৎ ঈশ্বরকটি অবতারদের প্রদত্ত মার্গকে অনুসরণ করতে থাকেন।

অন্যদিকে, যারা বিস্তারপ্রেমীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন, তাঁদেরকে আমরা শয়তান বা অসুর নামে অবিহিত করি। এঁদের অনুগামীদেরও আমরা বহু নামে অবিহিত করে থাকি, যেমন যক্ষ, রক্ষ, দানব। এঁদের মধ্যে যক্ষ হলেন তাঁরা যারা এই বিস্তারপ্রেমীদের বিস্তার ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেন; রক্ষ বা রাক্ষস হলেন, সেই বিস্তারকে যারা রক্ষা করেন; এবং দানব হলেন তাঁরা যারা এই রক্ষদের নির্দেশানুসারে সাধক, দেব, গন্ধর্ব ও পিতৃদের বিরক্ত করেন।

কিন্তু এই দুই অসমসংখ্যার গোষ্ঠী, অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক সংযমপ্রেমী, এবং বিস্তরসংখ্যক বিস্তারপ্রেমীদের অন্তরালেও কিছু থাকেন। আর তিনি হলেন স্বয়ং আমাদের সকলের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম। পুত্রী, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ঠিকই, কিন্তু নিষ্ক্রিয় হলেও তিনি সক্রিয়, আর সত্য অর্থে, তাঁর ন্যায় সক্রিয় কিছুই সম্ভব নয়।

যেমন এই ধরিত্রীকে দেখে মনে হয় যে তা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু যাই ধরিত্রীর পৃষ্ঠ থেকে লম্ফ দেওয়া হয়, অমনি ধরিত্রীর সক্রিয়তাকে মাধ্যাকর্ষণ রূপে অনুভব করা যায়, তেমনই ভাবে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হলেও, যখনই কিছু ব্রহ্মের থেকে অর্থাৎ স্বরূপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই তাঁর সক্রিয়তাকে অনুভব করা যায়।

আর এই সক্রিয়তা তিন স্তরে অনুভূত হয় আমাদের, একটি কারণ রূপে, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মরূপে, এবং তৃতীয়টি হলো স্থুল রূপে। কারণ রূপে ব্রহ্মের সক্রিয়তাকে আমরা নিয়তি বলে থাকি। সূক্ষ্মবেশে ব্রহ্মের সক্রিয়তাকে আমরা সময় বলে থাকি। আর স্থুলরূপে ব্রহ্মের সক্রিয়তাকে আমরা প্রকৃতি বলে থাকি। আর এই তিন অবস্থার ব্রহ্মসক্রিয়তারই প্রকাশকে আমরা অবতার বলে থাকি।

এঁদের মধ্যে ৪ কলা থেকে ১৬ কলা অবতার হলেন প্রকৃতির প্রকাশ; ১৬'র উর্ধ্ব থেকে ৩২ কলা অবতার হলেন সময়ের অবতার, এবং ৩২ এর উর্ধ্বের সমস্ত অবতার হলেন নিয়তির অবতার। এই ভেদের অর্থ কি? এই ভেদের অর্থ এই যে, ৪ থেকে ১৬ কলা অবতারের প্রকৃতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু সময়ের উপর নয়। ১৬'র উর্ধ্ব থেকে ৩২ কলা অবতারের প্রকৃতি ও সময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু নিয়তির উপর কনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। আর ৩২ কলার উর্ধ্বের অবতারদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, অর্থাৎ নিয়তি, সময় ও প্রকৃতি, এই তিনের উপরই নিয়ন্ত্রণ থাকে।

পুত্রী, তোমার মনে হতেই পারে যে, এতশত অবতার গ্রহণ করে লাভ কি হলো, তাই তো? ৪ থেকে ১২ কলার অবতারদের মধ্যে রয়েছেন চৈতন্যমহাপ্রভু, বিশ্বামিত্র, পিপলাদ; ১৬ কলা

অবতারদের মধ্যে রয়েছেন গৌতম, শঙ্কর, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন; ৩২ কলা অবতারদের মধ্যে রয়েছেন রামকৃষ্ণ ঠাকুর, মার্কণ্ড। কিন্তু এতশত অবতারের ক্রিয়ার দ্বারা কি আর কার্যসিদ্ধি হলো, এমনই মনে হচ্ছে তাই না! ... আর্যরা তো গৌতমের ধারাকেও প্রায় ভারতের ভূমির থেকে কেটে ফেলেই দিয়েছেন, শঙ্করের বেদান্তকেও ঢেকে রেখে দিয়েছেন, পিপলাদের উপনিষদকেও, এমনকি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মহাভারতকেও ঐতিহাসিক কাহিনী বলে ভ্রম স্থাপন করে রেখে দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ কথামৃত তো দুর্বোধ্য আর মার্কণ্ডের মার্কণ্ড মহাপুরাণ তো কেবল লোককথা হয়েই প্রচলিত। যখন আর্যরা অবতারকৃত্যের এমন সমস্ত হাল করেই দিয়েছেন, তখন অবতারগ্রহণে কি লাভ হলো! ...

(মৃদু হেসে) পুত্রী, শয়তান ভাবেন যে তাঁরাই কর্তা, তাঁরাই সমস্ত কিছু করছেন, আবার সাধকও ভাবেন যে তাঁরাই সমস্ত কিছু করছেন আর ব্যর্থ হচ্ছেন শয়তানদের কারণে। কিন্তু সত্য এই যে, না তো শয়তান কিচ্ছু করছেন, আর না সাধক। ... কর্তা তো এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই অর্থাৎ কর্তা এক নিয়তিই।

পুত্রী, জীবকটির সমস্যা হলো এই যে, তাঁদের কাছে তাঁদের প্রতিটি দেহধারণের স্মৃতি উপস্থিত, যাকে তাঁরা বলে থাকে পূর্বজন্মের সংস্কার। সমস্যা কেন? কারণ শয়তানরা এই সংস্কারকে নিজেদের কুবিচার, বিস্তারধারণা, ও অহমপ্রেম দ্বারা পরিবেষ্টিত রেখে দেয়। ঈশ্বরকটির কাছে সেই সংস্কার থাকেনা, সেই দিক দিয়ে যেমন ঈশ্বরকটি লাভবান, তেমন অন্য দিকে ঈশ্বরকটির সমস্যাও বিস্তর।

যেহেতু কনো অবতার কারুর পুনর্জন্ম নয়, তাই সংস্কার থাকেনা। আর তাই পূর্বের অবতার কতটা কর্ম সাধন করে গেছেন, তার ধারণাও পরবর্তী অবতারের থাকেনা। শয়তানদের থেকে নিজেদের কর্মকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, সর্বদাই অবতাররা রূপক ব্যবহার করে সমস্ত কথা বলেন, যেমন মার্কণ্ডের রূপকে সতী পার্বতী, যেমন ব্যাসের রূপকে রয়েছে হস্তিনাপুর। আর

তাই পরবর্তী অবতারের জন্য এই সমস্ত রূপক ভেদ করাও কঠিন হয়ে যায়। আর যখন তা ভেদ করা সম্ভব হয়, ততক্ষণে দেহের আয়ু প্রায় সমাপ্ত। তাই কর্মের প্রগতি হয়না, এমনই আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয়।

তবে তোমাকে এক গুহ্য রহস্য বলি এবার তাহলে। সমস্ত বুদ্ধরা সত্যকে দক্ষতার সাথে অনুধাবন করে, তাদেরকে রূপক করে রেখে গেছেন। সেই সমস্ত বুদ্ধের ব্যবহার করা রূপককে ভেদ করে, পিপলাদ উপনিষদের রচনা করে গেছেন, পরবর্তী সমস্ত অবতারদের জন্য। মার্কণ্ড, ব্যাস, বিশ্বামিত্র সত্যকে আরো দৃঢ় ভাবে অনুধাবন করে রূপক আকারে সমস্ত লিখে গেছেন। আর তার উদ্ধার করে, অসম্ভব সুন্দর ভাবে বলে গেছেন চৈতন্য, শঙ্কর, এবং রামকৃষ্ণ।

আর সেই সমস্ত তত্ত্বকে একত্রিত করে, আমি তোমার হাতে তুলে গেলাম সমস্ত সত্যের তত্ত্ব। পুত্রী, এই সমস্ত কিছু এমনই গতিহীন ভাবে চলেছে যে, আর্যরা বুঝতেও পারলো না, কিভাবে তা বুদ্ধদের থেকে পিপলাদ হয়ে, মার্কণ্ডের থেকে ব্যাসের থেকে রামকৃষ্ণ শঙ্কর হয়ে আমার হাতে উঠে এলো।

আর আরো গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তো আরো আনন্দদায়ক তথ্য পাবে। পুত্রী, পূর্বের অবতাররা নিজেদেরকে অবতার বলে আত্মপ্রকাশ করতেন না। না বুদ্ধরা করেছিলেন, না পিপলাদ, না গৌতম, না মার্কণ্ড। ব্যাস, বিশ্বামিত্র আকারেইঙ্গিতে সেই কথা বললেন, নিজেদের অবতার না বলে, নিজেদের অন্তরাত্মকে রাম বা কৃষ্ণ নাম প্রদান করে, তাঁদেরকে অবতার বললেন। শঙ্কর পুরো ব্যাপারটাই চেপে গেলেন কারণ তাঁকে যে মহাশূল বেদান্ত অস্ত্রকে রচনা করতে হতো।

কিন্তু এরপরে চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ উভয়েই নিজেদেরকে অবতার রূপে ঘোষণা করে দিয়ে, আর্যদের মধ্যে একটা ধারণা প্রস্তুত করে দিলেন যে অবতার এলে সকলেই জানতে পারবেন। কিন্তু চৈতন্য বা রামকৃষ্ণের মাধ্যমে নিয়তি যে, তাঁর ৬৪ কলার অবতারের অবতরণকে সহজেই আত্মগোপন করে দেবার মায়া রচলেন, তা আর্যরা ঘনাক্ষরেও টের পেলেন না।

আর আমি এসে, অতি নিরবে, সমস্ত অবতারদের কৃত্যকে সম্মুখে রেখে, কর্তা নাশের মহামন্ত্রকে নির্মাণ করে দিয়ে গেলাম। তাও কোন ভাষায়? বাংলা ভাষায়, যা অনার্যদের ভাষা। আরো নিরীক্ষণ করো পুত্রী। মার্কণ্ড ছিলেন প্রয়াগের অধিবাসী। আর্যদের দাপাদাপির কারণে তিনি কোথায় এলেন? বঙ্গদেশে।

সেই বঙ্গদেশ থেকে ফিরিঙ্গিদের হাত ধরে, কাদেরকে উৎখাত করা হয়? আর্যদের। অর্থাৎ কি দাঁড়ালো? বঙ্গদেশে সত্যের বীজ স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন মার্কণ্ডের হাত ধরে। সেই বীজকেই চারাগাছ এবং বৃক্ষে পরিণত করেগেছিলেন কারা? চৈতন্যদের এবং রামকৃষ্ণ, অনেক সাধকের মাধ্যমে। আর তারই সাথে নিয়তি কি করলেন? বঙ্গদেশ থেকে আর্যদের উৎখাত করে সরিয়ে দিলেন। আর সম্পূর্ণ ভাবে আর্যদের এই দেশ থেকে, এই ভাষা থেকে অপসারিত করার শেষে, এখানে আমাকে প্রকাশ করলেন, এবং আমার মাধ্যমে আর্যদের অচর্চিত বঙ্গভাষাতেই কৃতান্ত ও কৃতান্তিকা রচনা করিয়ে, সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত ভৌতিক সত্য, এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্যকে ব্যক্ত করে দিয়ে গেলেন।

অর্থাৎ সমস্ত সত্য, সমস্ত ইতিহাস রচিত হলো, অত্যন্ত সংক্ষেপে তা বলা হলো, আর সেই ভাষাতে বলা হল তা, যেই ভাষার চর্চাই করেন না আর্যরা, অর্থাৎ তা সুরক্ষিত থেকে গেল। আরো গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো পুত্রী।

আর্যদের দাপট ও অত্যাচার ও ব্যবিচার ও লুণ্ঠন ও মিথ্যাচার সম্বন্ধে ভারতবাসী প্রায় ভুলেই গেছিলেন। কিন্তু ঠিক যেই সময়ে এই সমস্ত সত্যকে বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করালেন পরানিয়তি, তখনই শয়তানের মহাবতারের উত্থানকে নিশ্চিত করলেন পরাপ্রকৃতি, আর পুনরায় ভারত তথা ভারতবাসীকে আর্যদের ব্যবিচার, মিথ্যাচার ও লুণ্ঠন স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু খেলা দেখো নিয়তির। ঠিক সেই সময়েই বঙ্গমাতা মানবদেহ ধারণ করে শয়তানের মহাবতারের বিস্তারকে সফল হওয়া থেকে রোধ করলেন। পুত্রী, একটু অন্য বিষয়েও চোখ রাখো। লোকতন্ত্রতে কি হয়? লোকতন্ত্রতে যিনি শাসকের আসনে স্থিত হন, তাঁর সর্বক্ষণ চিন্তা

থাকে, সেই আসন ধরে রাখার। আর তাই যদি লোকহিত করার ইচ্ছাও থাকে তাঁর, তাও তিনি তা করতে পারেন না। তাই লোকতন্ত্রে জনদরদি নেতা এলেও, জনহিতকর শাসক লাভ করা সম্পূর্ণ ভাবে অসম্ভব। অপর দিকে রাজতন্ত্রে, শাসকের নিজের আসন হারাবার কনো চিন্তা থাকেনা।

এই নিশ্চিন্ততার কারণে, প্রায়শই শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী শাসকের দেখা রাজতন্ত্রেই মেলে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ লোকহিতকর শাসকেরও দেখা সেখানেই মেলে। যেই শাসকের মধ্যে লোকহিতের ভাবনা এসে যায়, তিনিও নিজের আসন হারাবার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার কারণে, মুক্তহস্তে লোকহিত করতে সক্ষম হন। তাই রাজতন্ত্র অবশ্যই লোকতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু লোকতন্ত্রে একটি বাধ্যবাধকতাও আছে যে, শাসক যতই অত্যাচারী হোকনা কেন সেখানে, সংবিধানের ঊর্ধ্বে তিনি যেতে পারেন না, আর যদি যান, তাহলে দেশের মানুষের হাতে থাকে, তাঁকে তাঁর আসন থেকে টেনে নিচে নামাবার। তাই লোকতন্ত্রকে রাজতন্ত্রদ্বারা যদি প্রতিস্থাপন করতেই হয়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট শাসক স্মৃতি বা সংবিধানকে সম্মুখে রেখেই সেই রাজতন্ত্র স্থাপিত হওয়া উচিত, তবেই লোকহিত যথাযথ হতে পারবে।

কিন্তু ভারতের মানুষদের দেখো। আকস্মিক শয়তানের মহাবতারের উত্থানের কারণে, লোকতন্ত্র আজ প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে। কিন্তু সেই কাজে উদগ্রীব হলেও, বঙ্গমাতার মনুষ্যরূপী অবতারের কারণে, শয়তানের মহাবতার সেই কর্ম করতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু তাও লোকতন্ত্র জিজ্ঞাসাচিহ্নের নিরিখেই রইল, আর তোমার অবতরণ হলো।

এবার লোকতন্ত্র প্রতিস্থাপিতও হবে, কিন্তু তা মনুস্মৃতিকে সংবিধান মেনে, আর্যশাসন রূপে হবেনা, তা হবে শাসকস্মৃতিকে সংবিধান করে, সত্যের শাসন, স্বয়ং নিয়তির শাসন, স্বয়ং জগন্মাতার প্রেমময় শাসন। অর্থাৎ দেখলে পুত্রী, কি ভাবে সকলের দৃষ্টির অগোচরে, জগন্মাতা পরানিয়তি একের পর এক অবতারকে সাজিয়ে সাজিয়ে, এবং শয়তানদের কর্তাভাবকেও কাজে লাগিয়ে, সত্যশাসনের ও সত্যযুগের বিস্তারগাঁথার নির্মাণ করলেন।

এই সম্যক নিয়তিকৃত্যকে দর্শন করাই হলো দর্শন। আর তা দর্শন করার জন্য কি প্রয়োজন? পিপলাদের উপনিষদের মতধারা অনুসারে পিয়াজের খোলা ছাড়ানোর প্রয়োজন। পুত্রী, ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রমের রাজত্ব। তাই এখানে অসত্যের রাজত্ব থাকবে, তাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যের সাথে 'অ' যুক্ত হলে, তবেই সত্য অসত্য হয়, তাই যতই অসত্যের রাজত্ব থাকুক না কেন, সত্যের ব্যাপ্তিকে রোধ করা অসম্ভব।

আর তাই সমস্ত অসত্যের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে, সত্যকে ধারণ করাই হলো দর্শন। ইন্দ্রিয়দ্বারা যা কিছু তুমি দেখবে, শুনবে, ঘ্রাণ নেবে, স্বাদ নেবে বা অনুভব করবে, তার মধ্যে কিছু ভেদক থাকবে, আর সামান্য কিছু ধ্রুবক থাকবে। প্রথমে সেই ধ্রুবকের থেকে ভেদককে পৃথক করে নিয়ে, ভেদককে পরিত্যাগ করে, ধ্রুবককে গ্রহণ করতে হয়।

অতঃপরে, সেই ধ্রুবকসমূহের মধ্যে অতিধ্রুবককে ধারণ করতে হয়, এবং অন্য সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করতে হয়। অতঃপরে, সেই অতিধ্রুবকের মধ্যে নিমগ্ন হতে হয়, তবেই সত্যরূপ মহারত্নকে ধারণ করা যায়। পুত্রী, সমস্ত জগতের সকলের হাত থেকে কিছু না কিছু মুল্যবান রত্ন ভূমিতে পরে যাচ্ছে। সেই সমস্ত রত্নকে নর্দমার জল নদীতে মেশাচ্ছে, সেই নদী সমস্ত কিছুকে সাগরে নিয়ে যাচ্ছে।

তাই সাগরের তলদেশে অজস্র ধনরত্ন উপস্থিত, আর তাই যতক্ষণ না সাগরের তলে পৌছবে, ততক্ষণ দরিদ্রই থেকে যাবে। তা সেই সাগরে ডুব দিয়েই সেই তলে পৌছাও, বা আগস্তের মত সাগরের সমস্ত জলকে শোষণ করে নিয়ে সেই তলে পৌছাও, পৌছাতে সেখানেই হবে"।

দিব্যশ্রী ব্রহ্মসনাতনের কথাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, "মা, আমাকে ধ্রুবকের থেকে ভেদককে ভেদ করার, আর ধ্রুবকের থেকে অতিধ্রুবককে উদ্ধার করার শিক্ষা প্রদান করুন। ... আমি এই নিরন্তর পদ্ধতিকে ধারণা করতে পাচ্ছিনা"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, মন দিয়ে আমি এবার যেই বিচার স্থাপন করছি, তা শ্রবণ করো। এই বিচারধারাই তোমাকে অতিধ্রুবককে চিহ্নিত করার মার্গ শিখিয়ে দেবে। ... দেহ

একটি ভেদক। কেন তা ভেদক? কারণ প্রতিনিয়ত তার পরিবর্তন হয়, এবং একসময়ে সেই দেহের নাশও হয়ে যায়। এই দেহের মধ্যে ধ্রুবক কি কি? এঁর মধ্যে ধ্রুবক হলো প্রাণ, এবং একমাত্র প্রাণ। কেন প্রাণ? কারণ অন্য সমস্ত কিছু অর্থাৎ বুদ্ধি পরিবর্তনশীল, উর্জ্জা পরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তনশীল উর্জ্জা এবং বুদ্ধির কারণে, মনও পরিবর্তনশীল। কিন্তু প্রাণও তো একসময়ে দেহত্যাগ করে চলে যায়। তখন কি থেকে যায়? কেবলই বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জ্জা এবং দেহ ছাড়া অর্থাৎ চারভূত বহির্ভূত একটি ভূত, অর্থাৎ মন বা আকাশ।

তাহলে আকাশই হলো এঁদের সকলের মধ্যে ধ্রুবক। এবার এই আকাশের বিচার করো। এই আকাশের মধ্যে কি কি অবস্থান করছে? এই চার ভূত বা ভেদক বহির্ভূত আকাশের মধ্যে বিরাজ করছে ত্রিগুণ অর্থাৎ আত্মবোধ, বা অহম, আর? আর অবস্থান করছে সেই চেতনা যা এই সমস্ত কিছুকে অবলোকন করাচ্ছে, এবং আমাকে বিচার করাচ্ছে।

অর্থাৎ সকল কিছুর মধ্যে অতিধ্রুবক কে? চেতনা। কেন? কারণ একসময়ে এই মনও আত্মে বিলীন হয়ে যায়, আর মোক্ষের কালে এই অহমবোধ বা আত্মও ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। তখন থেকে কি যায়? একমাত্র চেতনা। অর্থাৎ চেতনাই হলো সেই মহাধ্রুবক। এবার এই মহাধ্রুবকরূপ সাগরের তলদেশে যাত্রা করো।

ব্রহ্মে আত্ম বিলীন হয়ে যায়, তো ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম মানে সর্বস্ব কিছুর আদি, সর্বস্ব কিছুর সার, সর্বস্ব কিছুর স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম একমঅস্তিত্ব, অর্থাৎ তাঁর ব্যতীত কারুর কনো অস্তিত্ব সম্ভবই নয়। অর্থাৎ চেতনা, যা সমস্ত কিছুর শেষেও অবশিষ্ট থাকে, যা সমাধির কালেও অবশিষ্ট থাকে যখন ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা, তা তাহলে কি? স্বয়ং ব্রহ্ম।

অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মই আমাদের অন্তরে চেতনার বেশে বিরাজমান, আর সেই চেতনাই আমাদেরকে সময়কে অনুধাবন করতে শেখায়, প্রকৃতির থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে শেখায়। ধ্যানের কালে, যখন স্থূলের বোধ চলে যায়, তখন প্রকৃতির বোধও চলে যায়, অর্থাৎ প্রকৃতি হলো চেতনারই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই স্থূল প্রকাশ; সমাধির কালে সময়ের ভান চলে যায় অর্থাৎ সময় হলো চেতনা

অর্থাৎ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম প্রকাশ। আর মোক্ষকালে? মোক্ষকালে অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধির কালে, চেতনার ভানও চলে যায়। অর্থাৎ চেতনা কি? সাখ্যাত নিয়তি, অর্থাৎ কারণ বেশে আমাদের সাথে ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্য সদা বিরাজ করেন, চেতনা বা নিয়তির বেশে।

এবার উপলব্ধি করতে পারলে পুত্রী, বিচার বা গহন বিচার কি? কিন্তু পুত্রী, তোমাকে আরো এক সত্য বলি এখানে। ... এই বিচার করা প্রথমদিকে সহজ লাগলেও, শেষের দিকে তা মটেও সহজ হয়না। ... কেন?

পুত্রী, পিয়াজের প্রথম দিকের খোলা হয় লাল। সহজেই তাকে পৃথক করা যায়। পরের দিকের স্তর হয় গোলাপি, তাকেও সহজ ভাবেই পৃথক করা যায়। কিন্তু অন্তের দিকে খোলা হয়ে যায় সাদা, অর্থাৎ সমস্ত রঙের এমত্রিত রূপ। তখন আর এই পৃথকীকরণ তেমন সহজ হয়না। তখন প্রয়োজন পরে, অত্যন্ত গভীর একাগ্রতার।

আর এই সম্পূর্ণ বিচারের কালে প্রয়োজন পরে, অন্তিম পর্যন্ত পৌঁছানর জেদ, সমস্ত বিচারকালকে একাগ্র হয়ে অবলোকন করার জন্য ধৈর্য, আর এই দুঃসাহসিক কর্ম করার জন্য সাহস। সঙ্গে বিদ্যা আর কৌশল থাকলে অতি উত্তম। আর খেয়াল করে দেখো, বেদব্যাস নিজের সৎগুণ রূপে কাদেরকে বলেছেন? যুধিষ্ঠির অর্থাৎ ধৈর্য, ভীম অর্থাৎ জেদ, অর্জুন অর্থাৎ সাহস, নকুল অর্থাৎ বিদ্যা এবং সহদেব অর্থাৎ কৌশল।

বুঝতে পারছ এবার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কি অভূতপূর্ব ভাবে নিজের অন্তরে সত্য ও অসত্যের লড়াইকে কি একাগ্রতার সাথে অবলোকন করেছিলেন, দর্শন করেছিলেন? পুত্রী, এই অন্তরে চলা সমূহ ঘটনাকে অবলোকন করে এসে, সেই দর্শন করা সমূহ কিছুকে ব্যক্ত যেই গ্রন্থ করে, তাকেই দর্শন বলে। যুক্তিতর্কের কচকচানিপূর্ণ গ্রন্থকে তত্ত্বকথার গ্রন্থ বলে, বা ইংরাজিতে বলে ফিলজফি, কিন্তু ফিলজফি মানে কখনোই দর্শন নয়, তা হলো তত্ত্বকথা। দর্শন তাই, যা অন্তরে দর্শন করে এসে দর্শক ব্যক্ত করেন।

আর তার কারণে প্রয়োজন একাগ্রচিত্ততা। তাই মনঃসংযোগ অভ্যাস করা অত্যন্ত আবশ্যক। এবার আমি তোমাকে সেই মনঃসংযোগ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলছি, শ্রবণ করো। ... তবে তারই সাথে আরো একটি কথাও বলবো, আর তা হলো কল্পনা। যেমন একাগ্রচিত্ত হতে হয়, তেমন কল্পনাকেও অপসারিত করতে হয়।

শোনো তাহলে, এই কল্পনার সম্মুখীন কেমনভাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে হই, আর সঙ্গে সঙ্গে এও শোনো এই কল্পনা আমাদের সত্যের পথে অগ্রগতিকে কি ভাবে প্রভাবিত করে। পুত্রী, কল্পনা এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি বাস্তব যাই হোক, বাস্তবতা যাই হোক, প্রকাশিত যাই হোক, সেই ব্যক্তি নিজের কল্পনাকেই সত্য জ্ঞান করে থাকে।

ব্রহ্মের কনো আবেগ নেই, নিয়তি সকলের জননী, আর সকলকে স্নেহ করেন, এবং সকলকে আহ্বান করেন সত্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য। কিন্তু যদি আবেগ থাকতো ব্রহ্ম ও নিয়তির, তবে অবশ্যই এমন বলতেন তাঁরা যে, এই কল্পনাই হলো সেই শয়তান, যার কারণে ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হয়েছে, কারণ এই কল্পনার কারণেই, যেই ব্রহ্মের কনো ভেদ হয়না, কনো অণু সম্ভবই না, সেই অণুরূপে নিজেদেরকে কল্পনা করে, স্বয়ম্ভু হয়েছে, আর তাঁর এই কল্পনার বিস্তারের কারণেই এই ব্রহ্মাণ্ড, আর সেই কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডের কারণেই সত্যের সাথে 'অ' যুক্ত হয়ে অসত্যের সূচনা হয়েছে।

হ্যাঁ পুত্রী, এই হলো কল্পনার প্রকৃত স্বরূপ। এই কল্পনাই সেই শয়তান, যার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণু প্রভাবিত, সকল আত্ম এবং পরামাত্ম প্রভাবিত, এবং এঁর কারণেই কেউ এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান, তো কেউ শয়তান। এঁর কারণেই কেউ বিত্তবান, তো কেউ দরিদ্র; কেউ সাদা তো কেউ কালো, কেউ পুরুষ, তো কেউ স্ত্রী, বা এক কথায় বলতে গেলে, এই কল্পনার কারণেই সমস্ত ভেদাভেদ, সমস্ত ভেদভাব, আর সমস্ত কলুষতা।

কিন্তু এই সমস্ত তো কল্পনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে কুকীর্তি। এঁর সামান্য জীবনে প্রভাব কেমন জানো? তোমাকে আমি তিরস্কার করলাম, তোমার ব্যঙ্গ করলাম। আর তুমি কল্পনা করে রেখেছ, তাই

তুমি আমার তিরস্কার এবং ব্যঙ্গকে মনে করলে তোমার সম্মান গগনচুম্বী হলো। আরো সহজ ভাবে দেখো একে, তো আরো ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পাবে এঁর।

তুমি কিছু কল্পনা করে রেখেছ যে আমি তোমাকে কিছু একটা নির্দিষ্ট কথা বলবো। আমি তোমাকে কিছু কথা বললাম, কিন্তু সেই কথা তোমার কল্পনার সাথে মিলল না। এবার তোমার কল্পনা তোমাকে কি করাবে জানো? তোমাকে প্রথমে এই ধারণাই প্রদান করবে যে, তোমার কল্পিত শব্দই আমি তোমাকে বলছি। কিন্তু যখন আমি সমানে বলে চলছি, তখন তোমার টনক নড়ল।

আসলে কল্পনা কখনোই বৃহৎ হয়না, কালব্যাপী হয়না। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের হয় এই কল্পনা, এবং রক্তবীজের মতন ধারা হয় তাঁর। একটি কল্পনার থেকে অজস্র কল্পনার বিস্তার হয়, আর তাই অজস্র অগুনতি কল্পনার জেরে, এক সম্পূর্ণ অসত্য ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা সম্ভব হয়। তাই তোমার কল্পনা তো ছিল আমি সামান্য সময়ব্যাপীই কিছু বলবো তোমাকে। কিন্তু যখন আমার কথনের কাল তোমার কল্পনার কালের সীমাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, তখন তোমার টনক নড়ে আর মনে হয় যে, আমার কল্পিত শব্দাবলী তো বলছেন না উনি!

অর্থাৎ, আমার তোমাকে যা বলার ছিল, তার অর্ধেকের অধিক কথা বলা হয়ে গেছে, তখন তোমার স্মরণ হওয়া শুরু হলো যে, আমি তোমার কল্পিত কথা বলছিনা। অর্থাৎ আমার বলা অর্ধেক কথা তুমি শুনতেই পাওনি, তা তোমার স্মৃতিপটে প্রবেশই করলো না। ... এই হলো কল্পনার সব চাইতে সাধারণ প্রভাব, যা আমাদের চরম অন্ধবিশ্বাস প্রদান করে।

ধর একজন রাজনেতা আমাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু সেই রাজনেতা কনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করছেন, এমন ধারণা প্রদান করিইয়েছেন আমাদেরকে। তখন আমরা কি করি? সেই রাজনেতা আমাদেরকে কৃতদাস করে তুললেও, আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে শোষণ করে নিলেও, আমরা দেখতে পাইনা, আমরা অন্ধবিশ্বাসী হয়ে থেকে যাই।

এমন কেন? কারণ আমরা যে ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে তাকে মেনে নিয়েছি। আর তাই অজস্র এমন কিছু কল্পনা করে নিয়েছি তাঁর সম্বন্ধে, যা তিনি আদপে করছেনই না। আর এমন হবার ফলে, আমরা তাঁর সমস্ত কথাকে একপ্রপকার ঈশ্বরবাক্য রূপে গ্রহণ করতে থাকি, যা আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও করিনা।

এই হলো কল্পনার প্রভাব পুত্রী, আর যদি এই প্রভাব কারুর উপর বিস্তারিত থাকে, তবে তাঁর পক্ষে সত্যজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, কারণ তাঁর ভাবধারাই হলো অসত্যপ্রেম, সত্য কি তাঁর জানার আবশ্যকতাই তিনি মনে করেন না, নিজের কল্পনাকেই তিনি সত্য জ্ঞান করেন। তিনি ধ্যানে বসবেন, আর ধ্যানে একটি রূপকে কল্পনা করবেন, আর এসে বলবেন, তাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে।

তিনি জ্ঞানসভায় উপস্থিত থেকে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন, আর কল্পনা করে নেবেন যে তাঁর সমস্ত জ্ঞান আহরিত হয়ে গেছে। তিনি কল্পনা করে নেবেন যে কনো অবতার আসবে, তাঁকে বগলদাবা করবে, আর উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবে। তিনি কল্পনা করে নেবেন যে, অবতার মানে এক বিশেষ ভৌতিক ক্ষমতাসম্পন্ন জীব, যিনি চমৎকার করে ফেরেন, জীবিতকে মৃত করে দেন, মৃতকে জীবিত করে দেন।

পুত্রী, এইরূপ অন্ধবিশ্বাস কখনোই কারুকে সত্যলাভ করতে দেয় না। যেই ব্যক্তি কল্পনাপ্রবণ হন, তিনি সর্বক্ষণ পরগাছা হয়ে থাকেন যে কেউ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন; তিনি যদি পরগাছার ভাব থেকে উন্নত হন, তবে পূর্ণ ভাবে যান্ত্রিক হয়ে ওঠেন; আবার তিনি যদি যান্ত্রিকতাকে ত্যাগ করেন, তবে পোশাকআশাক তিলককাঞ্চন ধারণ করে ভণ্ড হয়ে চমৎকার দেখাতে থাকেন। ...

আর এই সমস্ত ভাবযুক্ত অর্থাৎ কল্পনার দ্বারা গ্রসিত ব্যক্তি আর যাই হোক, সত্যলাভ করার উপযুক্তই নন। জীব জীবরূপে অবস্থান এই কারণেই করছেন কারণ তাঁরা সত্য সম্বন্ধে ভ্রমিত। যেই মুহূর্তে সত্যের ভান হয়ে যায় জীবের, সেই মুহূর্তে জীবের সহজাত ভাবে ধ্যান হয়,

মহাশূন্যের সাথে পরিচয় হয়, দর্শন হয়, ভাব হয়। কিন্তু সেই সমস্ত কিছু না হওয়া সত্ত্বেও, যখন জীব কল্পনা করতে থাকেন যে, তিনি সত্য জানেন, তখন তাঁর পক্ষে সত্যলাভ অসম্ভব হয়ে যায়।

সত্যলাভ করার জন্য যেমন তোমাকে বললাম যে পেয়াজের খোল ছাড়াতে হয়, যার বাইরের দিকের খোল কেবল বিচারদ্বারাই ছাড়ানো সম্ভব, কিন্তু অন্তর্বর্তী খোল ছাড়াতে প্রয়োজন অসম্ভব একাগ্রচিত্ততা, তেমনই এই কর্মের শ্রেষ্ঠ বাঁধা হলো, কল্পনা। কল্পনা মানেই পূর্ব থেকেই কিছু ধারণাকে স্থাপিত রেখে দেওয়া অন্তরে। আর সেই পূর্বধারণাই তাঁকে নবধারণা, সত্যধারণাকে ধারণ করতেই দেয়না।

তাই পুত্রী, যেমন বিচারের প্রয়োজন, তেমনই একাগ্রচিত্ততার প্রয়োজন, আর তেমনই কল্পনামুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে সাদা খাতা আবশ্যক সত্যলাভের জন্য। পূর্ণরূপে সাদা খাতার অর্থ এই যে, আমার খাতায় কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু লেখা নেই। যা এই খাতায় লেখা হবে, তাই আমি জানতে থাকবো। ...

পুত্রী, এই প্রথম ও তৃতীয়কর্মকে করতে হয় জীবকে স্বয়ং, বিনা কনো সাহায্য নিয়ে। এই কর্মে কেউ তাঁকে কনো সাহায্য করতে পারেনা। বিচার করতে কেমন করে হয়, তা দেখিয়ে দিতে পারে তোমাকে, যেমন তোমাকে কিছুক্ষণ পূর্বেই দেখালাম। সম্পূর্ণ সাদা খাতা হতে হয়, এমন বোঝানো সম্ভব, যেমন তোমাকে এক্ষণে বোঝালাম। কিন্তু করতে তোমাকেই হয়, কারণ তুমি নিজেই সেই ব্রহ্ম, আর তুমি নিজেই নিজের স্বরূপকে ঢেকে ও ভুলে বসে আছো। আর ব্রহ্ম অর্থ বোঝো তো! সে-ই সত্য। পুত্রী, অসত্যকে সত্য প্রদান করা যায়, কিন্তু সত্যকে সত্য প্রদান করা যায় না।

সত্য স্বয়ংকেই সত্য প্রদান করতে পারেন। তাই তোমাকে স্বয়ংকেই এই প্রথম ও তৃতীয় পর্যায় থেকে উন্নত হতে হবে। এবার আমি তোমাকে একাগ্রচিত্ত হবার ধারণা প্রদান করবো।

পুত্রী, একাগ্রচিত্ততা কেন আবশ্যক তা তো জানলে, এবার দেখো একাগ্রচিত্ত হতে কি করে হয়। মনের থেকে বাকি সমস্ত ভূতকে অপসারিত করাই হলো একাগ্রচিত্ততা, কারণ বাকি সমস্ত ভূত মনের স্থিরতাকে বিনষ্ট করে, আর মন হলো সেই আকাশ, যা স্থির হলে, তবেই দূরের নক্ষত্র দর্শন হয়। তাই মনের উপর থেকে অন্য সমস্ত ভূতের প্রভাবকে অপসারিত করতে হয়।

এবার এই বিজ্ঞানকে ভালো করে প্রত্যক্ষ করো। ইন্দ্রিয়দের যদি ভাবো যে কেবলই বহির্মুখী তারা, তবে তা হবে শ্রেষ্ঠ ভ্রান্তি। চোখ ইন্দ্রিয় নয়, দৃষ্টি নামক ইন্দ্রিয়ের বাহ্যজগত থেকে তথ্য সঞ্চয়ের যন্ত্র হলো চোখ। তেমনই, নাক ঘ্রাণের বাহ্য তথ্য সংগ্রহের যন্ত্র, ত্বক অনুভবের বাহ্য তথ্য সংগ্রহের যন্ত্র, কান বাহ্য শব্দ শ্রবণের যন্ত্র, তেমনই জিহ্বা বাহ্য স্বাদ গ্রহণের যন্ত্র।

অন্ধের মত কথাকে বিশ্বাসের কনো প্রয়োজন নেই পুত্রী। স্বয়ং বিচার করো। অন্তরে অম্ল হলে, কি করে অনুভব করো তা, জিহ্বা দিয়ে? অন্তরে অর্থাৎ উদরে বা অন্যত্র পীড়া হলে, তা কি দিয়ে অনুভব করো? ত্বক দিয়ে? সম্মুখের ব্যক্তিটি তোমার সম্বন্ধে কিছু মন্দ বিচার করছেন, কি দিয়ে তা দর্শন করো? নেত্র দিয়ে? ... নয় তো? কিন্তু দেখো, এই সমস্ত তুমি দেখতে পাও, শুনতে পাও, স্বাদ পাও, অনুভব পাও, ঘ্রাণ পাও।

অর্থাৎ যদি এমন ভেবে থাকো যে কেবল বাহ্য বস্তুতের অনুভবের জন্যই ইন্দ্রিয়রা রয়েছে, তাহলে তা এক ভ্রমের বিস্তার মাত্র। বাস্তব এই যে, ইন্দ্রিয়রা আমাদের চার ভূতের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত থাকে সর্বক্ষণ। দেহের যা কিছু হচ্ছে, উর্জ্জার অর্থাৎ আহার নিদ্রা ও মৈথুনের যা কিছু হচ্ছে, প্রাণের অর্থাৎ শ্বাসের বৃদ্ধি বা কষ্ট বা যা কিছু হচ্ছে, এই সমস্ত কিছুকে ইন্দ্রিয়রা সর্বক্ষণ পাঠ করছে, তথ্য সংগ্রহ করছে। আর তা করে কি করছে? তা সংগ্রহ করে, এই সমস্ত কিছু বুদ্ধির সম্মুখে স্থাপিত করছে।

আর বুদ্ধি সেই সমস্ত কিছুর বিচার করে, যেই যেই তথ্যকে প্রয়োজনীয়, সেইগুলোকে নিজের সাথে নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে মনের সকাশে, আর সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মনকে কনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছে। অর্থাৎ দেখো, মন সর্বক্ষণ এই বুদ্ধির দ্বারা, এবং বুদ্ধি সর্বদা অন্য তিন

ভূতের দ্বারা, এবং সেই তিন ভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্বদা গ্রসিত। আর এঁর ফলে, আমাদের মন কখনোই নিঝঞ্ঝাট নয়, স্থির নয়, আর তাই আমরাও দূরদর্শী নই।

আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, সমস্ত গতি পথ একমুখী হয়ে রয়েছে, আর তা হলো বাইরে থেকে ভিতরে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় থেকে তিন ভূতে, তিন ভূত থেকে বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধি থেকে মনে। কিন্তু মনের থেকে বাইরে কিছুই আসছে না, বা বলতে পারো আসার সুযোগ পাচ্ছেনা। এবার প্রশ্ন এই যে, মনের থেকে বাইরে কি আসতে পারে?

মন হলো আকাশ, যা কিছুই নয়, এক মাধ্যম মাত্র, বা বলতে পারো এক রাজপথ। এই রাজপথের একদিকে রয়েছে রাজমহল, আর অন্যদিকে রয়েছে শহর। আর সেই পথে কেবলই শহর থেকে রাজপ্রাসাদে যাত্রা হচ্ছে। সেখান থেকে কেউ ফিরছেও না, অর্থাৎ রাজমহলেই সমস্ত শহরবাসী অবস্থান করতে শুরু করছে। এবার পরিস্থিতি কেমন হবে, বিচার করে দেখো।

অন্যদিকে, রাজমহল থেকে যদি কিছু আসতো, তাহলে কি আসতো? রাজমহলে নিবাস করেন আত্ম, যিনি বহু জন্মজন্মান্তরের সাক্ষী। তাঁর অভিজ্ঞতা আসতো, তাই না? রাজমহলের অন্তরে নিবাস স্বয়ং পরাচেতনার, যিনি স্বয়ং সত্য। তাঁর থেকে সত্যজ্ঞান ও সত্যভাবের বিকাশ হতো, তাই না? কিন্তু দেখো, সেই সমস্ত কিছুই আসছে না।

আর তার ফলে কি হচ্ছে? ফলে এই হচ্ছে যে, রাজমহলের জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে, রাজ্যশাসন প্রায় স্তব্ধই হয়ে আসছে। আর এই স্তব্ধ হয়ে যাওয়াকে বলে অহমের বৃদ্ধি। পুত্রী, যদি রাজমহল থেকেও শহরে যাত্রা চলতে থাকে, আর যদি শহর থেকেও রাজমহলে যাত্রা চলতে থাকে, তবে এক ভারসম্যের নির্মাণ হয়।

অর্থাৎ যদি বাইরের জগত থেকেই কেবল অন্তরে সমস্ত তথ্য প্রবেশ করে, আর অন্তর থেকে কিছুই বাইরে না আসতে পারে, তবে অন্তর ভারি হতে শুরু করে, আর এই ভার আমিত্বের বিস্তার করে, অর্থাৎ অহমের বৃদ্ধি হয়। অন্য দিকে, যখন অন্তর থেকেও বাইরে কিছু আসতে

শুরু করে, তাহলে তাতে থাকে আত্মের পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা, চেতনার সত্যশিক্ষা। আর তারফলে, মন আর তখন অহেতুক তথ্য গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়।

যেই সমস্ত বাহ্য তথ্য সত্যের সাথে সংযুক্ত হয়, তাকেই গ্রহণ করে সে, আর অন্য সমূহ কিছুকে বর্জন করে, বুদ্ধির অহেতুক লম্ফঝম্প, অন্য তিনভূতের চাঞ্চল্য, এবং ইন্দ্রিয়দের দৌরাত্ম, সমস্ত কিছুকে হ্রাসদান করে। আর এর ফলে কি হয়? সত্যভাব ও সত্যজ্ঞানের প্রকাশে প্রকাশিত হয় সকল ভূত, সকল ইন্দ্রিয়, এবং তাঁরা সকলেই তখন সত্যঅভিমুখী হয়ে গিয়ে, সমস্ত বাহ্যজগতকেও সত্যের আতশকাঁচ দ্বারা দেখতে শুরু করে, এবং সর্বক্ষণ সর্বকিছুর থেকে শিক্ষা গ্রহণের অভিলাষী হয়ে উঠে বিনয়ী হয়ে ওঠে।

শিক্ষাগ্রহণের জন্য অভিলাষী ভাবই বিনয়, আর বিনয় হলো বিবেকের ভাব। অর্থাৎ এই বিনয় যখন অভ্যাস করে নয়, শিক্ষাগ্রহণের অভিলাষ থেকে জাত হয়, তখনই বিবেকের জন্ম হয়। পুত্রী, অনেককেই দেখবে বিনয় ও বিনম্রতাকে একাকার করে ফেলেন। পুত্রী, বিনয় হলো শিক্ষাগ্রহণের জন্য তৎপরতার ভাব, আর সেই ভাবের কারণে সময়ে সময়ে যেমন বিনম্রতাও আসে, তেমন সময়ে সময়ে উগ্রতাও স্থান পায়।

কিন্তু অসাধুরা এই সত্য জানেন না, আর তাই তাঁদেরকে দেখবে বিনম্রতার ভেক ধারণ করে অবস্থান করেন। তিরস্কারের কথা বললেও, তা তিরস্কারের ন্যায় শুনতে লাগে না, আর তাই আমরা ভ্রমিত হয়ে যাই যে, ইনি কত বিনম্র, ইনি নিশ্চয়ই বিবেকবাণ। পুত্রী, যেই দেশের এখনো ৩০ শতাংশ আর্যমানসিকতা ধারণ করে রাখেন, সেখানে এই সমস্ত ছলনা হতে থাকবে, তিলকাদি বা পোশাকআশাক ধারণ করে, বা বিভিন্ন প্রকার মালা ধারণ করে পাখন্ডদের উৎপাত লেগে থাকবে, তা অতি স্বাভাবিক।

তাই এই সমূহ জ্ঞানকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ধারণ করা অত্যন্ত আবশ্যক, নাহলে কখন তোমাকে কোন ভণ্ড ছলে চলে যাবে, তা টেরও পাবে না। টের না পেলেও কনো ক্ষতি নেই, কিন্তু এঁদের বিষাক্ত ভণ্ডামি প্রায়শই আমাদের প্রকৃত সাধনার নাশ করে দেয়, এবং কিছু আচার অনুষ্ঠানে

আমাদেরকে আবদ্ধ করিয়ে দিয়ে, আমাদেরকেও পাখন্ড করে দেয়, তার টেরও পাবেনা, আর সেটি বিপজ্জনক। কারণ এই পাখন্ড ভাব, একজন্মে যাবার বিশয় নয়, জন্মজন্মান্তর ধরে এই সমস্ত পাখন্ড ভাব থেকে যায়।

যদি বলো, কেন থেকে যায়, তবে এঁর উত্তর এই যে, আমরা সত্যের সন্ধান না পেয়ে, প্রায়শই এই ভেবে থাকি যে সত্যলাভ নিশ্চয়ই ভীষণ কঠিন, আর সেই মানসিকতা থেকে আমরা সর্বদা ছোটপথ খুঁজতে থাকি, যেমন নাম জপলেই উদ্ধার, বৈকুণ্ঠে গেলেই মোক্ষ, দুইবার নাম নিয়ে হাত তুলে নৃত্য করলেই উদ্ধার। ...

কিন্তু পুত্রী, কেউ মদ্য পান না করেও মাতলামি করতে পারে্। পারেকিনা? তাহলে কি তিনি মাতাল? চৈতন্যদেব মাতাল হয়েছিলেন, হরিনামের মদ্যপান করে উদ্ভ্রান্ত হয়ে নৃত্য করেছিলেন। ... কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, হরিনাম নিয়ে নৃত্য করলেই, চৈতন্য দেব হয়ে যাবো আমি। ... এই সমস্ত কিছু উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উদ্ভ্রান্ত ধারণা বা বলা চলে কল্পনা, আর এই সমস্ত কিছু সত্যের পথে যাত্রাকে অতিকায় কঠিন করে দেয়, কারণ সমাজে প্রচুর ধরনের ভ্রান্তি পূর্ব থেকেই ছিল, এঁরা আরো ভ্রান্তির যোগ করে দেন।

সত্যলাভ কঠিন নয়, বিস্তারিত সময়ও লাগেনা তার জন্য। যা প্রয়োজন, তা হলো বিবেকের জাগরণ, আর বিবেকের জাগরণের জন্য প্রয়োজন বিনয় অর্থাৎ নিরন্তর শিক্ষালাভের প্রবণতা, আর তা লাভ করতে প্রয়োজন রাজপথ অর্থাৎ মনকে কেবল একমুখি যাত্রার পথ থেকে উভয়মুখী যাত্রার পথ করে তোলা। আর তা করতেই প্রয়োজন মনসংযোগ।

মনঃসংযোগ আমাদের মন অর্থাৎ রাজপথের থেকে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য বাহির থেকে অন্তরের যাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়, আর অন্তর থেকে বাহিরে যাত্রাপথকে সুগম করে দেয়। নিয়মিত কিছু সময়ে এমন বাহ্যমুখি যাত্রা হতে থাকলে, কিছু বছরের মধ্যেই, সত্যের বিকাশ হতে থাকে সমস্ত ভূতের উপর এবং ইন্দ্রিয়দের উপর, আর তখনই জন্ম নিয়ে নেয় বিবেক।

একবার বিবেক জন্ম নিয়ে নিলে, শিক্ষাগ্রহণ আর প্রয়োজন থাকেনা, তখন তা নেশায় পরিণত হয়ে যায়। আর তা একবার হয়ে গেলে, আর কনো চিন্তা নেই। যাত্রার সমাপ্তি হয়না এখানে, কিন্তু সেই যাত্রায় আর তোমাকে বা সাধককে কিছু করতে হয়না। বিবেকই যা করার করতে থাকে। সে-ই শিক্ষা গ্রহণ করে করে, তমগুণকে উত্তপ্ত করে ভৈরব করতে থাকে। আর তমগুণ একবার ভৈরব হয়ে গেলে, ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনাকে বেঁধে নিয়ে চলে যায় চেতনার সম্মুখে, আর তাঁর সম্মুখে সে পতিত হতেই, ভস্ম হয়ে যায়... আর তাঁরা ভস্ম হয়ে গেলেই, ব্রহ্মলাভ হয় জীবের।

প্রথমে নিয়মিত ধ্যানসমাধি হতে থাকে সততই, আর অন্তে নির্বিকল্প সমাধি হয়ে মোক্ষলাভ করে, তাঁকে জীবনমৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে মুক্ত করে দেয়। এই হলো সাধনা। তুমি এবার বলবে, নামজপ, কীর্তনাদির কি কনো ভূমিকা নেই? হ্যাঁ, অবশ্যই এঁদের ভূমিকা আছে। সম্পূর্ণ ভাবে সংসারঅভিমুখী মানুষ, যারা কখনোই একাগ্রচিত্ত নন, যারা নিজেদের ভাবনাকেই বিবেক বলে চালিয়ে দেন, তাঁদেরকে সামান্য আভাস দেওয়া যায় এই সমূহদ্বারা।

তবে সত্য বলতে কি জানো পুত্রী, যার অন্তরে ঈশ্বরীয় ভাব আসেনি, তাঁকে তুমি যতই এই সমস্ত করাও, তার কিছুতেই কিছু হবেনা, কারণ তাঁর মন যে অস্থির। বরং যা হবে, তা হলো এই যে, এই সমস্ত করলেই মুক্তি, এমন প্রচার করে করে, যারা এই সমস্ত কিছুকে পেশা করে নিয়ে, ধনবান হচ্ছেন, তাঁদের প্ররোচনার ফাঁদে পরে, এই মোহসর্বস্ব মানুষরা ভাবতে শুরু করেন যে, আমি তো মুক্ত হয়েই যাবো কারণ আমি কীর্তন করছি, তীর্থ করছি, নাম নিচ্ছি। আর এই ভাবের কারণে এমন অহমবোধের জন্ম হয় তাঁর মধ্যে যে, সে মোক্ষের দিকে অগ্রসর তো হয়ইনা, বরং সহস্র জন্ম পিছিয়ে যায় মোক্ষের থেকে”।

দিব্যশ্রী বললেন, “আচ্ছা, যেহেতু ইন্দ্রিয়রা তিনভূতকে, এবং তিন ভূত বুদ্ধিকে, এবং বুদ্ধি মনকে অর্থাৎ রাজপথকে জবরদখল করে বসে থাকেন, তাই আপনি যেকোনো একটি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে, অবস্থান করতে বলেন মনঃসংযোগের ক্ষেত্রে। এতে, বাকি ইন্দ্রিয়রা ভূতদের

থেকে সরে যায়, আর একটি ইন্দ্রিয়কে সর্বক্ষণ ভূতরা গ্রহণ করতে থাকলে, একসময়ে এই ইন্দ্রিয়কেও অদেখা করতে শুরু করে তাঁরা।

অদেখা করা মানে, কনো তথ্য নেই, অর্থাৎ বুদ্ধিও মনের কাছে যাচ্ছেনা, অর্থাৎ রাজপথের জবরদখল উঠে যাচ্ছে। আর এমন নিয়মিত হতে থাকলে, আত্মের অভিজ্ঞতা বাইরে আসতে শুরু হয়ে যাবে আমাদের জীবনে। ... এতো গেল মনঃসংযোগ। কিন্তু এর সাথে ধ্যানের পার্থক্য কি? ধ্যানের প্রক্রিয়া কি আলাদা কিছু? আর ধ্যানের উদ্দেশ্য কি অন্য কিছু? ধ্যানে কি রাজপথকে খালি করা উদ্দেশ্য নয়?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, মনের উপর জবরদখল অপসারণই মনঃসংযোগের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ রাজপথকে খালি করে, রাজমহলের থেকে তথ্য আনায়নকে সুগম করাই মনঃসংযোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে যে কেবল আত্মই প্রকাশিত করবে নিজেকে। জন্মজন্ম ধরে, জবরদখল থাকা মনের কারণে, এত এত তথ্য গ্রহণ করে, সে তো অহমিকায় বশীভূত! তাই সে যে একাকীই এবার সমস্ত তথ্য প্রদান করতে শুরু করবে। ... চেতনাকে সত্যভাব বা সত্যতথ্য প্রদানের সুযোগই সে দিতে চাইবেনা।

আর সেই সুযোগ প্রদানের জন্য হলো ধ্যান। ... এই পদ্ধতিতে, আত্মকে রাজপথ বা মনকে আশ্রয় করে, বাইরে আসতে দিতে হয়, যা সে স্বভাবতই করে থাকে, মনঃসংযোগের পর থেকে। আর একবার সে বাইরে এসে গেলে, রাজপথকে বন্ধ করে, রাজমহলে যাত্রা করতে হয়, চেতনার কাছে। ... পুত্রী, যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন আমার দিদা আমাকে গল্প বলতেন, আর মা বলতেন পড়াশুনা হয়ে গেছে?

তাই কি করতাম, পড়াশুনা শেষ করে, মায়ের কাছে পড়া দিয়ে, ছুটি নিয়ে চলে যেতাম দিদার কাছে। এও ঠিক তেমন। আত্মকে বাইরে আসতে দিয়ে, খালি রাজমহলে আমরা আমাদের মায়ের কাছে চলে যাই, পরমসত্যের কাছে চলে যাই। পুরো রাজমহলে তাঁকে তন্যতন্য করে খুঁজি, আর একসময়ে তাঁর দর্শন লাভ করে ধন্য হয়ে যাই"।

দিব্যশ্রী উৎসাহী হয়ে বললেন, “কিন্তু তা করি কি উপায়ে?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, তিনি সত্য। আর সত্য কি? সত্য হলেন মহাশূন্য, সত্য হলেন নিঃশব্দ, সত্য হলেন নিরাকার, সত্য হলেন স্পন্দনহীনতা। কিন্তু যতক্ষণ খোঁজ, ততক্ষণ যে এক উচাটন ভাব অন্তরে থেকেই যাওয়া, তাই না! ... ততক্ষণ, কিছু না কিছু কল্পনা করেই চলা, তাই তো? কনো না কনো রূপ, কনো না কনো গন্ধ, কনো না কনো শব্দ, কনো না কনো অনুভব, নিরন্তর খুঁজে চলা, তাই তো?

কিন্তু তিনি যে সমস্ত গন্ধের পার, সমস্ত রূপের পার, সমস্ত শব্দ, ধ্বনি, স্বাদ, অনুভব, সমস্ত কিছুর পারে স্থিতা। তাই সামান্য বলতে সামান্য কল্পনা থাকলেও, তাঁকে কি ভাবে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে? সমস্ত বলতে সমস্ত রূপের বোধ, গুণের বোধ, শব্দের বোধ, সমস্ত বোধ যেখানে সমাপ্ত হয়, সেখানেই তিনি স্থিতা।

তাই পুত্রী, তন্ময় হতে হয়। কিন্তু তন্ময় হবে কি করে? আত্ম যে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেবার জন্য সর্বক্ষণ উঁচিয়ে থাকে! সর্বক্ষণ কিছু না কিছু বলে চলেছে সে। পূর্বে বুদ্ধি বলতে থাকতো, মনঃসংযোগ দ্বারা তাঁকে চুপ করিয়েছ, এখন আত্ম বলতে থাকে। তাই এবার এই আত্মের থেকে মুক্তির সময় আসন্ন। তাঁর থেকে মুক্তি না পেলে, তাঁর সাথে যুক্ত কল্পনা, ইচ্ছা আর চিন্তার থেকেও মুক্তি সম্ভব নয়।

ধ্যান হলো, তাঁর থেকে মুক্তির প্রবন্ধ করা, যেখানে স্থির হয়ে উপস্থিত থাকতে হয়। আত্মের সমস্ত কথাতে নিরুত্তর, নিস্তাপ, নিশ্চুপ, নির্বিকার। যখন এমন হবে, আত্ম যার মূল উপাদানই অহংকার, অর্থাৎ আমিত্বের বোধ, সেই আমিত্ব বিপর্যস্ত ও অবহেলিত হচ্ছে, এই বোধ নিয়ে, আত্ম সরাসরি বুদ্ধির সংসর্গে আসার প্রবণতা দেখাবেই। আর একবার তা দেখিয়ে রাজপথ অর্থাৎ মনকে ধারণ করে সম্মুখে এগিয়ে এলে, নিজের সমস্ত দৃষ্টি রাজপ্রাসাদের দিকে ঘুরিয়ে দাও, আর পূর্ণ ভাবে মন অর্থাৎ রাজপথের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নাও।

জানি কিচ্ছু খুঁজে পাবেনা। তাই বলি কিছু খোঁজার প্রয়াসই করো না, কারণ খোঁজার চেষ্টা করে পরাচেতনার দর্শন লাভ সম্ভবই নয়। পুত্রী, যিনি কনোদিন জাহাজ দেখেননি, তিনি স্টিমার দেখেই জাহাজ জাহাজ বলে লাফান; যিনি কনোদিন ঈগল দেখেন নি, তিনি সামান্য চিল দেখেই ঈগল ঈগল বলে চেঁচান।

আসল কথা হলো এই যে, আমরা তাঁকেই খুঁজে পেতে পারি, যার সম্বন্ধে আমাদের পূর্বধারণা রয়েছে। কিন্তু নির্বিকার, নিরাকার, অনন্ত, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য, অসীম কেমন দেখতে, তাঁর কনো ধারণাই নেই আমাদের। তাঁকে খোঁজার প্রয়াস কেমন জানো? একজন মানুষের সাথে দেখা করতে গেছি আমি, খুব জ্ঞানীগুণী মানুষ। ধারণা করে বসে আছি যে, তিনি আসবেন, তাঁর এক বিশেষ পোশাকআশাক হবে, এক বিশেষ ধারার সাজসজ্জা হবে, এক বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলবেন। কিন্তু তাঁর দেখা আর পেলাম না।

ফিরে এসে যিনি আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ভায়া দেখা তো পেলামই না তাঁর! ... সেই ব্যক্তি বলেন, হতেই পারেনা! ... আচ্ছা শোনো, ওখানে খুব ভালো একটা চায়ের দোকান আছে, চা খেয়েছ ওখানে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চা তো খেয়েছি বেশ ভাল চা খানি। ... আমার কথা শুনে হেসে সে বললে, তারপরেও বলছো, তাঁর সাথে তোমার দেখা হয়নি! সেই চায়ের দোকানে যিনি তোমাকে চা দিয়েছেন, তিনিই সে। ...

যখন আমরা আমাদের মাকে খুঁজতে যাই, আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ হয় পুত্রী। তিনি আমাদের সম্মুখে আসেন, চলেও যান। কিন্তু আমরা ভেবে রেখে দিই না যে, তিনি তো কালী হবেন, দুর্গা হবেন, রাজপোষাকে থাকবেন, এলোকেশী হবেন, মাথা ভর্তি সিঁদুর হবে, ত্রিনয়ন হবে। ... কিন্তু পুত্রী, তিনি তো নিরাকার, তিনি তো নির্বিশেষ। ... কনো রকম বিশেষত্ব থাকেনা তাঁর। সন্তানের সেবায় সর্বক্ষণ দাসীর ন্যায় খেটে চলেন তিনি।

মা যখন রান্না করছেন, তখন তাঁকে যদি আমরা না চিনি মা বলে, তবে আচমকা তাঁকে দেখে মনে হবে যেন তিনি হলেন এক রাঁধুনি পিসি। পরে, মাকে চিনতে না পারার জন্য জিব কাটবো আমরা। ... তেমনই তিনি হলেন নির্বিশেষ। কনো প্রকার বিশেষত্ব ধারণ করে উনি থাকেন না। অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত সাবলীল, অত্যন্ত সামান্য, কিন্তু যখন তখন তাঁকে লাভ করবে, তখনই জানতে পারবে যে, তাঁর এই সাবলীলতা, এই সাধারনতা, এই সামান্যতা, এই বিশেষত্বহীনতাই তাঁর বিশেষত্ব।

আসলে আমাদের স্বভাব হলো রাজমহলে গিয়ে, শৃঙ্গারের ঘরে, বা স্ত্রীমহলে গিয়ে মহারানীর সন্ধান করা। কিন্তু আমাদের মহারানী যে রন্ধনশালার এক কোনে বাটনা বাটতে ব্যস্ত। তিনি যে ধোপানীর মত কাপড় ধুতে ব্যস্ত, তাঁর যে এই বোধটাই নেই যে তিনি হলেন মহারানী। ... সেই ধোপানীকে আমরা দেখেছি, কিন্তু ধোপানী বলে তাঁর দিকে তাকাই নি, রাঁধুনির দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনি। শেষে যখন রাজপ্রাসাদে রাজসিংহাসনে সেই একই স্ত্রীকে বিরাজমান দেখি। ... তখন আমাদের বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে। সেই রাঁধুনিই মহারানী! সেই ধোপানীই মহারানী! ...

তেমনই পুত্রী, তাঁকে খুঁজতে যেও না, তাঁকে খুঁজতে গেলে, তিনি তোমার সম্মুখে এসে তোমার সাথে আলাপ করলেও, তুমি তাঁকে চিনতে পারবেনা, কারণ তিনি যে অত্যন্ত সাধারন্যা। তিনি যে আমাদের মা, আমাদের নিজের মা, আমাদের একমাত্র মা... আমাদের সর্বস্ব তিনি।... (হেসে) কি ভাবছো, একবার মাকে মা বলে চীনে নিলে আর অসুবধা হবেনা! ...

পুত্রী, অনেক মানুষের ঘরে, সন্তান যখন মাকে খুঁজতে আসে, তখনও সে মাকে চিনতে পারেনা। কখন যে মা রাঁধুনি হয়ে রয়েছেন, কখন যে ধোপানী হয়ে রয়েছেন, কখন যে ছাদে আচার বড়ি দিচ্ছেন, পিছন থেকে দেখে নিজের সন্তানই চিনতে পারেনা। তাই তো সে না খুঁজে, কি করে? সে হাঁক পারে, মা ... মা... কোথায় তুমি। একটা কথা আছে, দরকার আছে। ... মা যেই কাজ করছেন, হাতের কাজটা গুছিয়ে রেখে, সামনে এসে দাঁড়ান। উনুনে আঁচ দিচ্ছিলেন হয়তো,

হাতে, কপালে কয়লার দাগ। ... বলো তো এবার, সন্তান এই অবস্থায় মাকে দেখে চিনবে কি করে? ...

না পুত্রী, আমরা তাঁকে হাজার বার দেখলেও চিনতে পারিনা, কারণ তিনি এতটাই সাধারণ, তিনি এতটাই সামান্য, তিনি এতটাই নির্বিশেষ। ... তাই একটিই উপায়, সেই সন্তানের মত করেই ডাকা মাকে। মা, কোথায় তুমি, মা আমি এসেছি, খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। ... যত ব্যস্তই থাকুন মা, সন্তানের পিপাসা পেয়েছে, মা কি করে থাকতে পারেন তাঁর মুখে জল না দিয়ে। ... হন্যে হয়ে তোমার কাছে তিনি ছুটে আসবেন।

আর একবার যখন তাঁর দেখা পেয়ে যাবে, তখন আর ধ্যান হবেনা, তখন হয়ে যাবে সমাধি। ... যতক্ষণ তাঁকে খোঁজা, ততক্ষণ ধ্যান। আর একবার সেই নির্বিশেষ প্রেমউন্মাদিনীর দেখা পেয়ে গেলে, আর নিজের কনো কল্পনাকে আশ্রয় করে থাকতে পারবেনা, আর নিজের অস্তিত্বটাও স্বীকার করতে কষ্ট হবে। ... প্রাণমন সমস্ত কিছু যেন একটিই কাজ করতে চাইবে, নিজের জন্মজন্মান্তরের মাকে ছুটে গিয়ে জরিয়ে ধরতে ইচ্ছা হবে। ... আর এমন জরিয়ে ধরতে ইচ্ছা হবে, যেন আর কনোদিন তোমাকে ছাড়বো না। ...

তাঁর এই প্রথম দর্শন, তাঁর প্রতিবারের দর্শনই হলো সমাধি পুত্রী। আর সমাধির অভিজ্ঞতা হলো তন্ময়, মহাতন্ময়, বা বলতে পারো মৃত্যু সমান। অর্থাৎ ধ্যান হলো তাঁর সন্ধানের প্রয়াস, যেখানে একাধিকবার সন্ধান করার প্রয়াস বিফল হতে হতে, অন্তে আমরা সন্ধানের প্রয়াস বন্ধ করে, শুরু করি আবাহন, আর নিজেদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করি, আর সমাধি হলো তাঁর দর্শন।

আর দর্শনের উপরান্তে যখন তাঁর সাথে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই, তখন আর আত্মবোধ অবশিষ্টই থাকেনা। জীবকটি হলে, ব্রহ্মাণু নামক অর্থাৎ আত্ম নামক ভ্রম সমস্তকালের জন্য মিটে যায়, এবং জীবনমৃত্যুর চক্র, যা ব্রহ্মাণু বা আত্মের অস্তিত্বের কারণেই সম্ভব ছিল, তা সম্পূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়ে যায়, আর তাকেই মোক্ষলাভ বলা হয়। ঈশ্বরকটির ক্ষেত্রে এটি মোক্ষ নয়, বরং সত্য

অর্থে তাঁর অবতার জীবনের শুরু হয় এখান থেকে, যেখানে তাঁর ব্রহ্মাণু বা আত্মের বিসর্জন হয়ে যায় ব্রহ্মে, এবং অতঃপর তিনি ব্রহ্মদেহ হয়েই অবস্থান করেন, আর তাই তাঁর তখন অজ্ঞাত বলে কিছুই থাকেনা।

সমস্ত প্রকৃতি তিনি স্বয়ং, কালী তিনি স্বয়ং, নিয়তি তিনি স্বয়ং, আর তাই জীবন্ত ঈশ্বরমূর্তি হয়ে বিরাজ করে, সমস্ত ব্রহ্মাণু অর্থাৎ তাঁর সমস্ত সন্তানদের উদ্ধারের মার্গ নির্মাণ করাতে তিনি মনযোগী হন। আর তাই ঈশ্বরকটির ক্ষেত্রে যা জীবকটির মোক্ষ, তা হলো নির্বিকল্প সমাধি।

এই হলো সাধন পুত্রী। এবার এই সাধনকেই মার্কণ্ড দেখিয়েছেন চেতনা লাভ না করতে পেরে, ভৈরব হয়ে উঠে, চেতনাকে ধারণা করে করতে হয়েছে, আবার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেখিয়েছেন যে চেতনার উত্থান সম্ভব হওয়ার কারণে, চেতনার হাত ধরেই সেই সাধন সম্ভব হচ্ছে। হ্যাঁ, ঈশ্বরকটিদের ক্ষেত্রে সাধারণত চেতনার হাত ধরেই এই উত্থান সম্ভব হয়, কিন্তু জীবকটিদের ক্ষেত্রে, অধিকাংশ সময়েই চেতনা নিজের ঊর্ধ্বতন অবস্থায় উন্নীত হতে পারেন না, যেমন সতী পারেন নি, এমনই দেখিয়েছেন মার্কণ্ড।

আর তখন জীবকটিকে ভৈরবের আগমন ঘটাতে হয়, এবং সাধন করতে হয়, যেমন তন্ত্রপথে মার্কণ্ড দেখিয়েছেন। এই দুইই সাধন মত সম্ভব পুত্রী, হয় চেতনার হাত ধরে, নয় ভৈরব জাগ্রত করে, এছাড়া মোক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাবার তৃতীয় কনো মার্গ সম্ভব নয়। শঙ্কর যা করেছেন অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্ত করে, তা হলো এই দুই মার্গে পথ চলার ক্ষেত্রে যেই সমস্ত বাঁধা আসে, অজ্ঞানতার বাঁধা, সেই বাঁধাকে অতিক্রম করার জন্য উপযোগী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও এই যাত্রাপথের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্যই কথামৃত দান করেছেন। গৌতমবুদ্ধ সমস্ত যাত্রাপথের অন্তিম গন্তব্য অর্থাৎ মোক্ষ বা নির্বাণকেই ব্যাখ্যা করেছেন আর বলেছেন যে মোহ বা আসক্তিই হলো সেই যাত্রাপথের একমাত্র বাঁধা। আর চৈতন্যমহাপ্রভু, সেই যাত্রাপথের সন্ধানী করে তোলার জন্যই ভক্তির বিস্তার করেছেন।

আর কৃতান্ত? কৃতান্ত সেই সমস্ত যাত্রাপথকে সহজ করে দেবার জন্যই রচিত, সর্বজনের জন্য সেই পথ উন্মুক্ত করে দেবার জন্যই তা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই কৃতান্ত এই বলেছে যে, না তোমাদের গহন বনে যেতে হবেনা তন্ত্রের জন্য, আর সংসার ত্যাগীও হতে হবেনা। জীবন যেই অবস্থায় তোমাকে রেখেছে, বা সাধককে রেখেছে, সেই অবস্থাতে বিরাজমান হয়েই, মোহ বা আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত পরিস্থিতি থেকে, সমস্ত উপস্থিত জীবের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকতে হবে।

এই আসক্তি ও বিরক্তিশূন্য শিক্ষাগ্রহণই তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য স্থাপন করে, তাঁর অন্তরে বিবেককে স্থাপন করবে, আর একবার তা হয়ে গেলে, মনঃসংযোগ ও ধ্যানের হাত ধরে, সমস্ত কল্পনা, চিন্তা, ইচ্ছা ও অহম বোধের উর্ধ্বে গমন করে, মোক্ষ লাভ সম্ভব হবে। অর্থাৎ কৃতান্ত নতুন কথা বলছে, তা একদমই নয়। যা ব্যাস বলেছেন, যা মার্কণ্ড বলেছেন, এর অতীতে কনো আর পথই সম্ভব নয়।

কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করে, বা বনবাসে যাবার কথা বলার কারণে প্রচুর সাধক যে সাধনায় উন্নীত হতে পারছেন না, তারই সমাধান হলো কৃতান্ত। তাই কৃতান্ত বলছেন যে কর্তাভাবের নাশ করো। যেখানে কর্তাই নেই, সেখানে কে-ই বা বনবাসী হবে, আর কেউ বা সন্ন্যাসী হবে! ... সময়, প্রকৃতি ও নিয়তি যেই পরিস্থিতি তোমার সম্মুখে আনছেন, সেটিই হলো তোমার শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ মার্গ।

সেই পরিস্থিতি যদি তোমার সম্মুখে দারিদ্রতা আনে, সেই দারিদ্রতাই তোমার শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ মার্গ সেই পরিস্থিতিতে। পরিস্থিতি যদি তোমাকে সংসারী করে, সেই সংসারই তোমার শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ মার্গ। পরিস্থিতি যদি তোমাকে সন্তানের মাতা বা পিতা করে, তবে সেই মাতা বা পিতা হয়ে অবস্থান করাই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের অবস্থা। অর্থাৎ পরিস্থিতি হবেন তোমার বিদ্যালয়, আর সেই বিদ্যালয় অর্থাৎ সেই পরিস্থিতি যেই যেই ব্যক্তি, জীব, উদ্ভিদ বা অজীবকে সম্মুখে আনবেন, তিনিই হবেন তোমার শিক্ষক।

আর সেই সমস্ত শিক্ষকের থেকে, সর্বক্ষণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে, নিজের আসক্তি ও বিরক্তিকে সরিয়ে রেখে, নিজেকে কর্তা জ্ঞান করে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়াস থেকে সরিয়ে রেখে, বিদ্যালয় অর্থাৎ পরিস্থিতি যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা তোমাকে বলছে, তাই গ্রহণ করতে থাকবে। সেই সিদ্ধান্ত যদি তোমার ক্ষতি সাধন করে, তবুও সেই সিদ্ধান্তই তোমার সিদ্ধান্ত হবে, আর যদি তোমাকে লাভবান করে, তবুও সেই সিদ্ধান্তই তোমার সিদ্ধান্ত হবে।

এই হলো কৃতান্তের মার্গদর্শন, যা তোমাকে অত্যন্ত সাধারণ করেই রেখে দেবে, না তোমাকে বনবাসী করবে, না তোমাকে সন্ন্যাসী করবে, না তোমাকে কনো বিশেষ বস্ত্র ধারণ করাবে, না তোমাকে কনো তিলক বা মাল্যে ভূষিত করবে। অর্থাৎ কেউ জানতেও পারবে না যে তুমি সাধনা করছ, না তোমার বেশভূষা দেখে, না তোমার পোশাকআশাক দেখে, আর না তোমার তিলকাদি দেখে। কিন্তু তুমি নিরন্তর সাধনা করে চলেছ।

চাকুরী করার পরিস্থিতি এলো, তুমি সেই চাকুরীর মধ্যেও বৈরাগী হয়ে থেকে, সমস্ত কিছুকে নিরন্তর দর্শন করে করে শিক্ষা লাভ করলে; বিবাহের প্রস্তাব এলো, যার সাথে বিবাহ স্থির করা হলো, তাঁরই সাথে বিবাহবন্ধনে যুক্ত হয়েও, বৈরাগী হয়ে থেকে, অকর্তা হয়ে থেকে, বৈবাহিক জীবন থেকে সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকলে; সন্তানাদির পিতা বা মাতা হলে, সেই দায়িত্ব পালন করতে করতেও, বৈরাগী ও অকর্তা হয়ে সমস্ত কিছুর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকলে।

দিনান্তে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, মনঃসংযোগের অভ্যাস করলে, পারলে ওটি গোপনেই তা করলে, আর একটি সময়ে বিচার করতে থাকলে যে জীবন তোমাকে বিভিন্ন পর্যায় কি কি শিক্ষা প্রদান করেছে। এই বিচার আর এই মনঃসংযোগ, একসময়ে তোমাকে ধ্যানে উন্নীত করবে, সংসারের মধ্যে রেখেই, আর একসময়ে তা তোমাকে মোক্ষ প্রদানও করে দেবে, অর্থাৎ তোমাকে জীবনমৃত্যুর চক্র থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেবে।

এই সংসারে থাকার কালেই, তুমি তোমার অন্তরে ভৈরবকে জাগ্রত করতে পারবে, আর সত্য বলতে সংসারের থেকে শ্রেষ্ঠ স্থানই সম্ভব নয় ভৈরবকে জাগ্রত করার জন্য। তুমি যদি বনে

থাকো, যদি সন্ন্যাসী হয়ে থাকো, তোমাকে যেই স্থানে অবস্থান করছো, তার নিয়ম পালন করতেই হবে। বন হলে, বনের নিয়ম, বৃক্ষতল হলে, বৃক্ষতলের নিয়ম, পাহাড়ের গুহা হলে, পাহাড়ের নিয়ম, তোমাকে এইসবকে মান্যতা দিতেই হবে। তাই যদি নিজেকে অনিদ্রা প্রদান করে করে, ভৈরবকে জাগ্রত করতে হয়, তা সম্ভব হয়না; যদি নিজেকে অভুক্ত রেখে রেখে, তৃষ্ণার্ত রেখে রেখে, নিজের উর্জ্জার উপর জয়লাভ করতে হয়, তা সম্ভব হয়না।

কিন্তু তোমার সংসারে, তুমি সহজেই এই সমস্ত কিছু করতে সক্ষম, আর তাই নিজের অন্তরের উর্জ্জাকে পশমিত করতে সহজেই সক্ষম, নিজের বুদ্ধিকে স্থগিত করতে সহজেই সক্ষম। ধরো তুমি বনে রয়েছ, আর তুমি কনো ব্যাঘ্রের সম্মুখে পরেছ, বা সর্পের সম্মুখে পরেছ। যদি না অকর্তা হবার অভ্যাস তোমার ইতিমধ্যেই করা হয়ে থাকে, তাহলে কিছুতেই তখন তুমি নিজেকে অকর্তা করে রাখতে পারবেনা।

কিন্তু সংসারে কনো ব্যাঘ্র নেই, সর্প নেই, আছে কেবলই মানুষ। সেই মানুষ অকথা কুকথা বলবে, উপদ্রব করবে, শান্তিতে দুদণ্ড বসতে দেবেনা। এই সমস্ত কিছুকে সহ্য করা অনেক সহজ, ব্যাঘ্রের বা সর্পের উপদ্রবের থেকে, কারণ প্রাণ নিয়ে চিন্তা নেই সংসারে, যা ব্যঘ্রের বা সর্পের সম্মুখে থাকে। তাই সহজেই নিজেকে শান্ত করে রাখা যায়, এবং যেই ভূতের ভয় দেখিয়ে বুদ্ধি আমাদের কর্তা হতে বাধ্য করে, অর্থাৎ প্রাণের, সেই ভয় সেখানে থাকেই না।

তুমি সহজে উর্জ্জাকে পশমিত করতে সক্ষম, তোমাকে দেহের চিন্তা না করলেও, তাতে সমানে প্রয়োজন মত পুষ্টি যাচ্ছে এবং তাঁর রক্ষা করতে থাকছে, এমনকি তোমার প্রাণের ভয়ও নেই সংসারে। তো সহজ হলো না বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করা? সংসারের মধ্যে থেকে যদি সাম্যতা ধারণ করো, তাহলে সহজেই চারভূতকে সাহেস্তা করা যায়, আর তাই মনঃসংযোগ অতি সহজাত হয়ে যায়।

আর তার থেকেও বড় কথা, বনে থেকে, তোমাকে নিরন্তর পরিস্থিতির সন্ধান করতে থাকতে হবে, কারণ তুমি তো সন্ন্যাসী, তাই তোমার সম্মুখে তো স্বাভাবিকভাবে কনো পরিস্থিতি আসবে

না। কিন্তু সংসারে তোমাকে সম্মুখে একের পর এক পরিস্থিতি নিরন্তর এবং অনলস ভাবে আসতেই থাকে, আর তাই তোমাকে আলাদা করে বিদ্যালয়ের সন্ধান করতে হয়না, সর্বক্ষণ তুমি বিদ্যালয়ে থেকেই, শিক্ষা গ্রহণ করতেই থাকো।

তাই কৃতান্ত বলছে, পরিস্থিতি তোমাকে যখন যেই অবস্থায় রাখছে, সেই অবস্থায় থেকে, মোহহীন হয়ে, বৈরাগী হয়ে অর্থাৎ কনো কিছুর প্রতি আসক্ত না হয়ে এবং কনো কিছুর প্রতি বিরক্ত না হয়ে, সমানে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকো, আর নীরবে উন্নত হতে থাকো। মোক্ষপ্রাপ্তি হলো লক্ষ্য, মোক্ষপথে আমি যাত্রা করছি তার প্রচার বা বিজ্ঞাপন তো আবশ্যক নয়। তবে কেন ভিন্ন পোশাক ধারণ করা, কেন তিলক ব্যবহার করা? কেন কিছু বিশেষ মাল্য ধারণ করা?

পুত্রী, মোক্ষ হলো মিলন, আমাদের স্বরূপের সাথে আমাদের মিলন, আমাদের প্রেমের সাথে আমাদের মিলন। আর মিলনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে, নির্বস্ত্র হতে হয়। সেখানে নতুন করে কনো বস্ত্র ধারণের অর্থ বিলাসিতা ব্যতীত আর কি? যা পোশাক সম্মুখে আসছে, তাই ধারণ করো, সাধারণ পোশাক; যা আহার সম্মুখে আসছে, তাই গ্রহণ করা, নির্বিচারে গ্রহণ করা, এই হলো কর্তব্য।

আসল কথা হলো কর্তাবোধ। কল্পনার কারণে আমরা স্বয়ম্ভু হয়ে উঠে, নিজেদেরকে কর্তা করে রাখার কারণেই তো আমরা সত্যবিমুখ, সত্য থেকে বিচ্যুত। এবার যদি আমরা নতুন করে কর্তাকে ধারণ করে বলতে থাকি, এই বস্ত্র নয় ওই বস্ত্র ধারণ করবো, এই আহার নয় ওই আহার গ্রহণ করবো, এই গহনা নয় ওই গহনা ধারণ করবো, তাহলে তো পুনরায় এক কর্তারই জন্ম দিচ্ছি আমরা! পুনরায় আমরা সত্যবিমুখই হয়ে চলেছি।

যখন আমরা বলবো, বিবাহ করবো না, বা এই পাত্রকে ওই পাত্রকে, বা এই পাত্রীকে ওই পাত্রীকে বিবাহ করবো বা করবো না, তখন তো আমরা এক নতুন কর্তার জন্ম দিচ্ছি নিজেদের মধ্যে! এক তো একাধিক কর্তা, যেমন এই কুলের সন্তান, এই গোত্রের সন্তান, এই ধর্মসম্প্রদায়ের সন্তান, এই দেশের সন্তান, অমুক পিতার সন্তান, অমুক চাকরি করা ব্যক্তি আমি,

অমুক ব্যবসা করা ব্যক্তি আমি, অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্র আমি, অমুক বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা ব্যক্তি আমি, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো কর্তাভাবের তলায় আমাদের নিজেদের স্বরূপকে ঢেকেই রেখেছি। এরপর যদি আবারও নতুন করে বস্ত্র, আভুষন, তিলক ইত্যাদি ধারণের পথে যাই, আবার করে আমি সাকাহারি, আমি ফলাহারী, এই পথে যাই, তাহলে তো আরো এক নতুন কর্তার জন্ম হলো! পূর্বের পর্দাই সরলো না, নতুন পর্দা সত্যকে আরো দূরে ঠেলে দিল।

তাই কৃতান্ত বলছে, পরিস্থিতি তোমার সম্মুখে যা আনছে, তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করো। কেন? কারণ পরিস্থিতি হলেন স্বয়ং নিয়তি, আর নিয়তি হলেন সাখ্যাত ব্রহ্মময়ী, অর্থাৎ পরম সত্যের কারণরূপ প্রকাশ। আর তিনি আমাদের একমাত্র জননী। এমন জননী তিনি যে, আমরা নিজেদের ভালো তেমন করে বুঝিই না, যা তিনি বোঝেন। তাই তিনি তাই তাইকেই আমাদের সম্মুখে আনছেন পরিস্থিতি বেশে, যা আমাদের জন্য আবশ্যক, যা আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ।

তাই কর্তাভাবকে দূরে সরিয়ে রেখে, যা তিনি সম্মুখে আনছেন, তাকেই গ্রহণ করতে বলছে কৃতান্ত। আর সাথে সাথে এই বলছে কৃতান্ত যে, এই যে আমাদের কর্তাভাব, তার পশ্চাতে থাকে কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার ছলনা, আর সেই ছলের কারণেই আজ আমরা সত্যের থেকে বিচ্যুত, স্বয়ম্ভু, আর বিভ্রান্ত। তাই কর্তাভাবকে দূরে সরিয়ে রেখে, পরিস্থিতিকে গ্রহণ করো, তাহলে স্বতঃই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার থেকে মুক্ত হবে, আর সত্যের সম্মুখীন হয়ে, মোক্ষপ্রাপ্ত হবে, তাঁর মধ্যে চিরতরে বিলীন হয়ে গিয়ে"।

দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু মা, এই যে বলে, বৈকুণ্ঠে গেলেই মোক্ষ, কৈলাসে গেলেই মোক্ষ। ... এগুলি কি মোক্ষ নয়?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক, স্বর্গ, গন্ধর্বলোক, পিতৃলোক, এই সমস্তই হলো একাকটি জ্ঞানলোক, যাদের প্রকাশ আমাদের দেহের অন্তরেই স্থিত। এঁরা যথাক্রমে হলো আজ্ঞাচক্র, বিশুদ্ধ, অনাহত, মনিপুর, স্বাধিষ্ঠান এবং মূলাধার। ... কিন্তু এই

সমস্ত কিছুর উর্দ্ধেও একটি জ্ঞানছেত্র আছে, যার নাম সহস্রার। আমাদের সমাধি তখন হয়, যখন আমাদের চিত্ত এই সহস্রারে উন্নত হয়, তবে মোক্ষ তখনও লাভ হয়না।

মধ্যা কথা হলো পুত্রী, দুইয়ের অস্তিত্ব। ব্রহ্ম হলেন অসীম, আর বিচার করে বলো, যখন অসীম শব্দের উচ্চারণ করছো, তখন কি দুইয়ের অস্তিত্ব সম্ভব? এই দ্বিতীয় অস্তিত্বই তো প্রথম অস্তিত্বকে অসীম থেকে সসীম করে দেবে, তাই নয় কি? অর্থাৎ সত্য এই যে, কনো দুইএর অস্তিত্বই নেই। সেই দ্বিতীয় আমি তুমি হই, আর ব্রহ্মা বিষ্ণু হন, সমস্ত দুইই অনিত্য, সমস্ত দুইই ভ্রম।

তাই যতক্ষণ দুইএর অস্তিত্ব সম্ভব, ততক্ষণই ভ্রম বিদ্যমান, কারণ ততক্ষণ 'আমি'র অস্তিত্ব ভাস্মর। আর যতক্ষণ 'আমি' অবস্থান করছে, ততক্ষণ পরিবর্তনও ঘটমান সত্য। অর্থাৎ আমি কনো একটি স্থান থেকে মুক্ত হচ্ছি, তো অন্য একটি স্থানে আবদ্ধ হচ্ছি। উলঙ্গ অবস্থা থেকে মুক্ত হচ্ছি, তো বস্ত্রের অধীনে স্থাপিত হচ্ছি; শীতকাল থেকে মুক্ত হচ্ছি, তো গ্রীষ্মকালে আবদ্ধ হচ্ছি। অর্থাৎ বন্ধন স্থাপণ ও মুক্তি একই সঙ্গে ঘটমান।

আর যখন পরিবর্তন ঘটমান, তখন তো মৃত্যুও সম্ভব, আর জীবনও। তাহলে বলো জীবনমৃত্যুর থেকে মুক্ত আমরা কি করে হলাম! ... না পুত্রী, যতক্ষণ দুইএর অস্তিত্ব ততক্ষণই জীবনমৃত্যুর বন্ধন অব্যহত। জীবনমৃত্যু তখনই অবাঞ্ছিত হয়ে যায়, অহেতুক হয়ে যায়, গল্পকথা হয়ে যায়, অসত্য হয়ে যায়, যখন আমার কনো পৃথক অস্তিত্বই আর থাকেনা, আমি ব্রহ্মময় হয়ে গেছি। সমস্ত সসীমত্ব ত্যাগ করে, অসীমে লীন হয়ে গেছি।

তাই এক ও একমাত্র ব্রহ্মলাভেই মোক্ষ। না তো ব্রহ্মদর্শনে মোক্ষ, না আত্মদর্শনে, না কনো জ্ঞানলোকে স্থিত হয়ে মোক্ষলাভ সম্ভব। হ্যাঁ, যখন আমি ব্রহ্মলোকে স্থিত হলাম, অর্থাৎ আমার অনাহত জাগ্রত হলো, আমি বাহ্য শব্দের থেকে মুক্তি লাভ করলাম; যখন আমি বিশুদ্ধে বা বৈকুণ্ঠে স্থিত হলাম, তখন আমি সমস্ত বাহ্য শ্রী থেকে মুক্ত হলাম; যখন আমি কৈলাসে বা

আজ্ঞাতে স্থিত হচ্ছি, তখন আমি সমস্ত বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছি, কিন্তু আমার অস্তিত্ব তখনও বর্তমান, অর্থাৎ পরিবর্তন তখনও চলমান, অর্থাৎ জীবনমৃত্যুর চক্র তখনও অব্যহত।

যখন আমি সহস্রারে উন্নীত হচ্ছি, তখন আমার ব্রহ্মদর্শন হচ্ছে, কিন্তু তখনও আমার অস্তিত্ব রয়েছে, কারণ আমি দেখছি, আর ব্রহ্মকে দেখছি। কেবল দুই, কিন্তু এক নয়। কিন্তু যখন নির্বিকল্প হচ্ছে, তখন আর কনো বিকল্প নেই, আর কনো দুই নেই। এক ও একমাত্র অসীম ব্রহ্মই উপস্থিত, মোক্ষ তখনই ভাস্মর সত্য, কারণ আর কনো ব্রহ্মাণুই নেই, আর কনো আত্মই নেই, আর কনো পরমাত্মও নেই। এক ও অনন্য মহাশূন্য উপস্থিত।

না সেখানে কনো নিয়তি আছেন, না প্রকৃতি, না মহাকালী, আর না ত্রিগুণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উপস্থিত; না কনো দেব উপস্থিত সেখানে, না গন্ধর্ব, না পিতৃ, আর না কনো অসুর, যক্ষ, রক্ষ, দানব, কেউ উপস্থিত সেখানে। তাই তো তিনি অব্যাক্ত, তাই তো তিনি অচিন্ত্য, তাই তো তিনি অনন্ত, তাই তো তিনি অসীম। আর তাই তাঁতে লীন হলে, তবেই মোক্ষ, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। তার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যখনই আমরা কিছুর থেকে মুক্ত হচ্ছি, সেই ক্ষণেই অন্য কিছুর দ্বারা আবদ্ধও হচ্ছি। কেন?

কারণ 'আমি' যে তখনও অস্তিত্বশীল, আত্ম যে তখনও বর্তমান, পরমাত্মও যে তখনও বর্তমান। ... তাই মোক্ষ কিছুতেই সম্ভব নয় তখন। আর এমন ভেবো না যে, ব্যাস বা অন্য কেউ বৈকুণ্ঠে গমনকে মোক্ষ বলেছেন। তাঁরা তো বলেছেন মুক্তি, নিম্ন সমস্ত লোকের থেকে মুক্তি, আর পরের দেহে, অন্য কনো যোনিতে জন্ম নেওয়ার থেকে মুক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁরা এই মুক্তিকে ব্যখ্যা করেননি, আর তাই আর্যরা এই সমস্তকিছুকেই মোক্ষ বলে স্থাপিত করেছেন, আর বলে গেছেন দেখো, স্বয়ং অবতার বলছে, অহংকার যখন শ্রীযুক্ত হয়, তখনই মোক্ষ।

তাই ভক্তি করো, জোরে জোরে তাঁর নাম নাও; সেই সমস্ত কিছু, সেই সর্বস্ব কিছু, সেই অচিন্ত্য, সেই অসীম। কিন্তু মূর্খ তো আর্যরা বরাবরই ছিলেন, আর এখন তো মূর্খতাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ আভুষন হয়ে গেছে। যাইহোক, এই আর্যদের এই সমস্ত মিথ্যাচারের থেকে মানুষকে মুক্ত করার

প্রয়াসেই শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্ত প্রদান করেছিলেন, আর বলেছিলেন যে, তিনিই অব্যাক্ত, যার অস্তিত্বসম্মুখে তোমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। যতক্ষণ না তুমিই সেই ব্রহ্ম হচ্ছ, ততক্ষণ তিনিও সেই ব্রহ্ম নন, কারণ এক ঈশ্বরই ঈশ্বরের দর্শন করতে সক্ষম। আর তাই শঙ্কর সত্যের প্রকাশ ঘটিয়ে বললেন, স্বয়ং সেই ব্রহ্ম হয়ে ওঠো, তবেই ব্রহ্মলাভ হবে। যতক্ষণ দুই, ততক্ষণই মোহ, প্রেমে কনো দুই হয়না, কেবলই এক, কেবলই একাকার, কেবলই অব্যক্ত ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে, আর তাকেই বলা হয় মোক্ষ, অর্থাৎ জীবনমৃত্যুর চক্র থেকে চিরমুক্তি"।

নীতি সত্য

দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা মা, আর্যরা তো কেবলই যে ঈশ্বরবাদকেই বিকৃত করেছে, এমন তো নয়। তাঁরা তো শাসনধারাকেও বেশ প্রভাবিত করেছিল। ক্ষত্রিয়দের উপর এঁদের অধিকার তো কম ছিল না! কেবলমাত্র শূদ্রদের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, আর তার কারণও তাঁরা স্বয়ংই, আসলে শূদ্রদের উপর অত্যাচার করবেন, তাঁদেরকে শোষণ করবেন, সেই কারণেই হয়তো, এঁদেরকে নিজেদের অধিকারে রাখেন নি। তা এই শাসনের উপর, এঁরা কি প্রভাব বিস্তার করেছিল? আর অর্থের উপরেও কি এঁরা প্রভাব বিস্তার করেছিল?"

ব্রহ্মসনাতন একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "পুত্রী, যাকে এখন তোমরা রাজনীতি বলে আখ্যা দাও, তা আদপে রাজনীতিই নয়, তা হলো কূটনীতি, আর আর্যরা কি প্রভাব ফেলেছিল, প্রশ্ন করলে না! আর্যরা রাজনীতিকে কূটনীতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দিয়েছিল, এবং এক কথাতে বলতে হলে, রাজনীতিকে সম্যক ভাবে বিদায় প্রদান করেছে তারা, কারণ তাঁদের প্রভাবের কারণে আজকে কূটনীতিকেই রাজনীতি বলা হয়।

আর যেমন রাজনীতির অন্তর্ভুক্তই হয় অর্থনীতি বা শিক্ষানীতি, তেমনই কূটনীতিরও অন্তর্ভুক্ত এই দুই নীতি। আর বর্তমানে সমস্ত যাকিছুকে নীতি রূপে দেখো, তা আর্যদেরই স্থাপিত... আর

তা রাজনীতির থেকে সম্যক ভাবে পৃথক। সত্য বলতে, বর্তমান মানব সভ্যতা থেকেই রাজনীতি বিদায় নিয়েছে, যা রয়েছে তা কেবলই কূটনীতি"।

দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "এই রাজনীতি আর কূটনীতির মধ্যে ভেদ কি?"

ব্রহ্মসনাতন এবার একটু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসু কন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, "পুত্রী, সহজ ভাবে বলতে গেলে, রাজনীতি হলো সেই পথ, যাতে রাজা ও প্রজা একই সাথে যাতায়াত করেন। আর কূটনীতি হলো সেই পথ, যাতে একা রাজা চলেন, আর প্রজা পীঠের দুই পাশে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন। ... আরো বিস্তারে বলতে হলে, রাজনীতি হলো এই সঙ্গমস্থল যেখানে রাজার উন্নত চেতনা ও প্রজার নিত্য প্রয়োজন মিলিত হয়। আর কূটনীতিতে কনো মিলন নেই। এক রাজা আদেশ দেন, আর প্রজাকে তা মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়"।

দিব্যশ্রী বললেন, "এই যৎসামান্য শ্রবণ করে শান্তি পাচ্ছি না মা। রাজনীতির সম্বন্ধে বিস্তারে পাঠ প্রদান করুন আমাকে। আর সাথে সাথে, কূটনীতিরও শিক্ষা প্রদান করুন। আমার মনে হয়, এই রাজনীতি আর কূটনীতির শিক্ষা অনেকটা সত্য ও অসত্যের শিক্ষার মত। যেমন আপনি বলেন না, অসত্য জ্ঞান না থাকলে, সত্য জ্ঞানের মাহাত্ম অনুভবই করা যায়না, ঠিক তেমনই আমার মনে হচ্ছে যেন, কূটনীতির জ্ঞান না ধারণ করলে, রাজনীতির জ্ঞানও অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। ... তাই আমাকে যেমন করে বললে, আমার কাছে উভয়ই বোধগম্য হবে, তেমন করে বলুন। এই বিষয়ে আমার জ্ঞাননেত্রকে উন্মোচিত করুন মা"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "বেশ পুত্রী, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ কথা বিস্তারে বলছি। এতে তোমার রাজনীতি ও কূটনীতির জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কূটনীতির কথা আলাদা করে বলবো না, বরং যখন তার রাজনীতির সাথে ভেদকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে, তখনই তার কথা বললে, কূটনীতির ভেদও জেনে যাবে"।

এত বলে ব্রহ্মসনাতন দিব্য রাজনীতির ব্যখা শুরু করলেন, "পুত্রী, রাজনীতি শব্দের মধ্যে দুটি শব্দ রয়েছে, রাজা ও নীতি। এঁদের প্রথম শব্দ অবশ্যই রাজা, আর দ্বিতীয় শব্দ হলো নীতি।

তাই প্রথম রাজার সংজ্ঞা জানবো আমরা, অতঃপরে নীতি। আর তারপরেই, আমরা রাজনীতির অন্তরে প্রবেশ করবো।

রাজা কে? রাজা হলেন একটি ছেত্রের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচিত এক ব্যক্তি, যাকে সেই ছেত্রের সমস্ত মানুষ দায়িত্ব প্রদান করেন সেই ছেত্রকে সম্যক ভাবে রক্ষা করার।

অর্থাৎ রাজার ভূমিকা হলো সমস্ত ছেত্রের রক্ষা করা। তাই এবার দেখে নেওয়া আবশ্যক যে, সেই ছেত্রের মধ্যে কি কি পরে? প্রথমেই যা আসে, তা হলো ভূখণ্ড ও সেই ভূখণ্ডের প্রকৃতি, অর্থাৎ পাহাড়, মালভূমি, নদী, জলাশয়, সমুদ্রতট সমস্ত কিছু। দ্বিতীয় আসে, সেই ভূখণ্ডের উপরে স্থিত সকল বনস্পতি এবং সকল জীব। তৃতীয় আসে, সেই ভূখণ্ডে স্থিত সমস্ত ধরিত্রীর সম্পত্তি, অর্থাৎ খনিজ। এবং চতুর্থ পর্যায়ে আসে সেখানের মানুষ।

অর্থাৎ রাজার কর্তব্যের মধ্যে পরে, সেই ভূখণ্ডের, যেই ভূখণ্ডের রাজা তিনি, তার সমস্ত পার্থিব সম্পদের রক্ষা করা, সমস্ত কিছুকে নির্মল রাখা, এবং সমস্ত কিছুকে প্রাকৃতিক মর্যাদাতেই সম্পন্ন করা। বনজঙ্গলকে সুরক্ষিত রাখা পশুপাখিদের জন্য, নদীর পারবাঁধানো, জলাশয়ের পার বাঁধানো, প্রয়োজনে সমুদ্রেরও পারবাঁধানোও রাজার কর্তব্য যাতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রাণহানী কম করা যায়, এবং যাতে মানুষের কারণে প্রকৃতির বিনাশকেও হ্রাস করা যায়।

যেমন মানুষকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য, তেমনই সম্পূর্ণ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষা করাও রাজার কর্তব্য। আর তাই তাঁকে উভয় দিকের সাম্যতাকে স্থাপন করে রাখতে হবে। এরপরে আসে খনিজ উত্তোলন। রাজা জানেন যে সেই খিনিজ ধরিত্রী মাতার সম্পদ, আর সেই সম্পদ সমস্ত উদ্ভিদাদিকে পুষ্টি প্রদানের কারণেই তিনি ধারণ করেন।

তাই যতটা খনিজ প্রজার জন্য ও রাজকোষের জন্য আবশ্যক, ততটাই খনন করা উচিত, আর তার অতিরিক্ত খনন ও খনিজ উত্তোলনকে বন্ধ রাখা কর্তব্য রাজার, যাতে ধরিত্রীর সাম্যতা সর্বসময়ে রক্ষিত হয়। অতিখনন ভুমিধশের কারণ হয়, যাতে বিপুল প্রাণের বলি চরে, কেবল তাই নয়, উপরন্তু প্রকৃতির আবহাওয়ারও পরিবর্তন হয় এতে, আর তাই মুহুর্মুহু আঁধি, ঘূর্ণাবাত

ইত্যাদি হতে থাকে, এবং জনবসতি প্রবল উত্তাপের শিকার হতে থাকে, বা প্রবল বর্ষণে বসতি ও লোকালয়ের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

প্রতিটি যোনি অন্য যোনির সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখে, যেমন টিকটিকি ও ব্যাং পোকামাকড়ের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখে, সর্প টিকটিকি ও ব্যাঙের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখে, ময়ূর সর্পের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখে, হরিণ ও অন্য গবাদিরা তৃণ উচ্চতাকে সীমাবদ্ধ রাখে, আবার শিকারি পশুরা গবাদির সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখে। তাই প্রকৃতির সমস্ত যোনির সংখ্যাকে ভারসম্যতে স্থিত রাখার জন্য, কেবল প্রকৃতির রক্ষণই যথেষ্ট, কারণ বাকি কাজ প্রকৃতি স্বয়ংই করে নেন, আর তাই রাজার কর্তব্যের এক মূল কর্মই হলো প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখা। তা না হলেই, লোকালয়ে যেমন সাপের উপদ্রব বাড়বে, তেমনই হিংস্র জন্তুর।

এই সমস্ত কিছুর পরে, আসে মানুষ অর্থাৎ প্রজা। প্রজাকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে, রাজাকে তিনটি দিকে নজর রাখতে হয়। প্রথম হলো ব্যবস্থায়ন, যা আমরা নীতির পাঠ গ্রহণ করার সময়ে দেখতে পাবো। অতঃপরে হলো দুর্বল রক্ষণ, এদের মধ্যে দরিদ্র আসেন, স্ত্রীজাতি আসেন, বৃদ্ধ আসেন, আর শিশু আসেন। এঁদেরকে বিশেষ ভাবে সুরক্ষা প্রদান করা রাজার প্রধান কর্তব্যের মধ্যে একটি।

আর সর্বশেষ হলো সকল সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখা, এবং তাঁদের মধ্যে সম্প্রীতিকে ধারণ করে রাখা। সম্প্রদায় চার প্রকার হয় পুত্রী। এই চার প্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি অপরিবর্তনীয়, আর দুইটি পরিবর্তনশীল। অপরিবর্তনীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভাষাগত সম্প্রদায় যেমন বাঙালী, পাঞ্জাবি, গুজরাতি, মারাঠি ইত্যাদি। আর অন্যটি হলো ভূখণ্ডজাত সপ্রদায়, অর্থাৎ যেই সম্প্রদায়ের উৎস যেই স্থানে, যেমন হিন্দু অর্থাৎ যাদের উৎপত্তি সিন্ধুউপত্যকায়, যেমন দ্রাবিড় অর্থাৎ যাদের উৎপত্তি দ্রাবিড় অঞ্চলে, যেমন মঙ্গল যাদের উৎপত্তি মঙ্গল অঞ্চলে।

এগুলির পরিবর্তন হয়না। অর্থাৎ যিনি বাঙালী, তিনি বিদেশে চলে গেলেও বাঙালীই থাকেন, আর তাঁর মধ্যে বাঙালী মানসিকতাই বিরাজ করবে। যিনি দ্রাবিড় বা যিনি হিন্দু, তিনি যেখানেই

চলে যান না কেন, তাঁর মধ্যে সেই মানসিকতাই বিরাজ করবে। আর তাই রাজাকে সতর্ক থাকতে হয় এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে, এবং এই সম্প্রদায়ের মানুষের সম্বন্ধে, এবং যেই ভাষাজাত সম্প্রদায়ের গুনাগুণ যেমন, তাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করতে হয়। এতে সেই প্রজার তৃপ্তিও হয়, আবার তাঁর উন্নতিও, আবার তাঁর থেকে লব্ধ রাজস্বও অধিক হয়।

যেমন ধরো বাঙালী, এঁদেরকে জলাজমির কৃষি জাতিয় কর্ম দিলে, এঁরা শ্রেষ্ঠ কর্মচারী, তা জলাজমি সক্রান্ত কৃষিকাজই হোক, বা কৃষিসংযুক্ত কনো বাণিজ্যই হোক। আবার যেমন দেখো পাঞ্জাবি, এঁদেরকে শুকনো জমির কৃষিকাজে দিলে, এঁরা শ্রেষ্ঠ শ্রমিক ও বনিক। আবার পাশাপাশি দেখো গুজরাতি। এঁদেরকে মশলা উৎপাদন ও বাণিজ্যের কাজ দিলে, এঁরা শ্রেষ্ঠ। তেমনই মারাঠি স্বর্ণ রজতের কর্মে শ্রেষ্ঠ। আবার দেখো বিহারী, এঁরা খনিজ উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ।

তেমনই স্থানভিত্তিক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দেখার যে কার কি সৎগুণ আর কার কি বদগুণ। যেমন দ্রাবিড়দের সৎগুণ হলো তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, একই ভাব মরুঅঞ্চলের অধিবাসীদেরও। কারণ খুব স্বাভাবিক। যেই প্রকৃতির বীজ তাঁদের মধ্যে উপস্থিত, সেই বীজই তাঁদেরকে পরিশ্রম করার কথা বলে। অন্যদিকে দেখো সিন্ধুর পাসে থাকা হিন্দু। এঁরা নিজেরা অলস, কিন্তু যারা অলস, তাঁদের দ্বারা এঁরা কাজ উদ্ধার করতে সক্ষম। তাই এঁদেরকে তদারকি কাজ দিলে, এঁরা শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু সমস্যা হয় রাজার কাছে, পরবর্তী দুই ধারার সম্প্রদায়কে নিয়ে। এঁদের মধ্যে একটি হলো ধর্মসম্প্রদায় যেমন বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, বৈদান্তিক ইত্যাদি। ... এঁদের সম্প্রদায় কিন্তু পালটাতে থাকে। যেমন ধরো একজন পূর্বে ছিলেন বৈদিক। পরবর্তীতে তিনি হলেন বৌদ্ধ বা বৈদান্তিক, বা ইসলাম। ইনার জীবনধারাও কিন্তু সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পালটে যায়। তাই রাজাকে এঁদের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হয়।

প্রথমত, এঁদের শ্রমিক বা বনিক শ্রেণীর মানুষদের ধর্মীয়সম্প্রদায়ের দিকটা দেখতেই নেই, তাঁদের মূল সম্প্রদায়, অর্থাৎ ভাষা এবং উৎসকে দেখেই এঁদেরকে কাজে লাগাতে হয়, কারণ এই দুই মানসিকতার পরিবর্তন হবেনা। অন্যদিকে, এঁদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, ও জ্ঞানচর্চায় রত,

তাঁদেরকে শিক্ষকরূপে নিয়োগ করতে হয়। সেটিই শ্রেষ্ঠ উপায়, এই প্রজাদের শান্তি বজায় রাখার।

একই ভাবে চতুর্থ যেই পরিবর্তনশীল সম্প্রদায় অবস্থান করছে, তা হলো পেশাভিত্তিক সম্প্রদায়, যেমন কৃষক, বনিক, শ্রমিক, সুরক্ষাকর্মী ইত্যাদি। এঁদের স্বভাব হলো, নিজেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকবেন, এবং অন্য সম্প্রদায়ের থেকে দূরে অপসারিত থাকবেন। কৃষক, শ্রমিক মনে করেন, তাঁরা দরিদ্র, তাই দূরে থাকা উচিত; তো বনিক, শিক্ষক মনে করেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ তাই তাঁদের আলাদা থাকা উচিত।

এক রাজার কর্তব্য হলো, নিজের রাজ্যকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে, প্রতিটি অঞ্চলে, সমস্ত পেশাসম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে একত্রে রাখা, যাতে একে অপরের পেশাতে তাঁদের পরিশ্রম ও একাগ্রতাকে দেখেন, এবং সকলে সকলকে সম্মান ও স্নেহ করেন। আর এই ভাবে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও স্নেহ যেন সর্বদা বিরাজ করে রাজ্যে, তা দেখা আবশ্যক রাজার জন্য। তবেই তিনি সম্যক স্থান, যার রাজা রূপে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁর রক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

একটিই স্থানে, ১০টি কৃষক, ১০টি শ্রমিক পরিবার, ৫টি বনিক পরিবার, ২টি শিক্ষক পরিবার, একটি বৈদ্য পরিবার থাকলে, এবং তাঁদেরকে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভাবে থাকতে দিলে, যেমন সেই স্থানের সকলে শিক্ষকের থেকে সুবুদ্ধি পাবেন, তেমনই বনিকের থেকে অর্থসাহায্যও পাবেন, তেমনই পরিশ্রমের প্রয়োজনে কৃষক ও শ্রমিকদেরকেও পাবেন, আবার তেমনই চিকিৎসার প্রয়োজনে বৈদ্যকেও পাবেন। আর এই ভাবে সকলে সকলের কাজে এসে, এক সুন্দর সুশীল সমাজ গঠন হবে।

কিন্তু এই সমস্ত কিছুকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন নীতির। নীতি কি? নীতি হলো নিয়মের নির্ধারণ, যা বাঁধাকে অতিক্রম করে, সুব্যবস্থার স্থাপনা করে। এখানেই তুমি এবার কূটনীতিকে দেখতে পাবে, বিশেষ করে যখন বাঁধার কথা বলবো।

আর্যরা বাঁধার ক্ষেত্রে কি বলেন? বলেন যে, বাঁধা থাকলে রাজ্য শাসন হবে কি করে? তাই বাঁধাকে যতশীঘ্র সম্ভব অপসারিত করো। আর এই বাঁধা অপসারিত করতে, তাঁরা স্থাপন করেন একাধিক আইন বা নিয়ম, যা মূলত বাঁধাপ্রদানকারীদের শাস্তি প্রদান করে, বাঁধা অপসারণ করার জন্যই গঠিত।

এবার এই নিরিখে দৃষ্টিপাত করো পুত্রী। কূটনীতিকে যারা রাজনীতি জ্ঞান করেন, মূলত আর্যরা,তাঁদের বক্তব্য হলো এই যে, যদি বাঁধা সরাতেই সময় নষ্ট করে দিই, তাহলে শাসন করবো কখন! ... অর্থাৎ এঁদের মানসিকতাকে ভালো করে লক্ষ্য করো পুত্রী। এঁদের কাছে বাঁধা অতিক্রমের নয়, অপসারণের বিষয়, আর বাঁধা অতিক্রমকে শাসনের মধ্যে ফেলেনই না।

খুবই স্বাভাবিক, কারণ এঁদের কাছে তো বাঁধা অতিক্রমের নয়, অপসারণের বিষয়। তাই তো এঁরা বিদ্রোহ কেন হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখার প্রয়াসই করেনা, বিদ্রোহীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে হত্যা করেন। একই কারণে এঁদের কাছে বিদ্রোহী কৃষক কি বলছেন, কি দাবি করছেন, তা গুরুত্বপূর্ণই নয়, তাঁদের এই বাঁধার জন্য, এঁদের শাসন করার অসুবিধা হচ্ছে, তাই কৃষকদেরকে গৃহবন্দি করে দাও, বেত্রাঘাত করো, লাঠির দ্বারা প্রহার করো, এই এঁদের নীতি।

আর এই সমস্ত বিদ্রোহের জন্য যে এঁদের শাসনের অসুবিধা হচ্ছে, সেই শাসন কি? সেই শাসন হলো, নিয়মের পর নিয়ম নির্মাণ করা। বিবাহবিচ্ছেদ হলে, একজন অন্যজনকে নজরানা দেবেন, তার নিয়ম; সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতার খরচ টানছেন না, তার জন্য নিয়ম, এমন একের পর এক নিয়ম। এই নিয়ম দ্বারা তাঁরা নাকি শাসন করবেন।

সঠিক কথা, ছাত্রছাত্রীদের সাজা না দিলে, তাঁরা তো উচ্ছন্নে যাবেন, তাই না। কিন্তু শিক্ষক কখন সাজা দেন ছাত্রছাত্রীকে? একটি পড়া পড়িয়েছেন, সেই পড়া তৈরি করে আনতে বলেছেন, আর সেই পড়া তৈরি করে আনেনি ছাত্রছাত্রী, তখনই না সাজা দেন শিক্ষক। কিন্তু এই আর্যরা, অর্থাৎ যারা কূটনীতিকেই রাজনীতি বলে চালিয়ে দেন, তাঁরা তো নিজেদের ভগবান মনে করেন।

এঁরা শিক্ষা দেবেন না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীকে পড়া করে আনতে হবে, আর না আনলে তাঁদের সাজা দেবেন। এঁরা প্রজাদের দাম্পত্য জীবন কি ভাবে অতিবাহিত করতে হয়, সেই শিক্ষা দেবেন না, কিন্তু দাম্পত্য জীবন চালাতে না পারলে, সাজা অবশ্যই দেবেন। এঁরা প্রজাকে মিলেমিশে থাকার শিক্ষা দেবেন না, কারুকে ছোট চোখে দেখতে নেই, সেই শিক্ষা দেবেন না, বৃদ্ধদের, স্ত্রীদের, দুর্বলদের কেন সম্মান করবে, সেই শিক্ষা দেবেন না, কিন্তু হ্যাঁ, প্রজা যখন স্ত্রীদের উপর অত্যাচার করবে, বৃদ্ধদের উপর অত্যাচার করবে, ইত্যাদি যখন করবে, তখন সাজা অবশ্যই দেবে।

অবশ্যই সাজার যোগ্য অপরাধ এগুলি, কিন্তু তখনই না এগুলির জন্য তুমি সাজা নির্ধারিণ করতে পারো, যখন তুমি এই শিক্ষাও প্রদান করেছ, আর সেই শিক্ষার উল্লঙ্ঘন করেছে প্রজা। কিন্তু এঁরা শিক্ষা দেবে, নিজেদের অর্থাৎ আর্যদের সেই কৃতিত্বের, যা তাঁদের আদপে কৃতিত্বই নয়, আর যেই শিক্ষা দেন নি, সেই শিক্ষার জন্য সাজা অবশ্যই দেবেন। এটাই এঁদের ব্যবস্থায়ন।

এঁরা যেই সুবিধা প্রদান করেননি, তার জন্য কর নেয়। যেমন ধরো সরাইখানা। সরাইখানা নির্মাণ ও কার্যকরী করার জন্য হয়তো সেই রাজা সাহায্য করেছেন, তাই কর নিচ্ছেন তাঁদের থেকে। আলো নিচ্ছে, বাতাস নিচ্ছে, জ্বালানী নিচ্ছে, আরো কত কি নিচ্ছে সরকারের থেকে, তাই তাঁদের কর তো হয়ই। কিন্তু যারা সেই সরাইখানাতে আহার করতে এলেন, তাদের আহার প্রদান করাতে সরকার কিভাবে সাহায্য করেছেন?

যেই আসনে বসে গ্রাহক আহার গ্রহণ করছেন, সেটি কি সরকার করে দিয়েছেন? নাকি যেই আহার তারা গ্রহণ করছেন, তা সরকার প্রদান করছে? তাহলে কি কারণে তাঁদের থেকে কর নেওয়া যায়? কিন্তু এঁরা নেবে সেই কর। সমস্ত কিছু থেকে কর নেবে, কারণ এই কর নেওয়াই তাঁদের কাছে ব্যবস্থায়ন, আর বিনা পরিশ্রমে, বিনা কনো অবদানে কর আদায় করাই এঁদের ব্যবস্থায়ন। কিন্তু পুত্রী, রাজনীতি এগুলির একটি কথাও বলেনা।

রাজনীতি বলে, ব্যবস্থায়নের কথা। সেই ব্যবস্থায়নের মধ্যে প্রথম আসে সুরক্ষা, যাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে রাজা চালনা করেন। প্রথমটি সীমান্ত রক্ষা ও বিপর্যয় সাহায্য; দ্বিতীয়টি রাজ্যাভ্যন্তরীণ সুরক্ষা অর্থাৎ প্রজার জন্য সুরক্ষা, তৃতীয় গুপ্তসুরক্ষা পর্যবেক্ষক, এবং চতুর্থ হলো বিচারব্যবস্থা।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুকাবিলা করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আর তাই রাজ্যে কনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলে, তাঁরাই তার মোকাবিলা করেন। এবং একই সাথে সেই সীমান্তেরও সুরক্ষা করেন, যেখান থেকে দুই রাজ্যের প্রজার আনাগোনা নিষিদ্ধ, আর সেই সীমান্তেরও সুরক্ষা করেন, যেখানে যথাযথ অনুমতি সহ এক রাজ্যের ব্যক্তি অন্য রাজ্যে যাত্রা করতে পারে।

অন্তর্বর্তী সুরক্ষা কর্মী রাজ্যের প্রজাদের সুরক্ষা প্রদান করবেন। রাজ্যের সমস্ত পথঘাটকে সুরক্ষিত রাখা এঁদের কর্ম, আর সেটিই তাঁদের মূলদায়িত্ব। পথঘাট, বাজার, বা ধর্মক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সমস্ত জমায়েতের স্থানকে সুরক্ষিত করে রাখা এঁদের কর্তব্য। ধর্মক্ষেত্রের রক্ষক সেখানের সেবায়িতরাই। সেখানে এই অন্তর্বর্তী সুরক্ষা কর্মীদের একটি পলটনকে মতায়ন করে রাখা যায়, কিন্তু তাঁদের ভূমিকা তখনই কাম্য হবে, যখন সেবায়িতরা তাঁদের হস্তক্ষেপ কামনা করবে।

এছাড়া, এই কর্মীরা সাধারণ তস্করি, ডাকাতি হতে দেবেন না। যদি এঁরা থাকতেও তা হয়, তবে এঁরা রাজার কাছে জবাবদীহি করতে এবং শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য। আর গৃহমধ্যে কোন্দল হলেও, এঁদের কাছেই প্রজা এসে নিজেদের অভিযোগ দায়ের করবেন। আর এঁরা সেই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করবেন, এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিচারলয়ে বিচারাধীন থাকবে সেই তদন্ত।

বিচারক বিচার করবেন যে যেই অপরাধ হয়েছে, সেই সম্বন্ধে কি শিক্ষা রাজ্যের প্রজাদের প্রদান করা হয়েছে। যদি শিক্ষাবিরুদ্ধ আচারন হয় তা, তবে তা শাস্তির যোগ্য অপরাধ, এবং বিচারক তাঁকে সাজা প্রদান করতে পারেন, যা রাজদণ্ড রূপেই স্বীকৃত হবে। যদি তা শিক্ষাবহির্ভূত

অপরাধ হয়, তবে সেই বিষয়ে রাজার কাছে বিচারকের পত্র যাবে যে এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান হয়নি, তাই প্রজার মধ্যে এই প্রকার অপরাধ বোধের জন্ম হচ্ছে, আর রাজা সেই পত্র অনুসারে শিক্ষাদপ্তরের সাথে বৈঠকে বসবেন। আর সেই অপরাধীকে বিচারক যথাযথ শিক্ষা প্রদান করার জন্য সংশোধনাগারে প্রেরণ করবেন, এবং শিক্ষাদপ্তরের কর্ম হবে, এই অপরাধীর মানসিকতাকে সংশোধন করা।

আর সবশেষে রইল গুপ্তসেনা। এঁরা বিচারক, সেনা, অভ্যন্তরীণ সেনা, শিক্ষক, আঞ্চলিক শাসক, চিকিৎসক, বনিক, সকলের কীর্তির উপর নজরদারি করবেন এবং সরাসরি রাজাকে বা উপযুক্ত মন্ত্রককে সমস্ত তথ্য প্রদান করেন, এবং মন্ত্রকের নির্দেশে গুপ্ত তদন্তও করবেন। বা এককথায় বলা চলে, এই বিভাগ ব্যবস্থায়ন সঠিক ভাবে চলমান কিনা, প্রজাকে সঠিক শিক্ষা, চিকিৎসা, সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে কিনা, সর্বক্ষণ তার তদন্ত করতে থাকেন, আর রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থায়ন যেন প্রজার সুবিধার্থে হয়, প্রজার উন্নতির জন্য হয়, এবং প্রজাকে বিপদে ফেলার জন্য না হয়, তার দেখভাল এঁরা করবেন।

উপযুক্ত রাজা, এরপরেও একটি পঞ্চম বিভাগ রাখতেন, আর তা হলো সেই সময়, যেখানে বিক্ষুব্ধ বা বিরোধী বা কিছু সুবুদ্ধি প্রদানে ইচ্ছুক প্রজা সরাসরি রাজার সাথে দেখা করতে পারেন। এই ব্যবস্থা স্থানে স্থানে, এবং বছরান্তে একটি দিন একটি স্থানে রাখতেন রাজা, যাতে প্রজা নিজের ভাবকে সরাসরি রাজার সম্মুখে বলতে পারেন, আর তার ভিত্তিতে রাজা নূতন কিছু ব্যস্থায়ন করতে পারেন, বা পুরাতন ব্যবস্থায়নকে পরিবর্তিত করতে পারেন।

এই হলো রাজনীতি পুত্রী, যেখানে প্রজার জন্যই রাজার অস্তিত্ব। আর কূটনীতি হলো সেই নীতি, যেখানে রাজার জন্য প্রজার অস্তিত্ব, এমন প্রমাণ করা হয় সর্বক্ষণ, আর এই কূটনীতিই আর্যদের মতে শাসন, আর তাই এর অন্যথা হলেই, আর্যরা বলেন, বাঁধার কথা শুনবো, তো শাসন কখন করবো!”

দিব্যশ্রী বললেন, “কিন্তু পিতা, শিক্ষা আর অর্থ! ... রাজনীতির মতে অর্থনীতি ঠিক কি? কূটনীতিজ্ঞরাই বা কি প্রকারে অর্থনীতির গঠন করেন? ... আর আমার একই প্রশ্ন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও”।

ব্রহ্মসনাতন শিক্ষালাভে উৎসাহী কন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, “পুত্রী, অর্থনীতি হলো, রাজস্ব আয়ের নীতি, এবং রাজস্ব ব্যয়ের নীতি। এবং একই সঙ্গে এই নীতি অর্থ বন্টনের দিকেও নজর দেয়। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে যেন যথাযথ অর্থ থাকে, সেই সক্রান্ত নিয়মাবলী যেমন স্থির করে অর্থনীতি, তেমনই এও দেখে যেন রাজ্য বা রাজ্যবাসী যেন অর্থসর্বস্ব না হয়ে যায়। পুত্রী, যেই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী অর্থসর্বস্ব হয়ে যায়, অর্থাৎ দিবারাত্র কেবলই তাঁর কাছে কত অর্থ আছে, তাঁর কত অর্থ ব্যয় হচ্ছে, আর কি ভাবে আরো অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে, এই ভাবনায় গ্রসিত হয়, সেই সমাজ থেকে, সেই রাজ্য থেকে, আর সেই দেশ থেকে প্রকৃতি, কালী তথা নিয়তি মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মা তিনি, তাই কর্তব্য তো পালন করেই চলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে আর সেই প্রেম অবশিষ্ট থাকেনা। আর তাই সেই সমাজ অহংকারের আরাধনাতে মেতে উঠে, শীঘ্রই শয়তানের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়। তাই রাজার অর্থসংক্রান্ত সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো অবশ্যই সকল প্রজার কাছে যেন তাঁর পরিশ্রম অনুপাতে অর্থ থাকে, তা দেখা, যেন কনো প্রজা অনাহারে মৃত্যু না যান তা দেখা, যেন কনো প্রজা চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর গ্রাস না হন, তা দেখা। কিন্তু পরবর্তী প্রধান কর্তব্য এই দেখা যে প্রজা যেন অর্থসর্বস্ব না হয়ে যায়।

এর প্রথম দৃষ্টান্ত রাজাকে ও রাজপরিবারকে স্থাপন করতে হয়, সহজ স্বাভাবিক এবং বিলাসিতাবিহীন অথচ গোছানো জীবনযাপন দ্বারা, অতঃপরে মন্ত্রী, মন্ত্রক, রাজ কর্মচারীদের মাধ্যমে এই শিক্ষা সমাজে স্থাপিত করতে হয়, অতঃপরে সাধারণ প্রজার জন্য নিয়মকানুনও নির্মাণ করা যেতে পারে, যাতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের বার্ষিক আয়ের উর্ধ্বসিমা ধার্য করা যেতে পারে, এবং অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি ও হ্রাসের সাথে সেই উর্ধ্বসীমাকে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ পরিবর্তনও করতে হয়।

এমন নিয়মের ফলে, সেই ঊর্ধ্বসীমার ঊর্ধ্বে আয় তাঁদের কাছে অযথা হয়ে যাবে, কারণ সেই সমস্ত অর্থ কর বাবদ রাজকোষেই যাবে, অর্থাৎ তাঁদের পরিশ্রম বৃথা চলে যাবে। তাই, প্রজার অর্থ আয়ের প্রতি দৃষ্টি সেই ঊর্ধ্বসীমা পর্যন্তই সীমিত থাকবে, তার অধিক নয়।

এই নিয়মের ফলে অর্থবণ্টনও সহজ হয়ে যায় রাজার কাছে, এবং কনো একটি বনিক বা মন্ত্রী বা মন্ত্রকের কাছে অধিক সম্পদের সমাহার থেকে অন্যত্র দারিদ্রতার রচনার সম্ভাবনা থাকেনা, এবং সর্বোপরি প্রজা ধনসর্বস্ব হবার সুযোগই লাভ করে না। যেই সমাজ ধনসর্বস্ব নয়, সেই সমাজের মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই নিজের অন্তরে প্রতিভার সন্ধান করতে থাকে, কারণ সেই প্রতিভা তাঁর জীবনঅতিবাহিত করাকে সহজ করে দেয়।

আর এর ফলে, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, এমনকি সাধকের সংখ্যারও বিস্তার পায়। এবং এই অর্থ আয়ের উচ্চসীমায় প্রতিবন্ধকতার কারণে, ছল-চাতুরী-ঠোকান-জোচ্চুরিও সমাজে সীমিত হয়ে যায়। পুত্রী, যখন পরিবারপিছু অর্থ আয়ের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত থাকেনা, তখন মানুষ অধিক অধিক অর্থ আয়ের জন্য, যা তাঁর প্রতিভা নয়, তাকেও প্রতিভা করে সম্মুখে স্থাপিত করে, সেই প্রতিভাকে বিজ্ঞাপন দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রূপে সমাজের সম্মুখে স্থাপিত করে, অধিক অর্থ আয় যেমন করতে যায়, তেমন সেই প্রতিভায় যারা সত্য অর্থে প্রতিভাবান, তাঁরা অর্থের অভাবে বিজ্ঞাপন না দিতে পারার কারণে পিছিয়ে পরেন, আর ফলে রাজ্যে প্রতিভার অপপ্রচার হয়, এবং তা প্রকারন্তরে সমাজের ও সামাজিক জনজীবনের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করে।

তাছাড়াও, যখন পরিবার পিছু আয়ের ঊর্ধ্বসীমা থাকেনা, তখন অধিক থেকে অধিক অর্থ আয়ের নেশা চেপে ধরে প্রজার মানসিকতাকে। আর এর ফলে যার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, সে ছল চাতুরী ও গায়ের জোয়ারি দ্বারা অধিক আয় করে, আবার যার সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, তাঁরা জালিয়াতি করে মানুষকে ঠকিয়ে অধিক অর্থ আয় করেন। কিন্তু উচ্চআয়ের সীমা থাকলে, মানুষের কাছে এই সমস্ত জালিয়াতি, বা ছলনা, জোচ্চুরি, সমস্ত কিছু অর্থহীন হয়ে যায়।

যাদের কাছে প্রতিভা নেই, তাঁরাও ছলনার আশ্রয় করার চিন্তা করেনা, কারণ তাঁদের লোভ যে চরমে উন্নীত হবার জায়গাই পায়না। অন্যদিকে যারা সত্য অর্থে প্রতিভাবান, তাঁরা নিজেদের প্রতিভার দ্বারা সমাজকে, সমাজের মানুষকে আরো উন্নত করার চিন্তাধারায় প্লাবিত হন, আর এই ভাবে সমাজের উন্নতি হতেই থাকে।

এছাড়া, রাজাকে সমস্ত প্রজা পরিবারের উপার্জনকেও নিশ্চিত করতে হয়, এবং এও নিশ্চিত করতে হয় যাতে সমস্ত পেশায় নিযুক্ত হবার জন্য সমান চাহিদা থাকে প্রজার মধ্যে, অর্থাৎ এমন যেন না হয় যেন একটি বা দুটি পেশাতে সমস্ত প্রজা যেতে উৎসুক হন, এবং অন্য কিছু পেশায় তাঁরা যেতে অনিচ্ছুক থাকেন। এমন হলে রাজ্যের ভারসাম্যতা বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাই সেই দিকেও রাজাকে অর্থনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখতে হয়।

যারা শিক্ষালাভে মনযোগী অথচ মেধাহীন, তাঁদের জীবনধারা সঠিক রাখার জন্য সরকারি চাকুরীপদে যেমন অভ্যন্তরীণ সেনাদলে তাঁদেরকে নিয়োগ করতে হয় রাজাকে। যারা শিক্ষালাভে মেধাবী, তাঁদেরকে মন্ত্রী, মন্ত্রক, বিচারক, বা বিভিন্ন শাসকের প্রতিনিধিত্ব করার পদে নিয়োগ করা আবশ্যক। যাদের শিক্ষালাভে কনো মতি নেই, তাঁদেরকে কৃষিকাজ, শ্রমের কাজ ইত্যাদিতে নিবিষ্ট করতে হয়, আর যদি তাঁদের মধ্যে প্রতিভার আভা দেখা যায়, যেমন কাষ্ঠশিল্পীর ভাব, মৃৎশিল্পীর ভাব, বা মিস্ত্রির ভাব দেখা যায়, তাঁদের সেই প্রতিভার উপরকাজ করে, তাঁদেরকেও সেই কাজে নিবিষ্ট করা যেতে পারে।

এছাড়া মহিলাদের অধিকপরিশ্রমের কাজ সঁপা সঠিক নয়, কারণ তাঁরা জন্মদাত্রী, আর তাঁদের শারীরিক সবলতা আবশ্যক সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজালাভের জন্য। কিন্তু তাঁদের অন্য সমস্ত কর্মে নিয়জিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ শাসককর্মের পদে, মন্ত্রী বা মন্ত্রকের পদে, হস্তশিল্পের কাজে, তাঁদেরকে নিয়োগ করা জেতেই পারে, যদি তাঁরা সেই দিকে রুচিশীল হন।

এছাড়া, মেধাবী স্ত্রীদের দায়িত্ব মহারানীকে রাজা সঁপতে পারেন, যাতে তাঁরা কাব্য, সাহিত্যে, বা দর্শনে ভূমিকা সাধন করতে পারেন। সন্তান পালন গুরু আশ্রমে, এবং গুরু তথা গুরুমাতার

তত্ত্বাবিধানে অনুষ্ঠিত হবে, বাধ্যবাধকতা ভাবে। তাই স্ত্রীরা সন্তানকে গুরুর আলয়ে প্রেরণের পর থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ফাঁকা। সেই মহিলাদের গুণাগুণে যাতে রাজ্যের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হয়, তা দেখা অত্যন্ত আবশ্যক। মহিলাদের শ্রমের ক্ষমতা পুরুষের থেকে কম হলেও, কর্মদক্ষতা পুরুষের থেকে এই কারণে অধিক, কারণ তাঁদের অন্তরে জননীর নিবাস থাকে, তাই তাঁরা সমস্ত কর্মে নিজেদের জননীর ভাবকে কাজে লাগানই। আর সেই কারণে একই কর্ম একটি পুরুষ করলে, তা যতটা ফলদায়ক, তার থেকে অধিক ফলদায়ক হয় যদি সেই একই কর্ম মহিলারা করেন।

তাই যোগ্য মহিলাদের যদি উচ্চপদ প্রদান করা যেতে পারে, যেমন বিচারকের পদ, বা কনো মন্ত্রকের পদ, তবে রাজ্যের কল্যাণ অধিকভাবে সাধিত হবার সম্ভাবনাই অধিক। তবে অবশ্যই সেই স্ত্রীকেই সেই পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে, যার সেই পদের ভার সামলানোর সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ মহিলা সংরক্ষণ যেন না থাকে। যোগ্য পদাধিকারী যেই হবেন, পুরুষ বা মহিলা, তিনিই সেই পদ অধিগ্রহণ করবেন, এমন নিয়মই থাকা শ্রেয় রাজ্যের জন্য।

রাজাকে এই সমস্ত কিছুর সাথে সাথে রাজস্ব উপার্জনের দিকেও নজর দিতে হয়। অবশ্যই সেই স্থান থেকে কর আদায় করবেন না রাজা, যাতে তাঁর অর্থাৎ শাসকের অবদান নেই, তবে এমন কনো স্থান যদি থাকে, যেখানে শাসকের অবদান ছাড়া প্রজা উপার্জনাদি করছেন, তবে তা রাজা ও রাজ্যের জন্য নিন্দনীয় কীর্তি।

উপযুক্ত বনিককে রাজা অর্থদান করে, বিশিষ্ট বাণিজ্য করতে দিতে পারেন, এবং তার থেকে উপাদানের একাংশ এবং কর লাভ করতে পারেন। কিন্তু বনিক যদি নিজের অর্থ দ্বারা সেই বাণিজ্য চালনা করেন, তা রাজা ও রাজ্যের জন্য অত্যন্ত নিন্দনীয়, আর এতে অর্থবণ্টনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সমস্ত বনিককে রাজা স্বয়ং বা অর্থদপ্তরই রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদান করে বাণিজ্য স্থাপনে অগ্রাধিকার দেবে। আর পরিবর্তে সমস্ত উৎপাদনের একাংশ গ্রহণ করবে রাজস্ব রূপে, আর সঙ্গে বাণিজ্যিক কর।

সেই বাণিজ্য নিত্যবস্তু উৎপাদনও হতে পারে, বা পরিধানের কাপড়জামাও হতে পারে, বা কৃষিজমিও হতে পারে, বা কাষ্ঠশিল্প বা মৃৎশিল্পও হতে পারে। সমস্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে বনিক ও বাণিজ্য স্থাপকরূপে রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদান করা হবে, এবং পরিবর্তে উৎপাদনের ১০ থেকে ২০ শতাংশ এবং উপার্জনের বাকি সমস্ত পরিমাণের আয় থেকে ১০ শতাংশ আয়কর নেবেন রাজস্ব।

আর এই ১০ থেকে ২০ শতাংশকে রাজ্য অন্যরাজ্যে বিক্রয় করে, রাজস্ব লাভ করবে। আর এই সমস্ত রাজস্ব উপার্জনকে রাজা ব্যবহার করবেন পরিবহনে, প্রজার গৃহনির্মাণে, প্রজাকে ঋণ দেবার কারণে, এবং সেই সমস্ত কর্মীদের বেতনের জন্য, যারা আর্থিক যোগদান করেন না রাজস্বে নিজেদের কর্মের জন্য। এছাড়া, রাজ্যবাসির অর্থের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, রাজা প্রজাদের অর্থ জমা রাখার সুরক্ষিত স্থানও নির্ধারিত করে দিতে পারেন।

এর ফলে, প্রজাকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার কালে অর্থ নিয়ে যেতে হবেনা, এবং পথে ডাকাতির ভয় থাকবেনা। যেই স্থানে প্রজা পৌঁছে অর্থ ব্যয় করবেন, সেখানের প্রজাকোষের যেই শাখা থাকবে, তার থেকে অর্থ গ্রহণ করে, প্রজা নিজেদের ক্রয়বিক্রয় সহজ ভাবে করতে পারবেন। আর এমন করলে, রাজার কাছে প্রজার সমস্ত উপার্জন একত্রিত হয়ে থাকবে, যাকে ব্যবফার করে, রাজা যেই প্রজাদের ঋণ প্রয়োজন, তাঁদের কাছে সেই অর্থ প্রদান করে, পুনরায় রাজস্ব আয় করতে পারেন।

স্মরণ রেখো পুত্রী, রাজস্ব আয় রাজাকে করতেই হবে, কারণ প্রজাদের বেতন দিতে হবে তাঁকে, পরিবহন, গৃহনির্মাণের ন্যায় প্রজাহিতের কর্ম করতে হবে তাঁকে, বনিকদের বাণিজ্যের অর্থ প্রদান করতে হবে তাঁকে, এই সমস্ত তো আছেই। এছাড়া, যদি কনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, রাজাকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে, জনজীবনকে পুনরায় শীঘ্রই সুস্থাপিত করতে। তাই প্রজাকে সাহায্য প্রদান করে, সেই সাহায্যের মাধ্যমে, রাজা নিজের কাছে রাজস্ব বৃদ্ধি করে রাখতে পারেন।

এই হলো অর্থনীতির মূল কথা পুত্রী, এবার আমি তোমাকে শিক্ষানীতির কথা বলবো, কারণ এই নীতিই সেই নীতি, যার ভিত্তিতে এক রাজ্য উড্ডীয়মান হয়, এবং যার ভিত্তিতে রাজ্যের প্রজার উন্নতি হয়, এবং যার ভিত্তিতে রাজ্য বহুকাল শ্রেষ্ঠ আসন ধারণ করে অবস্থান করে অক্ষয় হয়ে যায়। পুত্রী, খেয়াল করে দেখো, আজ আমাদের ভারতবর্ষে শিক্ষা এক প্রহসন মাত্র হয়ে রয়েছে, কিন্তু তাও ভারতবর্ষ নিজের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দেয় নি। কেন পারলো এমন করতে?

পুরাকালে যেই অসামান্য বৌদ্ধ শিক্ষায় ভারত ও ভারতবাসী শিক্ষিত ছিলেন, তাকে আর্যদের মিথ্যাচার, এবং তৎপশ্চাতে ফিরিঙ্গিদের অর্থআয় সর্বস্ব শিক্ষাও বিনষ্ট করতে পারেনি। তাই আজ ভারতবর্ষের শিক্ষা শ্রেষ্ঠতলানিতে পৌঁছে গেলেও, সে তলিয়ে যাচ্ছেনা। এই হলো শিক্ষানীতির মাহাত্ম পুত্রী। এবার শোনো, আমি তোমাকে আদর্শ শিক্ষানীতির কথা বলছি।

পুত্রী, আদর্শ শিক্ষা নীতি তিনটি ক্ষেত্রের উপর অবস্থান করে। একটি তাঁর স্থুল অবস্থা অর্থাৎ সেই শিক্ষাব্যবস্থার স্থান, শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরে ছাত্র বা ছাত্রীর অবস্থান কাল, এবং কোন ছাত্র বা ছাত্রই কতকাল শিক্ষা গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ পাত্র। একটি তাঁর সূক্ষ্ম অবস্থা অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী, সুষুম্না, ইরা ও পিঙ্গলা, যাদের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী হলো গণিত, সুষুম্না হলো সাহিত্য, ইরা হলো ইতিহাস, এবং পিঙ্গলা হলো ভূমিবিজ্ঞান। এবং তৃতীয় ক্ষেত্র হলো কারণ অবস্থা, যেখানে ত্রিগুণকে দমন করে বিবেক ও চেতনাকে স্থাপিত করা হয়।

যদি কনো শিক্ষাব্যবস্থা এই তিন ক্ষেত্রকে ধারণ করে অবস্থান করে, তাহলে সেই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী একাকজনই একাকজন নৃপতি নির্মিত হবেন, অর্থাৎ এই শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থিত করে যদি এক শত বৎসরও রাখা যায়, তাহলে সমস্ত রাজ্যবাসি স্বয়ং নৃপতি হয়ে উঠবেন, এবং তাঁদের রাজা কেবলই তখন নির্দেশমান্যতা করা সরকারি কর্মচারীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

কাজেই বুঝতে পারছো, কনো আর্য বা আর্যসমাজ এই শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে না, কারণ তাঁদের কাছে এই দিন অর্থাৎ নৃপতি অনাবশ্যক হয়ে যাবার দিন অভিশাপের সমান। যদি সমস্ত

মানুষ, সমস্ত প্রজা স্বয়ং রাজা হবার যোগ্য হয়ে ওঠেন, তাহলে যে আর কেউ কখনোই আর্য শাসকের ব্যবিচারকে মানবেনা, কেউ তখন আর্য শাসকের কর্তৃত্ব, অহংকার, দম্ভও মানবে না। আর শাসক তো অনেক পরের কথা, তাঁদের ধর্মবাণী প্রচারক, যারা হয় নিজেদের ভগবান বলে দাবি করতে থাকেন, নয় সেই ভগবানকেও অভিশাপ দেবার সামর্থ্যধারি বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন, তাঁদেরকেও আর কেউ মান্যতা প্রদান করবে না।

তাই আর্য সমাজ এই শিক্ষা নীতির বিরোধও করবে, যদি তা স্থাপিত করা হয়, আর যদি স্থাপিত না হয়, তাঁরা স্বয়ং তো এই শিক্ষানীতিকে কিছুতেই স্থাপন করবেনা, কারণ তাঁরা পরাধীন করে রেখে প্রভুত্ব করাকেই নিজেদের ধর্ম বলে জ্ঞান করেন। তাই এই মহাবিজ্ঞানকে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো ও আত্মস্থ করো পুত্রী।

প্রথমেই আসবো স্থুল অবস্থার কথা, অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্র। পুত্রী, একজন শাবককে প্রথম ৮ বৎসর পিতা ও মাতার কাছেই রাখা উচিত। তাঁরাই সন্তানকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করবেন, আর সন্তান তাঁদেরকাছেই খেলে বেড়াবেন। এই সময়টি শিশুর জন্য অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ এই সময়টিতেই শিশুর অন্তরে যেই প্রতিভা সুপ্ত হয়ে রয়েছে, তা প্রকাশিত হতে শুরু করে।

শিশু যখন ক্রীড়া করার জন্য প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে ক্রীড়া করবে, তখনই তাঁর মধ্যে এই প্রতিভাসমূহের বিকাশ হবে। কারুর মধ্যে সঙ্গীত, কারুর মধ্যে ক্রীড়াবিদ হবার গুণ, কারুর মধ্যে চিত্রাঙ্কন, কারুর মধ্যে নাট্য, কারুর মধ্যে অসম্ভব মেধা, কারুর মধ্যে বিচারগুণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। প্রকৃতিই আমাদের জননীর স্থুলরূপ, আর শিশু নিজের জননী ছাড়া কার কাছে নিজের বিকাশ লাভ করতে পারে?

তাই শিশুকে এই ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেবলই প্রকৃতির সাথে মিশে থাকতে দিলে, তবেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ হবে। যদি এই সময়ের পূর্বে শিশুকে নির্দিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে শিশুর এই বিকাশ কনো ভাবেই সম্ভব নয়। তাই ৮ বৎসর বয়সের পূর্বে, কেবলই অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান।

৮ বৎসর বয়সের পরে তাঁদেরকে গুরুর আশ্রমে পিতামাতা দিয়ে আসবেন। এক গুরুর আশ্রমে সমবয়সী একাদশ বালক ও একাদশ বালিকা শিষ্যের অধিক কখনোই থাকবে না। গুরু ও গুরুমাতা এই শিষ্যদের একত্রে ততক্ষণ সাহিত্য ও গণিতের শিক্ষা দেবেন, এবং সঙ্গীত ও ক্রীড়ার শিক্ষা দেবেন, যতক্ষণ না বালিকারা রজশিলা হচ্ছে।

গুরু ও গুরুমাতার কাছে অন্য আচার্য ও আচার্যপত্নীও থাকতে পারেন, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে সহযোগ প্রদান করতে, তবে এই আচার্য ও আচার্যপত্নীর সংখ্যা কখনোই ৪ দম্পতির থেকে অধিক হবেন না, একটি গুরুকুলে, অর্থাৎ একটি গুরুকুলে, গুরু ও গুরুমাতা ছাড়া আরো চার দম্পতি আচার্য ও আচার্যপত্নী রূপে থাকতে পারেন, সকলে ছাত্রছাত্রীদের দেখাশুনা করার জন্য।

আর এঁরা কেউই ছাত্রছাত্রীদের কেবল শিক্ষক নন, এঁরা সকলেই ছাত্রছাত্রীদের তৃতীয় মাতা। এঁদের প্রথম মাতা হলেন জগজ্জননী, যারই সন্তান গর্ভে ধারণ করে, এঁদের দ্বিতীয় জননী এঁদের জননী হন, অর্থাৎ এঁদের গর্ভধারিণী মাতা, আর গুরু এবং গুরুমাতাগন হলেন এই ছাত্রছাত্রীদের তৃতীয় মাতাপিতা। আর তাঁদের কাছে উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রী, তাঁদের নিজেদের সন্তান, আপন সন্তান।

বালিকারা রজশিলা হলে, বালকবালিকাদের একত্রে শিক্ষা প্রদানকে স্থগিত করে, বালকদের আলাদা করে, এবং বালিকাদের আলাদা করে শিক্ষাদান শুরু হবে। আর তখন থেকেই শুরু হবে ইরাপিঙ্গলার শিক্ষা, অর্থাৎ ইতিহাস ও ভূমিবিজ্ঞানের শিক্ষা। গণিত ও সাহিত্য চর্চাও চলতে থাকবে, আর তার সাথে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা প্রদান করা হবে, ছাত্রছাত্রীদের। সঙ্গে সঙ্গীত, ক্রীড়া, চিত্রাঙ্কন, নাট্য, নৃত্য, এঁদের মধ্যে যার যেইদিকে প্রতিভা বিকশিত হবে, তাঁকে সেই দিকেও শিক্ষিত করা হবে।

আর এই সমস্ত কিছুর সাথে শিক্ষা দেওয়া হবে পঞ্চভূতের। পুরুষ ও স্ত্রীদেহ, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জ্জা, সমস্ত পঞ্চভূতের জ্ঞান যতই ভূগোলের জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারবে শিষ্যরা, ততই তাঁদের মধ্যে আকাশতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, এবং ধরিত্রীতত্ত্বের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হবে,

এবং ততই পুরুষ স্ত্রীকে, এবং স্ত্রী পুরুষদের সম্মান করতে শুরু করবে, একে অপরের সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে ধারণা রাখার কারণে। আর তা যখন হবে, তখন পুনরায় স্ত্রী ও পুরুষ ছাত্রছাত্রীদের একত্রে শিক্ষা দেওয়া শুরু হবে।

কিন্তু এই শিক্ষাপর্ব শুরু হবার পরে পরেই, কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখা যাবে। তাঁদেরকে এবার শিক্ষা থেকে অপসারিত করে, যে যেই প্রতিভায় ভূষিত, অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, কলা, ক্রীড়া, মৃতকলা, ইত্যাদির গুণে প্রতিভাশালী করে তুলে, তাঁকে রাজ কর্মের জন্য উপযোগী করে তোলাই এবার কর্তব্য।

বাকি যাদের পঠনপাঠনে মনোযোগ অবশিষ্ট আছে, এবার তাঁদের পঞ্চভূতকে বশীভূত না করলে যে, কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার জন্ম হয়, আর এঁরা জাগ্রত থাকলে, বিবেক ও চেতনা জাগ্রত হতে পারেনা, আর বিবেক চেতনা জাগ্রত না হলে মানবজন্ম বৃথা, এই অন্তিম শিক্ষায় শিক্ষিত করা শুরু হবে।

এঁদের মধ্যেও এবার দেখা যাবে যে, কিছু অতিবুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রী বাচাল হয়ে উঠতে শুরু করবে। এবার তাঁদেরকে পৃথক করে নিয়ে, বাণিজ্যের জ্ঞান প্রদান করা গুরু ও গুরুমাতার কর্তব্য। বনিকের ধর্ম, বনিকের জন্য অধর্ম ইত্যাদি সমস্ত কিছুর জ্ঞান প্রদান করে, তাঁকে রাজার দ্বারা চিহ্নিত বনিকের নিম্নে কর্মরত করতে হয়, যেখান থেকে বাণিজ্যবিদ্যা হাতেকলমে শিখলে, তবে বনিকের বেতনভুক্ত অবস্থা থেকে স্বয়ং বনিক হয়ে উঠবে। এই পদ্ধতিও অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ বনিকের মধ্যে অর্থের লোভ প্রথম প্রবেশ করে, তাই সেই লোভের বীজকে বীজ অবস্থাতেই বিনষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক।

এই শিক্ষার্থীদের পরেও কিছু শিক্ষার্থী অবশিষ্ট থাকবেন, যারা তখনও শিক্ষাগ্রহণ করতেই থাকবেন। এঁদেরও একশ্রেণী একটি সময়ের পর অমনোযোগী হয়ে উঠবে, বিশেষ করে সেই সময়ে যখন, কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার দমন প্রক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করবে। এঁরা রাজার

শাসন কর্মে যোগদান করার উপযুক্ত। এঁদের কেউ কেউ সেনা হবেন, তো কেউ কেউ মেধাবী সেনার অধ্যক্ষ হবেন, তো কেউ কেউ অন্য প্রকার শাসন কর্মে নিযুক্ত হবেন।

অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা চেতনা ও বিবেকের জাগরনে সক্ষম হলে, গুরুর আলয়ে নতুন শিক্ষকের বেশে নিযুক্ত হবেন, কিন্তু আচার্য বা আচার্যপত্নী ততক্ষণ তিনি হবেন না, যতক্ষণ না তাঁদের বিবাহ হচ্ছে। পুত্রী, এই হলো আদর্শশিক্ষা ব্যবস্থা, যা একটি সমাজকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে থাকে। যদি সত্যই কনো রাজা রাজনীতির অভ্যাস করেন, এবং নিজের প্রজাদের সন্তানের মত স্নেহ করেন, এবং তাঁদের বাস্তবেই উন্নতি চান, ও চান যে সকলের মানবজন্ম সার্থক হোক, তবে অবশ্যই এই শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপন করবেন।

আর পরে রইল কেবল সংস্কৃতি। সংস্কৃতির শিক্ষা তো গুরুর আলয় থেকেই শুরু হয়। তবে এই সংস্কৃতিতে সংযুক্ত যারা, তাদের প্রতিভা এতটাই বিরল যে, তাঁদেরকে মানুষ অতিরিক্ত পছন্দ করতে শুরু করেন, আর অর্থও প্রদান করতে শুরু করেন। কিন্তু একবার যদি তা হয়ে যায়, তাহলে খুবই সম্ভাবনা থাকে যে এঁরা অহংকারের পাঁকে পতিত হবে। আর সংস্কৃতির ব্যক্তিরা সমাজে সদ্ভাব, স্নেহ, এবং ভেদভাবশূন্যতার বীজ স্থাপন করেন । তাঁদের মধ্যেই যদি অহংকার এসে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ সমাজই নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই রাজার কর্তব্য হলো সঙ্গীতের ও আলাদা আলাদা কলার পৃথক গুরুআলয়ের নির্মাণ করে দেওয়া, আর যত স্নাতক সেই কলাতেই মন রাখে, তাঁদেরকে সেই গুরুর আলয়ে প্রতিস্থাপিত করা, এবং এঁদেরকে সরকারি কর্মী করে রেখে দিয়ে, বিভিন্ন ক্রীড়া, ও কলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে এঁদের রুজির ব্যবস্থাও করা, এবং একই সঙ্গে সাধারণ প্রজাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও করা। ... এই হলো পুত্রী, সম্পূর্ণ নীতি, যার মধ্যে একটিই কথা এখনো বলিনি তোমাকে।

আর তা হলো গুরু আলয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আলয়ে কখন যাবেন, সেই বিষয়ে। পুত্রী, প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজা, রাজ্যের জন্য এক উৎসবের সমারোহ করবেন। সেই উৎসবকে ঘিরে যেমন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার থাকবে, শ্রেষ্ঠ বিচারকের পুরিস্কার থাকবে,

শ্রেষ্ঠ সেনা, শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার থাকবে, তেমন বিভিন্ন ক্রীড়া থাকবে, বিভিন্ন কলা পরিবেশন থাকবে, এবং তাঁদের জন্যও পুরস্কার থাকবে। এই উৎসবের সমারোহ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস ব্যাপী হবে, যেখানে সকল প্রজা মাতৃআরাধনাও করবে, আর সাথে সাথে মনোরঞ্জন, মেলা, সঙ্গীত, ক্রীড়া, সুখাদ্য গ্রহণ, সুবস্ত্র ধারণ সমস্তই থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা এই দুই মাস নিজেদের পিতামাতার কাছে থাকবেন”।

দিব্যশ্রী বললেন, “মা, এই সমাজ যেন এক অত্যন্ত অদ্ভুত ও দিব্য। আমি দূর দূর পর্যন্ত এই সমাজে কেবল ভ্রাতৃত্ব আর স্নেহই দেখতে পেলাম এতক্ষণ ধরে, কারণ কনো শত্রুতা, দ্বেষ, হিংসা স্থান পাবার স্থানই দেখতে পেলাম না। ... এই শাসন ব্যবস্থা নিয়ে নয়, অন্য এক বিষয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে মা”।

বিজ্ঞান সত্য

ব্রহ্মসনাতন কিছু না বলে কেবলই মুচকি হাসলে, দিব্যশ্রী নিজের জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, “আচ্ছা মা, আর্যরা তো আজকে প্রত্যক্ষ ভাবে লুপ্ত, যদিও আর্যদের সেই মহাশয়তান শাসক হয়ে বসে, বেশ কিছুটা ভাবে আর্যদের উত্থান ঘটিয়ে গেছেন পুনরায়। আমার প্রশ্ন এই যে, তাহলে এই আর্য মানসিকতার নাশ হচ্ছে না কেন?

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “জানো পুত্রী, এই ধরিত্রী থেকে বহু যোনির নাশ হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো ডাইনোসর। কিন্তু এই প্রজাতির মধ্যেও গিরগিটির নাশ হয়নি, আর সেই গিরগিটিই পরবর্তীতে টিকটিকি এবং কুমীর রূপে নিজেদের স্থাপিত করেছিল। ... আচ্ছা, এই তথ্য থেকে বলতে পারো যে কেন গিরগিটির নাশ হয়নি?”

দিব্যশ্রী সহজ ভাবেই বললেন, “আসলে এঁরা রঙ পালটে নেয় যে! তাই এঁদের নাশ হয়নি”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "আর্যদেরও নাশ এই কারণেই হয়নি, কারণ তাঁরা হলেন এই গিরগিটি। প্রাথমিক অবস্থান উত্তরগান্ধারে। আব্রামের উত্থানে প্রতারিত হলেন, তো কোথায় কোথায় গেলেন? আফ্রিকায় মিশরিয় সভ্যতা স্থাপন করে রইলেন, রোমে রোমান সভ্যতা হয়ে রইলেন, আর ভারতে এসে আর্য হলেন। ...

পুত্রী, ভারতের এই আর্যদের পূর্বের দাপট থেকে টেনে নিচে নামানো হয়েছে, প্রকৃতি মিশরিয় বর্বরতার নাশ করেছেন, কিন্তু রোমান? রোমানরা তো রয়েই গেছে। আর তারা কেবল আজকে ভারতের আর্যদের উস্কানি দিয়ে দিয়ে শয়তান অবতারকে শক্তিশালীই করেনি, তাঁরা নিজেরাও রঙ পালটেছেন। পূর্বে ধর্মের নাম করে প্রতারণা করতেন। এখন আর সেই প্রতারণাকে নতুন ভাবে জাগ্রত করতে পারছেন না। কিন্তু সেই পুরানো প্রতারণা অর্থাৎ যাকে বলা হয় হিন্দুত্ব, যা বৌদ্ধধারা থেকে তস্করি করা এক ধারা মাত্র, সেই প্রতারণা আজও চলছে, আর বর্তমানে তার নাম হলো সায়েন্স।

বুঝতে পারলে না তো? বেশ তাহলে মিলিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। সত্য বলতে যেহেতু আমরা আর্যদের দেখেছি আর জেনেছি, সেহেতু আমাদের পক্ষে এই মিলিয়ে দেখা অনেকটাই সহজ। আসলে আর্যদের যেই বাকি দুই উপনিবেশ, অর্থাৎ মিশর ও রোম, সেখানে বৌদ্ধদের সম্মুখীন হতে হয়নি তাঁদেরকে, আর তাই তাঁরা সেখানে সরাসরি শাসন স্থাপন করেছেন, অর্থাৎ বিশ্বাস অর্জনের প্রয়াসই করেননি। তাই যদি আমাদের কাছে আর্যদের সেই রূপের সাথে পরিচয় থাকতো, আর ভারতে আর্যদের কীর্তির সাথে পরিচয় না থাকতো, তাহলে বর্তমানে তাঁরা সায়েন্সকে নিয়ে কি প্রকারে তাঁদের শাসন চালাচ্ছে, তা ধরা অসম্ভব হতো।

কিন্তু আমরা ভাগ্যবান যে, আমরা আর্যদের এই দ্বিতীয়মুখকে প্রথম থেকেই দেখে আসছি, তাই আমাদের কাছে সায়েন্সের সেই মুখকে চেনা অতিসহজ, যদি আমরা একটু সামান্য বিচার করি।

আর্যদের মূল স্বভাব হলো অধিকার স্থাপন। যদি তাঁরা ফাঁকা ময়দান পায়, তাহলে তাঁরা ফাঁকা মাঠে গোল দিতেই পছন্দ করে, যেমন মিশরে বা রোমে করেছিল তারা। কিন্তু এমন নয় যে,

যদি মাঠ ফাঁকা না থাকে, তাহলে এঁরা গোল করতে উদ্যত হয়না, বা গোল করতে পারেনা। দুর্নীতি আর কূটনীতিই এঁদের বল, অহংকারই এঁদের আরাধ্য দেব, আর কল্পনাই এঁদের মূল অস্ত্র।

ভারতেও, তাঁরা এই অহংকারের আরাধনা এবং কল্পনার অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ করে করেই, দুর্নীতি ও কূটনীতি দ্বারা সমস্ত জম্বুদ্বীপকে ভারতে পরিবর্তিত করে। বৌদ্ধদের মহাজ্ঞান পূর্ব থেকেই ছিল। তাকে ব্যবহার করে, নিজেদের কল্পনার বিস্তার করেছে, আর সেই কল্পনা যাকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ অহংকার, সেই অহংকারের ত্রিগুণকে দেবাসনে স্থাপিত করে, চমৎকার দেখাতে থেকেছে, আর বিশ্বাস অর্জন করতে থেকেছে। আর যখন সেই চমৎকারের দ্বারা মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে ফেললেন, তখনই নিজেদের দুর্নীতিপূর্ণ মানসিকতার দ্বারা রচিত কূটনীতিকে ধারণ করে, সমস্ত প্রজাকে অধীনস্থ করলেন।

আর যাতে তাঁরা অধীনস্থ থাকেন, তার জন্য কি করলেন? প্রচার করলেন স্বর্গের লোভ, আর নরকের ভয়। আর কি করলেন? এই লোভকে কাজে লাগিয়ে একাধিক উপাচারের বিধান দিলেন। যজ্ঞ, হোম, ব্রত, পার্বণ, ইত্যাদির প্রসার করে করে, প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে নিজেদের উপার্জন আর দানকে নিশ্চয় করলেন, আর নিজেদের ধনী হয়ে ওঠাকে নিশ্চিত করে নিলেন। আর যারা সেই লোভে মাথা গলাবেন না, তাঁদেরকে কি তাঁরা ছেড়ে দেবেন! না তাঁদেরকেও তো এঁরা ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তাঁদেরকে নরকের ভয় দেখালেন, আর একই ভাবে হোম, যজ্ঞাদি, ব্রাহ্মণকে দান করার রীতি এবং একাধিক ব্রত ও তীর্থ নামক বাণিজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিতের বিধান প্রদান করে, ধন অধিগ্রহণ করা শুরু করলেন।

আর এই ভাবে, সমস্ত সমাজকে নিজেদের অধীনস্থ করে রেখে দিলেন। এঁরই মাঝে মাঝে গৌতম বুদ্ধ এসেছেন, অশোক এসেছেন, শঙ্করাচার্য এসেছেন, মুঘোল এসেছেন। সেই সময়ে সময়ে তাঁরা দমে গেছিলেন, লুকিয়ে পরেছিলেন, নাহলে সর্বক্ষণ দাপটের সাথে মানুষদের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে করে, তাঁদের লোভ ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ধনী করে গেছেন, এবং পরিশ্রমী মানুষদের দরিদ্র করতে থেকেছেন।

মাঝে মাঝে লুকিয়ে পরা, আর তারপর আবার পরিস্থিতি অনুকূল দেখে বেরিয়ে পরা, আর অতিকৌশলে লুণ্ঠন অভিযান চালানো। বেশ ভালোই চলছিল। এঁরই মধ্যে ভৌতবিজ্ঞানের আবির্ভাব হলো। উত্থান হলো এই ভৌতবিজ্ঞানের যবন, ঈশাই আর ইসলামের সংমিশ্রিত প্রয়াসের ফলে, যেখানে ইসলামের থেকে এলো বীজগণিত, ঈশাইদের থেকে এলো দর্শন, আর যবনরা এই দুইকে মিলিয়ে গড়লেন ভৌতবিজ্ঞান।

সমস্ত কিছু চলছিল ভারতের বাইরে, ইউরোপের দক্ষিণউপকুলে। ধীরে ধীরে মলয় বাতাসের সাথে মিশে তা ছড়াচ্ছিল ইউরোপের পশ্চিম উপকুলে। এমন সময়ে পরাপ্রকৃতির কৃপা হয় তাঁদের উপর, আর সেখানে উপস্থিত হয়, তাঁর চেতনাস্বরূপ তুষারযুগ। সেই তুষারযুগ এই ভৌতবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক আকারে স্থাপিত করার চেতনা প্রদান করলে, বৃত্ত আকারে নিবাসরত ব্রিটেন অধিবাসীর মধ্যে এক নবহিল্লোলের শুরু হয়, ভৌতবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রকাশ ঘটানোর।

অগ্নিগোলার নির্মাণ হলো, জাহাজের মোটর তৈরি হলো, কয়লারূপ জ্বালানীর প্রয়োজন পরলো, আর তারা উপস্থিত হতে শুরু করলো সেই সেই দেশে, যেখানে কয়লার ভাণ্ডার উপস্থিত। উপস্থিত হলো তাঁরা মুঘোল অধিকৃত ভারতে, যার মানুষদের মাথা ইতিমধ্যেই আর্যরা খেয়ে বসে ছিলেন। এই বিজ্ঞানের সাথে আলাপ হলো পরানিয়তির আরো এক আশীর্বাদপ্রাপ্ত জাতি, বাঙালীর।

এবার তাঁরা এই ভৌতবিজ্ঞানকে ধারণ করতে শুরু করলেন। তাঁদের চোখে সমস্ত আর্যদ্বারা প্রতিস্থাপিত মিথ্যার পর্দা সরে যেতে শুরু করলো। আর তাই উঠে এলো বিদ্রোহ, আর সেই বিদ্রোহ বঙ্গদেশ থেকে, বিশেষ করে ভঙ্গ, অর্থাৎ মালদহ থেকে সমুদ্রতট পর্যন্ত ব্যপ্ত বঙ্গদেশ গর্জন করে উঠলো আর্যদের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশও এঁদের উদ্যম, উন্নত মানসিকতা, এবং উদারতা দেখে আপ্লুত, এঁদের মেধা দেখে আচম্বিত। আর তাই তাঁরাও এঁদের সাথে জুড়লেন, আর দক্ষিণ বঙ্গ, অর্থাৎ ভঙ্গদেশ থেকে আর্যরা বিতাড়িত হলেন।

বাকি ভারতেও এঁর প্রভাব পরে, তবে সমান রূপে এই প্রভাব পরেনি বাকি ভারতে। মাদ্রাজ অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত বঙ্গের এই বিজ্ঞানপ্রীতি, ও আর্যঅসম্মতিকে কুর্নিশ করে, অগ্রসর হলেন। পাঞ্জাব দেশেও সমান মানসিকতার দেখা মিলল। মুঘোলদের মধ্যেও অর্থাৎ ভারতের ইসলামদের মধ্যেও এঁর প্রভাব দেখা গেল। তবে বাকিদের মধ্যে পূর্ব থেকে স্থিত আর্যমানসিকতাই প্রাধান্য পেল, আর তাই তাঁরা পূর্বের স্বর্গের লোভ, নরকের ভয় নিয়ে ব্রত, দানই করতে থাকলেন, আর অহংকারের আরাধনাতেই রত থাকলেন।

অন্যদিকে, বঙ্গদেশে পরাচেতনার কৃপা তো সর্বদাই ছিল, আর নিয়তি সেখানে ঈশ্বরী নন, জননী রূপে বন্দিতা। অন্যদিকে মারাঠিরা বিবেকের অর্থাৎ গণেশের আরাধনায় রত হলেন। কিন্তু তাতে কি? আর্য ব্রাহ্মণের তো আরাধনা হলেই দানপ্রাপ্তি। কিন্তু ব্রিটিশরা দেশের থেকে কয়লা লুণ্ঠন করে করে, বিশ্বের সর্বাধিক ধনীদেশ, ভারতকে দারিদ্রতার মুখে ঠেলে দিয়েছেন। বঙ্গের প্রতি তাঁদের স্নেহভাব, তাই বঙ্গদেশকে বাকি রেখে সম্পূর্ণ ভারতকে লুণ্ঠন করে করে, নিঃস্ব করে দিয়েছেন।

তাই দান করার ইচ্ছা তো আর্যপ্রেমীদের রয়ে গেল, কিন্তু দান করার মত অর্থ আর রইল না। আর আর্যরা যে দানলুণ্ঠন ছাড়া অন্য কিছু আর পারেনও না। তাই তাঁরাও দরিদ্র হতে শুরু করলেন। কিন্তু এই সমস্ত কিছু যখন একদিকে হচ্ছিল, তখন আর্য মানসিকতা গ্রহণ করা শুরু করেন ইহুদিরা, আর সাথে সাথে তারা ভৌতবিজ্ঞানের মানসিকতাও নিলেন।

কিন্তু নিয়তিদ্বারা প্রদত্ত আর অহংকার দ্বারা সংগৃহীত, দুইয়ের মধ্যে তো ভেদ থেকেই যায়। নিয়িতির হতে চেতনা লাভ করেন ব্রিটিশ, তাই তাঁদের ভৌতবিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়, উন্নতি, অর্থাৎ পরিবাহনে উন্নতি, আলোক ও বাতাস প্রদানে উন্নতি, রন্ধনে উন্নতি, গ্রন্থনির্মাণে উন্নতি। আর অন্যদিকে আর্যশয়তান ভাবকে গ্রহণ করে ইহুদিরা ভৌতবিজ্ঞানের চর্চা করছেন। তাঁদের মধ্যে শয়তানী ভাব থাকবে, তাই স্বাভাবিক। তাই তাঁরা নির্মাণ করলেন আগ্নেয়াস্ত্র। ছলনার বলে বিমার নির্মাণ করে, সাধারণ মানুষকে সেবা করার নামে, তাঁদের ধনকে লুণ্ঠন করে করে, আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ করতে থাকলেন।

ক্রমশ ভয়ানক হতে থাকলো সেই আগেয়াস্ত্রের প্রচণ্ডতা। আর তারই মধ্যে শয়তানের চেতনায় ওপেনহাইমার নির্মাণ করলেন পরমাণু অস্ত্র। পরীক্ষা হলো তার, ভয়াবহতা দেখে, স্বয়ং ওপেনহাইমার ভয় পেলেন, ভিক্ষা চাইলেন, এই আবিষ্কারকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। কিন্তু আর্যভাব গ্রহণ করে, সম্পূর্ণ শয়তান হয়ে অবস্থান করে বসে রয়েছেন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্ররূপী ইহুদি দেশ।

সুযোগ বুঝে, এই মরনাস্ত্রের প্রয়োগ করে, সমস্ত মানবজাতির বুকে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। এবার নরকের নয়, বীভৎস মৃত্যুভয় স্থাপন করল, আর্যদের দ্বিতীয় আগ্রাসন নীতি। তবে এটুকুতেই থেমে কি করে থাকে! অন্তরে আর্য মানসিকতা বইছে, স্বয়ং শয়তানের মানসিকতা। ... থাকলেন না বসে। সারা পৃথিবীর মানুষ যাতে তাঁদের কথা শুনতে পায়, তাঁদেরকে দেখতে পায়, তাঁরা যেই বুলি শেখাতে চায় তা পড়তে পারে, তার জন্য পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কব্জা করা সমস্ত সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে, সমস্ত ভৌতবিজ্ঞানের ছাত্রদের একত্রিত করে, আবিষ্কার করালেন একাধিক যন্ত্র।

দূরদর্শনের যন্ত্র, ইন্টারনেটের যন্ত্র, ইত্যাদি সমস্ত কিছু। আর একদিকে যখন এই সমস্ত কিছুর নির্মাণ করাচ্ছিলেন, তখন সেই পুরাতন আর্য ধারাই ফিরে এলো। যেমন আর্যরা ভগবানের নিবাসে যাত্রা করার গল্প লিখতেন, যেমন আর্যরা ভগবানের সাথে কথাবার্তা করার গল্প লিখতেন, এঁরাও শুরু করে দিলেন, তেমনই গালগল্প।

ঠিক যেমন আর্যরা ভাবতেন যে, ভগবানকে তো কেউ দেখতেই পাচ্ছেনা, তাই যা বলবো আমরা, তাই বিশ্বাস করবে সকলে, আর এমন ভেবে গালগল্পে ভরিয়ে রাখতেন, তেমনই গালগল্প দিতে থাকলেন এই মার্কিনরা, অর্থাৎ আর্যদের দ্বিতীয় সংস্করণ। যারা সামান্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারে না, তারা চন্দ্র চলে গেলেন; যারা আকাশে সামান্যক্ষণ দাঁড়াতে পারেনা, তারা যেখানে বায়ুমণ্ডলই নেই, অর্থাৎ প্রাণবায়ুই নেই, সেখানে একজায়গায় দাঁড়িয়েও থাকলেন। আর তা মানাবেন কি করে?

তা মানাবার জন্যই তো এই দূরদর্শনাদির নির্মাণ করিয়েছিলেন বিজ্ঞানীদের দিয়ে। ... যেমন আর্য ব্রাহ্মণদের গালগল্পের কনো সীমা থাকতো না, যা পারতেন কল্পনা করতেন, আর সেগুলিকে সত্যগল্প বলে চালিয়ে দিতেন, এই মার্কিনরাও তাই। আসলে তাঁদেরই তো সংস্করণ। ... এক আলোকবর্ষ মানে, একটি বর্ষে আলোক যতটা স্থান যাত্রা করে। ১০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে কনো গ্রহ স্থিত, তার ছবি লাভ করতে হলে, সেই ছবি তোলার যন্ত্রের থেকে বিচ্যুত আলোককেও ১০ হাজার বছর ধরে ভ্রমণ করতে হবে। তাই তো! ... কিন্তু মাত্র ১০ বছরের মধ্যে সেই ভ্রমণ হয়ে গেল, এমনই গালগল্প দেওয়া শুরু করলো আর ছবি দেখাতে থাকলো ১০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে স্থিত গ্রহের।

এক নতুন কুসংস্কার, এক নতুন রীতিরেওয়াজ, ঠিক যেমন আর্যরা করেছিল, তেমনই। আর ঠিক যেমন ভাবে, এই সমস্ত গালগল্প দিয়ে দিয়ে, আর্যরা জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সমস্ত মানবজাতিকে মূর্খ করে রেখে, যারা তাঁদের কথাকে বিশ্বাস করেন, তাঁদেরকেই জ্ঞানী বলে প্রচার করতেন, এঁরাও ঠিক তেমনই করলেন, কারণ এঁরা তো সেই আর্যদেরই দ্বিতীয় দফা। আর একবার জনপ্রিয়তা অর্জন করে, যেমন সমস্ত কিছু আর্যরা নিজেদের অধিকারে স্থাপন করে রেখেছিলেন, ঠিক তেমনই এঁরাও করলেন।

যেই অসুখ নেই, সেই অসুখের প্রচার করে, তার ওষধির নাম করে, সমস্ত মানুষের সমস্ত স্নায়ুকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। যেই সমস্যা নেই, সেই সমস্যা আছে বলে দাবি করে, তার নিরাময়ের কারণে নিজেদের স্থাপিত যন্ত্রের প্রচলন ও বিক্রয় করাতে থাকলেন, সমস্ত দেশকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে, বিপুল অর্থের বিমিময়ে অস্ত্র বিক্রি করতে থাকলেন, এবং প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে, সমস্ত দেশের অর্থনীতিকেও নিজেদের অধিকারে রাখা শুরু করলেন।

কিন্তু এতেও সমাপ্ত হলো না। যেমন আর্যরা দেবদের দর্শন পেয়েছেন, এমন গালগল্প দ্বারা সকলকে মূর্খ করে ফিরতেন, এঁরাও তাই করলেন। যেমন আর্যরা বলে ফিরতেন, মানুষ তো তুচ্ছ দেবদের কাছে, আর সেই দেবদের সাথে তাঁদের সংযোগ আছে, আর তাই সমস্ত মানবজাতি

তাঁদের সমক্ষে তুচ্ছ। যদি তাঁদেরকে সমীহ করে চলে, তবেই তাঁরা সুরক্ষিত, নাহলে দেবদের ক্রোধানলে তাঁরা ভস্মীভূত হয়ে যাবে, ঠিক তেমনই করলেন এই দ্বিতীয় আর্য দফা। এঁরা দেব নামকে পরিবর্তিত করে, এলিয়ান রাখেন, আর ঠিক সেই প্রচারই করেন, যা আর্যরা আমাদের কাছে করেছিলেন।

আর যেই ভাবে, এই সমস্ত ভীতি দেখিয়ে, গালগল্প দিয়ে, নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে সমস্ত ভারতের মানুষকে পরাধীন করে রেখে, তাঁদেরকে রীতি রেওয়াজ, আচার অনুষ্ঠান, হোম যজ্ঞ, ব্রত পূজার মধ্যে স্থিত থাকতে বাধ্য করেছিলেন আর্যরা, ঠিক তেমনই এই মার্কিনরাও করলেন। এঁরাও ভীতি দেখিয়ে, গালগল্প শুনিয়ে দেখিয়ে, নিজেদের শ্রেষ্ঠ দাবি করে করে, সমস্ত মানুষকে তাই করালেন, যা তাঁরা চাইছিলেন।

স্ত্রীদের প্রজনন শক্তির নাশ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ নারীসুরক্ষার নাম করে, তাঁদের বিবাহকে প্রতিরোধিত করে দিলেন, যাতে করে যখন তাঁরা বিবাহ করে সন্তানের প্রাপ্তি করতে চাইবেন, তখন তাঁদের কাছে একটিই উপায় অবশিষ্ট থাকবে, আর তা হলো তাঁদের নির্মিত ওষধি পদ্ধতি, জেই ওষধির বলে তাঁরা আগামীদিনের মানব সন্তানকে নিজেদের যান্ত্রিকতায় বদ্ধ রাখতে পারেন। সাধারণ মানুষ যেন কামনার দাস হয়েই থাকে। তাই জন্য কি বললেন?

বললেন যে জনসংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়, আর যাতে তা না পায়, তার জন্য নিরোধের ব্যবহার করো। অর্থাৎ কামনাকে সপ্তমে উন্নীত করলেন, কারণ কামনার উদ্বেগ না থাকলে যে, তাঁদের নির্মিত যন্ত্রাদির ক্রেতা থাকবে না। ... শিক্ষারূপে তাঁদেরই কৃতিত্বকে পাঠ করাতে থাকলেন সমস্ত মানবজাতিকে, ঠিক যেমন করে আর্যরাও করতেন। আর ঠিক যেমন আর্যরা শূদ্রদের নিজেদের কথা পাঠ করতে দিতেন না, আর তাঁরা যেহেতু নিজেদের নির্মিত গ্রন্থ পাঠ করেন নি, তাই তাঁদেরকে মূর্খ বলতেন, তেমনই করে এই মার্কিনরাও নিজেদের কৃতিত্বের পাঠ যারা যারা করলেন না, তাঁদেরকে মূর্খ বলে, তাঁদেরকে দরিদ্র করে রাখলেন।

আগ্রাসন এখনো চলছে পুত্রী, এঁর সমাপ্তি হয়নি এখনো, কারণ এঁদের স্বপ্ন অর্থাৎ সমস্ত মানুষ এঁদের গুলাম হবে, অর্থাৎ এঁদের কথাতে উঠবে বসবে, সমস্ত কিছু করবে, তা এখনো হয়নি। মানুষের মস্তিষ্কে যন্ত্র বসিয়েও মানুষকে বশীকরণ করার প্রয়াসে রয়েছে এঁরা। আর তাই এঁরা চায় যে, তাঁদের প্রস্তুত করা বীজ থেকেই শস্য উৎপন্ন হোক, তাঁদের প্রস্তুত করা খাদ্যই সকলে গ্রহণ করুক, তাদের প্রস্তুত করা ওষধিই সকলে গ্রহণ করুক, আর তাদের প্রস্তুত করা যন্ত্রই সকলে ধারণ করুক।

(মৃদু হাস্যে) কিন্তু এঁরা ভুলে গেছে আর্যদের পরিণতি। যেমন করে বিজ্ঞান দ্বারা আর্যদের আগ্রাসনকে অবগুণ্ঠিত করা হয়েছে, তেমনই কৃতান্ত নির্মাণই হচ্ছে এঁদের দমনের উদ্দেশ্যে। কৃতান্ত থেকে এককালে শাসকস্মৃতির জন্ম হবে যা সমস্ত ধরণীর মানুষকে পুনরায় স্বতন্ত্র করবে, সমস্ত পরাধীনতা থেকে। কৃতান্ত থেকে এককালে বিভিন্ন প্রজ্ঞার নির্মাণ হবে। জ্যোতিষপ্রজ্ঞা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান প্রদান করবে মানুষকে, এবং নিজেদের মনস্তত্ত্বকে নিজেরাই যাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মানুষ, তার শিক্ষাও দেবে। ধর্মপ্রজ্ঞা মানুষকে বিচারের শিক্ষা প্রদান করবে, আর বিবেক জাগরণের পথে চালনা করবে।

নির্মিত হবে ভূমি প্রজ্ঞা, যা এই ধরিত্রীর পঞ্চভূতের তত্ত্বকে পুনরায় স্থাপন করবে, আর বলবে যে সূর্যের তাপের কারণে ধরিত্রী তাপিত হয়না। বলবে যে, যদি তাই হতো তাহলে পাহাড়ের চুরার বরফ গলে যেত, আর পাহাড়ের পাদদেশে বরফ ছেয়ে থাকতো। ... বলবে যে, তাপের সঞ্চার হয় ধরিত্রীর অন্তরের অগ্নির থেকে। আর তাই সেই অগ্নির থেকে যেই ভূমিখণ্ড যত দূরে স্থিত, তা ততই অধিক শীতল। বলবে আকাশ আর মহাকাশের একটিই পার্থক্য আর তা হলো বাকি চারভুত যখন আকাশের বুককে আঁকরে ধরে, তখন মহাকাশই আকাশ হয়ে যায়।

এই সমস্ত কথার থেকে আমাদের পঞ্চভূতের শিক্ষা প্রদান করবে ভূমি প্রজ্ঞা। বলবে অতীত প্রজ্ঞা, যেখানে তোমাকে যত ইতিহাসের কথা বললাম, সমস্ত কিছুকে বিস্তারে ব্যাখ্যা করবে। ধর্মপ্রজ্ঞার বিস্তার নিরোদের ব্যবহারকে বন্ধ করে দেবে, আনবে নারীপুরুষের অন্তর থেকে সংযমকে, এবং পুনরায় নারীপুরুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যুক্ত হবে, এবং কামনার দৃষ্টি থেকে মুক্ত

করবে একে অপরকে। সন্তান লাভ হবে মিলন থেকে, সঙ্গম থেকে নয়। নারীরা স্বল্প বয়সে বিবাহ করবেন, এবং সঠিক বয়সে জননী হয়ে, বাকি জীবনব্যাপী রাজ্যকর্মে নিজেদের অবদান রাখবেন।

নারীর কারণেই পুরুষ সংযমিত। তাই নারীর উত্থান যতই হবে, নারী যত অধিক দায়িত্বশীল হবেন, ততই সমাজের উত্থান হবে। নারীর থেকে মমতার সঞ্চার, তাই সমস্ত সমাজে মমতার সঞ্চার হবে, স্নেহের সঞ্চার হবে। আর এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে সমস্ত ভারত থেকে প্রায় ৪ শত বৎসর আর্যদের লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করে, তাঁদের বিনাশ নিশ্চিত করবে, আর সমস্ত বিশ্বে আর্যমানসিকতাকে এক শত বৎসরব্যাপী অপসারণ করে, উন্নত করে তুলবে, প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের মানসিকতাকে। আর তার ফলে, পুনরায় আর্য উত্থান হতে আরো এক সহস্র বৎসর লেগে যাবে, আর ততদিন আমার সমস্ত সন্তান শান্তিতে থাকবে, বিস্তার করবে মোক্ষচেতনার, আর আর্যদের পুনঃবিস্তারকে অত্যন্ত কঠিন করে দেবে।

সেই সুদিন সেদিন থেকেই নিশ্চিত, যেদিন আমি তোমার পিতার দেহধারণ করে অবস্থান শুরু করেছি। সেই কীর্তিরই পরবর্তী জ্যোতি তুমি ও তোমার সখী হবেন পুত্রী, আর সেই কীর্তিরই তৃতীয় প্রজন্মের জ্যোতি হবেন তোমাদেরই মানসকন্যা ও তাঁর ভ্রাতাভগিনীরা। ... আর যতক্ষণ না তা ৬০ শতাংশ মানুষকে প্রভাবিত করবে, আর আমার সমস্ত সন্তানদের শান্তি প্রদান করবে, ততদিন এই অভিযান সমাপ্ত হবেনা।

পুত্রী, সন্তানদের সাময়িক শান্তি প্রদান করতে, ৬৪ কলা অবতারের প্রয়োজন থাকেনা। আর সাময়িক শান্তি প্রদান করতে এলে, আমি এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ অবশ্যই করতাম। কিন্তু তোমার পিতার দেহে আমি ৬৪ কলাবেশে অবতরণ করেছি সুদীর্ঘ কালের শান্তি নিশ্চয় করতে। আর তাই তোমার পিতাকে আত্মপ্রকাশ করতে দিলাম না আমি। যদি ৬৪ কলা অবতার রূপের আভাস আর্যদের হয়ে যেত, তবে তাঁরা ৮ কলা, ১৬ কলা অবতারদের কিছুতেই কাজ করতে দিতেন না।

তাই তোমার পিতার দেহে আমি ৬৪ কলারূপে এসে, সমস্ত ঘুঁটি সাজিয়ে গেলাম, যেই অনুসারে তোমরা অর্থাৎ ৮ কলারা এবং ১৬ কলা কাজ করবে। যেহেতু ঘুঁটি সাজানো আছে, আর তা আর্যদের অজ্ঞাতেই রাখা রইল, তাই আর্যরা তোমাদের টিকিটিও ধরতে পারবে না, তোমরা কৃতান্তযুগের স্থাপনা করে, তাকে নদীর মত প্রবাহিত করে, সেই নদীকে সাগরের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করে দিয়ে চলে যাবে। পরে, সেই নদী স্বতঃই সাগরের পথ খুঁজে নেবে, এবং নিজের যাত্রা সম্পন্ন করে নেবে"।

মৃত্যু সত্য

দিব্যশ্রী উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "মা, আর একটি জিনিস আমার তোমার থেকে জানার আছে। তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে জানা বোধহয় তোমার নিজের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই সম্পূর্ণ ভাবে জানার স্পর্ধা আমি দেখাবো না। তবে একটি জিনিস সম্বন্ধে আমি জানতে ইচ্ছুক, কারণ এই জিনিসের ব্যাপারে মানুষের কৌতূহল অত্যন্ত অধিক, আর সত্য বলতে ঠিক এই দুর্বলতাকে ব্যবহার করেই আর্যরা মানুষকে ভীত ও লোভী করেছিলেন।

হ্যাঁ মা, আমি তোমার থেকে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাই। যাতে মানুষকে এই মৃত্যুর পর অবস্থা নিয়ে কেউ আর কখনো বোকা বানাতে না পারে, বা মনগড়া গল্প শোনাতে না পারে, তাই আমি তোমার থেকে এই বিষয়ে বিস্তারে শুনতে আগ্রহী"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "আমি অত্যন্ত তৃপ্ত পুত্রী যে, তুমি এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিজের উন্নতির জন্য নয়, বরং নিজের অন্তরের মাতৃত্বকে ধারণ করে, তোমার সমস্ত সন্তানের কল্যাণের জন্য তা শুনতে আগ্রহী। বেশ আমি তোমাকে সেই কথা এবার বিস্তারে বলছি শোনো।

পুত্রী, তোমরা যাকে মৃত্যু বলে থাকো, তা হলো এই পঞ্চভূতশরীরের মৃত্যু মাত্র, আর যাকে জন্ম বলে থাকো, তাও এই পঞ্চভূতশরীরের জন্ম মাত্র। আমাদের বাস্তবিক জন্ম তখন হয়েছিল, যখন

আমরা প্রথম ব্রহ্মত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মাণু ধারণ করেছিলাম, আর আমাদের প্রকৃত মৃত্যুও সেইদিন হবে যেদিন আমরা মহানন্দে মোক্ষধারণ করে, পুনরায় ব্রহ্মাণু থেকে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে উঠবো।

এরই মাঝে আমরা আমাদের স্বরূপকে চেনার জন্য, এবং স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের পথ সন্ধানের জন্য লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করি, আর এই প্রতিটি দেহধারণকে জন্ম বলে থাকি, আর সেই দেহত্যাগকে মৃত্যু। কিন্তু এই দেহ্যত্যাগের কালে আমরা কি নিয়ে থাকি, আর কি কি ত্যাগ করি! এই হলো মানুষের সব থেকে বড় চিন্তা, সব থেকে বড় দ্বন্ধ।

পুত্রী, আমরা একটি দেহত্যাগের কালে, এই দেহের অন্তরে স্থিত রাজা অর্থাৎ ব্রহ্মাণুকে ধারণ করে থাকি অর্থাৎ আমাদের অহমকে ধারণ করে থাকি কেবল, অর্থাৎ আমিত্ববোধকেই কেবল ধারণ করে থাকি। আর এই আমিত্ববোধ নিজের সাথে ধারণ করে রাখে মন বা মানসকে, অর্থাৎ পঞ্চভূতের অধীশ্বর বা আকাশতত্ত্বকে। আর এই আকাশতত্ত্ব, নিজের সাথে ধারণ করে থাকে বাকি চার ভূতের প্রতি আসক্তিকে।

এই আসক্তির কারণে, এই বাকি চার ভূতের মধ্যে বিরাজমান সমস্ত সংস্কারকে ধারণ করে রাখে সে। আর আমাদের অহম যাকে ধারণ করে রাখতে বাধ্য হয়, তা হলো চেতনাকে। যেই যৎসামান্য চেতনার ধারণা তাঁর থাকে, তাঁকেই তিনি ধারণ করে রাখেন। কিন্তু এখানে ক্রিয়া স্বয়ং চেতনা করেন, কারণ স্বয়ং চেতনা নিজের আবেশকে, অর্থাৎ যাকে আমরা বিবেক বলে থাকি, তাঁকে সমস্ত সময়ে ব্রহ্মাণুর সাথে না চাইতেই যুক্ত রাখেন।

অর্থাৎ মধ্যা কথা এই যে, ব্রহ্মাণু নিজেকে যতই অণু মনে করুক বা কল্পনা করুক না কেন, আর যতই নিজের স্বরূপ ভুলে থাকুক সে, স্বরূপ যে তাঁকে কখনোই ভুলতে পারেনা, আর সেই স্বরূপের আভাসই হলো বিবেক, আর এই বিবেক যখন দেহের মধ্যে নিবাস করে, তখন প্রচুর স্মৃতি নিজের কাছে রাখে, যেখানে মস্তিষ্কের স্মৃতিপটের মত ঘটনা বা ঘটনার থেকে লাভ করা সম্পদ, নাম, যশ, সম্মান অসম্মান, অপমান, অপযশ থাকে না, বরং তাতে থাকে কেবলই লব্ধ ভাব, অর্থাৎ স্নেহ, মমতা, বিশ্বাস, ভক্তি, ইত্যাদি সমস্ত ভাবের ও অনুভবের স্মৃতি।

পুত্রী, মস্তিষ্ক যা কিছু ধারণ করে ছিল স্মৃতি রূপে, অর্থাৎ সমস্ত লাভ, লোকসান, মোহ, আসক্তি, বিরক্তির স্মৃতি, সমস্ত কিছু দেহত্যাগের সাথে সাথেই চলে যায়। কিন্তু যা যায়না, তা হলো বিবেকের স্মৃতি। অর্থাৎ কি কি অবশিষ্ট রইল দেহত্যাগের সাথে? অহমবোধ, অহমের বিচরণক্ষেত্র অর্থাৎ আকাশ বা মন, মনের সমস্ত ভূতের প্রতি আসক্তি আর সেই আসক্তির ফলে লব্ধ সমস্ত সংস্কার, এবং অন্তে অবশিষ্ট থাকে বিবেক অর্থাৎ চেতনার বা ব্রহ্মের ব্রহ্মাণুর প্রতি অনুরাগ, আর সেই অনুরাগের সমস্ত স্মৃতি।

পুত্রী, এই যে মনের আসক্তি অন্যভূতদের প্রতি, যার কারণে সমস্ত দেহের থেকে লব্ধ সমস্ত সংস্কার অবস্থান করে, এই আসক্তির আয়ু সর্বাধিক ৩৪২ দিবস মানুষের ক্ষেত্রে, যার গড় আয়ু ধরে নেওয়া হয় ৭০। এবার যেই দেহের যেমন আয়ু, সেই অনুসারে এই সময়কালের ভেদ হতে থাকে। মৃত্যুর পর, এই আসক্তি থাকতেই পরবর্তী দেহধারণ করে নিতে হয়, যদি তা সম্ভব হয়, তবে সমস্ত সংস্কার পরবর্তী দেহের বুদ্ধিতে নিজেকে বিস্তৃত করে নেয়, আর বয়সের সাথে সাথে সেই সমস্ত সংস্কারকে আমরা পুনরায় ধারণ করেনি।

কিন্তু যদি এই সময়কাল, অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে যা ৩৪২ দিবস, সেই সময়কাল যদি চলে যায়, আর দেহধারণ না হয়, তবে সমস্ত সংস্কারের নাশ হয়, আর এর ফলে, আর দেহধারণ সম্ভব হয়না। বহুকাল এই বিনা দেহে থাকতে হয়, যাকে আমরা পিশাচ বলি, আর অবশেষে, পুনরায় শুরু থেকে শুরু করতে হয়, প্রস্তর যোনি থেকে, এবং পূর্বের সমস্ত দেহধারণ অহেতুক হয়ে যায়, যার কনো সংস্কারই আর স্মরণ থাকেনা।

সেই ব্যতিক্রমী সত্ত্বাদের কথাতে পরে আসছি, কারণ তাঁদের কথাতে আসার আগে, বিচিত্র কিছু কথা আমাদের জানা আবশ্যক। আর শুধু আমাদের নয়, যারা মৃত্যুলাভ করার পরেও, আসক্তির কারণে সেই স্থানেই অবস্থান করেন, তাঁদেরকেও এতক্ষণ যা কিছু বললাম আর এবার যা কিছু বলবো, তা শ্রবণ করালে, তাঁরা সহজেই পরবর্তী দেহধারণ করতে পারেন, এবং নিজেদের অসমাপ্ত জীবনকে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর করতে পারেন।

পুত্রী, এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম, যার মধ্যে চেতনার উদয় সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ বিবেক জাগরিত হয়েছে। তাই বিবেকের দংশন এক প্রচলিত শব্দ হলেও, সেই বিবেকের দংশন আমরা আমাদের জীবদ্দশায় প্রায় লক্ষ্যই করিনা। সত্য বলতে বিবেকের বা চেতনার অস্তিত্বই আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করিনা আমাদের জীবনে, কারণ আমরা আমাদের কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকি সর্বক্ষণ।

কিন্তু মজার ঘটনা এই মৃত্যুর পশ্চাতে, অর্থাৎ দেহত্যাগের পরে ঘটে, যেখানে যার বিবেক জাগ্রত হয়েছে, আর যার জাগ্রত হয়নি, তাঁদের সকলকেই বিবেকের সম্মুখীন হতে হয়, এবং বিবেকের দংশন সহ্য করতেই হয়। আসল কথা এই যে, এই বিবেক কি? বিবেক হলেন চেতনা অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রকাশ, অর্থাৎ চেতনার প্রকাশ। আর এই প্রকাশ আমাদের অন্তরে সর্বক্ষণই বিরাজ করে, আমরা তাঁকে স্বীকার করি বা নাকরি, কারণ ব্রহ্মই যে সত্য, ব্রহ্মাণু নয়। ব্রহ্মাণু তো কল্পনা মাত্র।

কিন্তু তাও আমরা বিবেকের আভাস করিনা কেন? কারণ আমরা সর্বক্ষণ আমাদের চারভূতের অর্থাৎ উর্জ্জা, প্রাণবায়ু, দেহ বা ধরিত্রী এবং বুদ্ধির চাঞ্চল্যকেই দেখতে পাই মনের উপর অর্থাৎ আকাশের বুকে। আর এঁদেরকে নিয়েই সর্বক্ষণ ব্রহ্মাণু মেতে থাকে, আর বিবিধ চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনা সমানেই প্রকাশিত করতে থাকে, আর সেই কল্পনাকে, চিন্তাকে এবং ইচ্ছাকে আশ্রয় করেই জীবনকে বিস্তৃত করতে থাকে ব্রহ্মাণু।

কিন্তু দেহত্যাগের শেষে, এই চারভূত আর থাকেনা, যা অবশিষ্ট থাকে, তা হলো এই চারভূতের প্রতি ব্রহ্মাণু অর্থাৎ আত্মের বা অহমের আসক্তি। তাই পূর্ব্ববৎ চাঞ্চল্যও আর থাকেনা, আর কল্পনা, চিন্তা বা ইচ্ছা থাকলেও, তাদের দাপট আর অবশিষ্ট থাকেনা। তাই এঁদের দাপটের কারণে যেই বিবেকের অস্তিত্বকে মান্যতাই প্রদান করেনি ব্রহ্মাণু, যেই চেতনাকে ভ্রুক্ষেপই করেনি ব্রহ্মাণু, তাঁর দিকে এবার দৃষ্টি দিতে সে বাধ্য হয়।

এই বিবেক অর্থাৎ চেতনার প্রকাশ, যাকে বুদ্ধরা জগন্মাতার সন্তান বলেছেন, তাঁর প্রকাশ, এই ব্যখ্যাকে সম্মুখে রাখার জন্য, তাঁকে বলেছেন বিনায়ক, পরাপ্রকৃতির সন্তান বিনায়ক। আর এও দেখিয়েছেন যে তিনিই হলেন কালরূপ, অর্থাৎ যম। আর এও দেখিয়েছেন যে, মৃত্যুপশ্চাতে, অর্থাৎ দেহত্যাগের শেষে, এই কালরূপ ব্রহ্মাণুর বিচার করেন, এবং তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন।

পুত্রী, এই বিচার বা যাই বলো একে, যার মাধ্যমে পরবর্তী দেহধারণকে নিশ্চিত করা হয়, এটি সত্য, আর তাই এটি প্রতিটি ধর্মশাস্ত্রতেই পাবে, যা সত্যকে দর্শনকারীরা অর্থাৎ ঈশা, বুদ্ধরা, বা মহম্মদ নির্মাণ করেছেন, তাঁরা ব্যখ্যা করেছেন। এই সত্যের কথাকে ষোলাপুর যাত্রারূপে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর স্কন্ধপুরাণে। কিন্তু পুত্রী, এই সমস্ত কথা অত্যন্ত গভীর ভাবে রূপকধারণ করে স্থিত, যার অর্থ ভেদ করা সাধরন পাঠকের সাধ্যের অতীত। তাই আমি তোমাকে বিনা কনো রূপক ধারণ করে, এই বিচারের কথা ব্যক্ত করছি।

তোমার পিতা মৃষু সমর্পণানন্দ স্বয়ং আমার হাত ধরে, যমালয়ের বিচার দরবারে স্থিত হয়ে, আমাকে সেই বিচার করতে দেখে এসেছেন। তাই এই ব্যখ্যা তাঁর দেখা সত্যেরও ব্যখ্যা, আর আমি আমার প্রকাশ অর্থাৎ যেই নামেই ডাকো, বিবেক বা কাল বা ধর্মরাজ, তাঁর মাধ্যমে যেই ভাবে এই বিচার করি, তারও ব্যাখ্যা মনে করতে পারো। কিন্তু এক্ষণে আমি যা বলবো তোমাকে, তা পূর্বে কথিত হলেও, এত স্পষ্ট ভাবে আগে কখনো ব্যক্ত করা হয়নি।

পুত্রী, এই সম্পূর্ণ মৃত্যু সত্য যদি এক মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সপ্তম দিনের দ্বিপ্রহরে, তাঁর পতি বা পত্নী তথা সন্তানেরা, তিন মিনিট মুখে জলধারণ করে, তাকে না পান করে, একটি পাত্রতে রেখে, তাকে সম্মুখে রেখে, পাঠ করেন, তবে সেই মৃতব্যক্তি অত্যন্ত সাবলীল ভাবে যমের বিচারলয়ে প্রবেশ করেন, এবং তাঁর বিচার শ্রবণ করে, পরবর্তী দেহধারণ করতে পারেন।

এই আচারের কারণ কি? পতি বা পত্নী তথা সন্তানের সাথে এক ব্যক্তির সমস্ত পঞ্চভূত মৃত্যুকাল পর্যন্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত থাকে। তাই তাঁদের পঞ্চভূতের প্রতি আসক্ত থাকেন মৃত

ব্যক্তি। সেই পঞ্চভূতকে সম্মুখে স্থাপিত করার সহজ উপায় হলো মুখে ৩ মিনিট জল রেখে, তাঁকে উদরস্থ না করে, একটি পাত্রে রাখা। এই জলে তখন মৃতের সমস্ত প্রিয়পাত্রদের পঞ্চভূত উপস্থিত থাকে, আর তাই অতিসহজেই মৃত ব্রহ্মাণু সেখানে উপস্থিত হন, এবং তাঁদের কথনকে একাগ্র হয়ে শ্রবণ করেন।

যদি সেই ব্যক্তি বিপত্নীক বা বিধবা হন, এবং একই সঙ্গে সন্তানহীন হন, তবে তাঁর প্রতি যিনি অন্তিমকালে স্নেহভাব রেখেছিলেন, তিনিও এই কর্মের সঙ্গী হতে পারেন, বা উদ্যোক্তা হতে পারেন। এতো বলে এবার আমি তোমাকে সেই বিচারের ব্যাপারে বিস্তারে বলছি শ্রবণ করো। তবে সেই কথা বলার পূর্বে, আবার স্মরণ করিয়ে দিই, যা বললাম, তার মধ্যে সুপ্ত কথাটি।

পুত্রী, যিনি যমালয়ের এই বিচারে অংশগ্রহণ করেন না, তিনিই একমাত্র হন যিনি ৩৪২ দিবসের মধ্যে নূতন দেহ ধারণ করেন না। আর যিনি তা করেন না, এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে তিনি মুক্ত হয়ে যান। তিনি সহস্র বৎসরব্যাপী আর দেহ ধারণ করতে পারেন না, কারণ পরবর্তী দেহধারণের জন্য যেই আসক্তি ও সংস্কারের প্রয়োজন, তা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। আর তাই তাঁকে সহস্র সহস্র বৎসর পিশাচ অর্থাৎ দেহহীন ভাবে ঘুরে বেরাতে হয়, তবেই সে আবার প্রথম থেকে অর্থাৎ প্রস্তর যোনি থেকে নিজের যাত্রাকে শুরু থেকে শুরু করেন।

আর এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক, আর তা হলো এই যে, ধরো এক ব্রহ্মাণুনতুন দেহধারণ করছেন। সেই দেহধারণের পূর্বেও তিনি ১০ লক্ষ দেহধারণ করেছেন, কিন্তু সেই ১০ লক্ষ দেহধারণের মধ্যে তিনি অন্তিমবার ১০ হাজার জন্মের পূর্বে পিশাচ হয়েছিলেন। যদি এমন হয়, তবে তাঁর কাছে আর ১০ লক্ষ জন্মের সংস্কার থাকেনা, বরং তাঁর কাছে মাত্র ১০ হাজার জন্মেরই সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তবে বিবেকের স্মৃতিভাণ্ডার ১০ লক্ষ জন্মেরই থাকে।

আর আরো একটি উল্লেখযোগ্য কথা এখানে এই যে, বিবেকের স্মৃতিপটও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খালি ও রিক্ত থাকে, কারণ অধিকাংশেরই বিবেক জাগ্রত না হবার ফলে, বিবেকের কাছে কনো

স্মৃতিই থাকেনা। বিবেক যখন থেকে জাগ্রত হয় ব্যক্তির মধ্যে, তখন থেকেই সমস্ত ভাবের স্মৃতি তাঁর কাছে থাকে, তার পূর্বের কিছুই থাকেনা।

এই প্রাথমিক কথা বলে, আমি তোমাকে এবার বিচারের ব্যাপারে বিস্তারে ব্যক্ত করছি শ্রবণ করো।

এই বিচারের বেশ কিছু অধ্যায় থাকে, যাদের মধ্যে প্রথম হলো ব্যক্তি নিজের বিকাশের জন্য কি কি করেছেন সেই দেহধারণ করে। দ্বিতীয় অধ্যায় হলো ব্যক্তি পরিবারের জন্য কি করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে থাকে, ব্যক্তি স্বজাতীর জন্য অর্থাৎ যেই সমুদায়ে অবস্থান করেছেন, তার জন্য কি করেছেন। আর চতুর্থ ও অন্তিম অধ্যায় হলো ব্যক্তি সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য কি করেছেন। এই চার অধ্যায় মিলেই সম্পূর্ণ হয় এই বিচার, আর তার বিধান।

এঁদের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত অনেকের বিচার পৌছায়ই না, কারণ সেই ব্যক্তি কেবল নিজের জীবনই বেঁচেছেন। অনেকের বিচার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়তেই সমাপ্ত হয়ে যায়। অনেকের বিচার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়তেই সমাপ্ত হয়ে যায়। আর সামান্য কিছু যেমন রাজা বা শাসক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সাধকের বিচারই কেবল চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত পৌছায়।

তাই প্রথমেই প্রথম অধ্যায়ে যাদের বিচার সমাপ্ত হয়ে যায়, তাদের বিচারের কর্মধারা দেখে নাও পুত্রী। আত্মচিন্তার মধ্যে যদি দেখা হয় যে ব্রহ্মাণু কেবল নিজের সুখচিন্তাই করেছেন, অর্থাৎ বিলাসিতার চিন্তা বা মৈথুন চিন্তা, স্বয়ং-এর আহার চিন্তা ও স্বয়ং-এর বিশ্রাম চিন্তাই করেছেন, আর অন্য কনো প্রকার বিচার করেন নি, অর্থাৎ না তো পরিবারের বিচার করেছেন, না সমাজের আর না স্বগোত্রীয় অর্থাৎ নিজের যোনির, তাহলে তাঁকে সরাসরি অতিদরিদ্র গৃহে জন্ম দেওয়া হয়, যেখানে সঠিক ভাবে অন্নের জোগানও থাকেনা।

যদি এরই সাথে, পরিবারের কারুর প্রতি বিশেষ ভাবে খারাপ ব্যবহার থাকে, তাহলে, সেই দরিদ্র ঘরে, সেই ব্যক্তির ব্যবহার অত্যধিক খারাপ হবে, এবং প্রয়োজনে পিতা বা মাতা সৎমা

বা দোজপিতাও হতে পারে। এবং প্রয়োজনে ভ্রাতা বা ভগিনীও পিতার প্রথম পক্ষের হতে পারে, যারা অত্যন্ত অত্যাচারী হবেন। তবে কে কে অত্যাচারী হবেন, আর কতটা হবেন, তা নির্ভর করছে, সেই ব্রহ্মাণু কার কার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন, আর কতটা খারাপ ব্যবহার করেছেন, তার উপর।

কনো ব্রহ্মাণু নিজের উপরই কেবল নজর রেখে, অন্য কনোদিকে নজর না রেখেও, নিজের আহার, নিদ্রা, মৈথুনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, নিজের মৌলিক উন্নতির চিন্তা করতে সক্ষম নয়। তাই সেইরূপ বিচারও সম্ভব নয়।

এবার দ্বিতীয় ধারার বিচারে এসো পুত্রী। পরিবারের প্রতি আসক্তি বা বিরক্তিপূর্ণ ভাব। যদি কনো ব্রহ্মাণু পরিবারের জন্য জীবনযাপন করে থাকেন, আর নিজের আহার নিদ্রা মৈথুনের সাথে সাথে পরিবারের আহার নিদ্রা ও মৈথুনের চিন্তাও করে থাকেন, তবে তিনি সুখী ও সুন্দর পরিবার লাভ করেন। না অতিবিত্তবাণ, না অতিদরিদ্র, এমন পরিবার লাভ করেন তিনি, যেখানে পরিবারের সকলে সকলকে স্নেহ করেন।

তবে যদি ব্রহ্মাণু পরিবারের প্রতি আসক্ত থাকেন, পরবর্তী দেহে, জার প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন, তাঁর অভাব তাঁকে অনুভব করতেই হবে। হয় সে মাতৃহীনা হবে, নয় পিতৃহীন, নয় স্নেহের ভ্রাতাভগিনীকে স্বল্পবয়সে হারাবেন তিনি। আসলে পুত্রী, আসক্তি বিরক্তিই অগ্রগতির পথে প্রধান বাঁধা। এই আসক্তি বিরক্তি থাকলে, অন্যত্র দৃষ্টি যেতেই পারেনা, দৃষ্টিশক্তিই পরাধীন হয়ে যায়। তাই সেই আসক্তি বিরক্তির থেকে ব্রহ্মাণুকে মুক্ত করতেই হবে, আর তাই জন্যই এমন বিচার।

অন্যদিকে যদি কনো ব্রহ্মাণুর কনো পরিবারের সদস্যের প্রতি বিরক্তি থাকে, তাহলে পরজন্মে সেই সম্পর্কের থেকে অপার স্নেহ প্রদান হবে, সেই বিচার প্রদান করা হয়, যাতে তাঁর এই বিরক্তির নাশ হয়।

এছাড়া যিনি দিবারাত্র পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য, নিজের আহার নিদ্রা ও মৈথুন চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যান, তাঁর জন্য ধনী পরিবার প্রদান করা হয়, যাতে তাঁর আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের চিন্তা না থাকে, আর সে উন্নত সাধনের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

আর যিনি পরিবারের কারুর প্রতি পক্ষপাত করেন, যেমন বড়ছেলে, যেমন ছোটছেলে, যেমন পুত্রসন্তান, অর্থাৎ এই বিচারে নয় যে, সে অধিক যোগ্য, বরং এই বিচারে পক্ষপাত করেন যে তাঁর ধারণা পুত্রসন্তান অধিক শ্রেয়, বড়ছেলেই শ্রেয় বা ছোটছেলেই শ্রেয় ইত্যাদি, তাকে পরজন্মে সেই অবহেলিত সন্তান হয়েই জন্ম নিতে হবে, যতই পরিবারের অবস্থা দারিদ্রতার উর্ধ্বে থাকুক।

অন্যদিকে যদি যোগ্যতার বিচার করে পক্ষপাত করে থাকে ব্রহ্মাণু এবং যে কম যোগ্য, তাঁকে অবহেলা করে থাকে, তাহলে তাকে পিতামাতার অবহেলা সইতে হবেনা, কিন্তু ভ্রাতাভগিনীর অবহেলা অবশ্যই সহ্য করতে হবে। আর যদি, যোগ্যতার বিচার করে শ্রেষ্ঠযোগ্যকে অধিক স্নেহ ও বিশ্বাস অর্পণ করলেও, কারুকে অবহেলা না করা হয়, তাহলে সেই ব্রহ্মাণুকে উন্নত মনস্ক পরিবার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ তাঁর পিতামাতা বা বংশমর্যাদা সুউচ্চ হয়, যেখানে জন্ম নিলে জীবনের সত্য সন্ধান অনেক অংশেই সহজ হয়ে যায়।

এরপরবর্তী বিচার হয় তাদের, যারা সমাজে নিজেদের অবদান রাখার প্রয়াস করেছেন, অর্থাৎ সমাজের জন্য চিন্তন করেছেন। এঁদের বিচার জটিলতর হয়ে যায়, কারণ এঁদের বিচার করার কালে, এঁদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি ভাবনা, পরিবারের প্রতি ভাবনাও যেমন যুক্ত হয়, তেমন সমাজের প্রতি দৃষ্টির দিশাও এই বিচারকে নির্ধারণ করে। তাই এখানে বেশ কিছু মীমাংসা দাঁড়ায়। একটি একটি করে সকল মীমাংসার কথা বলছি, শ্রবণ করো।

যদি এই ব্যক্তি নিজের জীবনের প্রতি যত্নশীল হয়ে, অর্থাৎ নিজের আহার নিদ্রা ও মৈথুনের প্রতি আসক্ত হয়ে, পরিবারের আহার নিদ্রা ও মৈথুনের প্রতিও উদারহস্ত থেকে, সমাজের হিত চিন্তা করে থাকেন, অর্থাৎ সমাজের ব্যবস্থায়নকে সর্বজনহিতকর করার প্রয়াস করেন, তবে ইনি

কনো রাজপরিবারে জন্ম নেবেন পরবর্তীতে, এবং সমস্ত জাগতিক সুখসুবিধা, এমনকি স্নেহাদিলাভও করবেন।

যদি ইনি নিজের আহার নিদ্রা ও মৈথুনের প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে, পরিবারের সকলেরও আহার নিদ্রা ও মৈথুনের প্রতিও আসক্ত হয়ে, সমাজের হিতচিন্তা এমন করে থাকেন যাতে সমাজের ব্যবস্থায়ন তাঁর নিজের ও তাঁর সমুদয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে ইনি মানবযোনি লাভ করবেন না, বরং তাঁর সমুদয় যেই যোনিকে ঘৃণা করে, সেই যোনিতে জন্ম নেবেন।

যদি ইনি নিজের আহার নিদ্রা ও মৈথুনের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে, পরিবারের সকলেরও সুখচিন্তার প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে, সমাজকে যন্ত্রের দ্বারা সুচালিত করতে সচেষ্ট হন, তিনি যন্ত্রাদির উত্থানের কারণে যেই পরিবারের অন্নপ্রাপ্তির নাশ হয়, তেমন এক পরিবারে জন্ম নেবেন মনুষ্য হয়েই।

যদি ইনি নিজের আহার নিদ্রা ও মৈথুনের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে, পরিবারের সুখাদির প্রতিও দায়িত্বশীল হয়ে, সমাজের সুচারুতাকে উন্নতি করার জন্য প্রয়াসশীল হয়ে, সকল প্রজাতি, সমুদয়ের উত্থানের চিন্তা করবেন, এবং সমস্ত দুর্বলের রক্ষক হয়ে উঠবেন, তিনি এক মহান প্রতিভার সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

যদি ইনি নিজের সুখাদির চিন্তা করেন, পরিবারের সুখাদির চিন্তা না করেন, এবং সমাজকে প্রগতিশীল করার প্রয়াস করেন, তবে ইনি এমন এক রাজনেতার সন্তান হয়ে জন্ম নেবেন, যিনি তাঁর প্রতি দৃষ্টিই দেবেন না, কিন্তু রাজনেতার সন্তান হয়ে জন্ম নেবার জন্য সমস্ত ভৌতিক সুখসুবিধা তাঁর সাথেই যুক্ত থাকবে।

যদি ইনি নিজের সুখাদির চিন্তা করে, পরিবারের সুখচিন্তা না করে, সমাজকে নিজের ও নিজের সমুদয়ের হস্তগত পুত্তলিকা নির্মাণে রত হবেন, তাঁকে কীট বা ভুজঙ্গ যোনি লাভ করতে হবে, এবং মানবযোনি তাঁর কাছে দুরন্ত হয়ে যাবে।

যদি ইনি নিজের সুখাদির চিন্তা করে, পরিবারের সুখাদির চিন্তা না করে, সমাজকে যান্ত্রিক করার প্রয়াস করবেন, তিনি পরজন্মে নিঃসন্তান হবেন, এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ইনি জন্ম নেবেন।

যদি ইনি নিজের সুখাদির চিন্তা করে, পরিবারের সুখাদির চিন্তা না করে, সমাজকে সার্বিক ভাবে স্বতন্ত্র করার জন্য প্রয়াসশীল হন, তিনি পরের জন্মে বিপত্নীক বিত্তবান পিতার সন্তান হবেন, এবং মাতাব্যতীত সমস্ত ভৌতিক সুখসুবিধা লাভ করবেন।

যদি ইনি নিজের সুখাদির চিন্তা না করে, পরিবারের সুখাদির চিন্তা করে, সমাজকে প্রগতিশীল করতে উদ্যত হন, তিনি জন্ম নেবেন সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত প্রতিভাশালীর সন্তান হয়ে।

যদি ইনি নিজের সুখাদির চিন্তা না করে, পরিবারের সুখাদির চিন্তা করে, সমাজকে নিজের ও নিজের সমুদয়ের হস্তে কুক্ষিগত করার প্রয়াস করেন, তাহলে ইনি সেই বৃক্ষাদি যোনিতে জন্ম নেবেন, যার একটি ফলও সেই বৃক্ষের হবেনা, উপরন্তু সকলে সেই বৃক্ষের ফলকে নিজেদের জ্ঞান করে নিয়ে চলে যাবে, আর সেই বৃক্ষ নিঃসন্তানই হয়ে থাকবে।

যদি ইনি নিজের সুখাদির চিন্তা না করে, পরিবারের সুখাদির চিন্তা করে, সমাজকে যান্ত্রিক করার স্বপ্ন দেখেন, তিনি এমন এক যন্ত্রবিজ্ঞানীর সন্তান হবেন, যিনি তাঁর সন্তান ও পরিবারকে কনো গুরুত্বই দেবেন না।

যদি ইনি নিজের সুখাদির প্রতি উদাসীন হয়ে, পরিবারের সুখাদির প্রতি চিন্তিত হয়ে, সমাজকে স্বনির্ভর গড়ে তুলতে চিন্তিত হন, তিনি কনো সাধকের সন্তান হয়ে জন্ম নেবেন।

যদি ইনি নিজের ও পরিবারের সুখাদির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে সমাজের কল্যাণের চিন্তা করেন, তিনি এক আত্মহারা সাধকের সন্তান হবেন, যিনি পরিবারের প্রতি উদাসীন।

যদি ইনি নিজের ও পরিবারের সুখাদির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে সমাজকে কুক্ষিগত করার মানসিকতায় গ্রস্ত হন, তিনি মৎস্য বা সর্প যোনিতে জন্ম নেবেন, যেই মৎস্য নিজের সন্তানকেই ভক্ষণ করে নেন।

যদি ইনি নিজের ও পরিবারের সুখাদির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে সমাজকে যান্ত্রিক করে তোলার দিকে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তিনি মৃত্যুর পরে, যন্ত্রকে স্পর্শ করতে না পেরে, সম্পূর্ণ বিরক্ত হয়ে ওঠার কারণে কনো দেহগ্রহণ করবেন না, আর ফলে পিশাচযোনিপ্রাপ্ত হবেন।

পুত্রী, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রচুর খুঁটিনাটি মানসিকতা থাকবে, যাও সেই ব্যক্তি পরবর্তী জন্মের বিভিন্ন পর্যায়তে অনুভব করতে থাকবেন। আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে রাজনেতারা থাকেন, বিশালাকায় বনিক থাকেন, কবি, সাহিত্যিক থাকেন, কলাবিদরা থাকেন, ক্রীড়াবিদরা থাকেন, দার্শনিক থাকেন, এমনকি সাধকরাও থাকেন। আর এমনও নয় যে, এখানে সেই কর্মেরই হিসাব করা হবে, যা তিনি বাস্তবে করবেন। ব্যক্তির অন্তরে যেই পূর্ণবিচার থাকবে সমাজ নিয়ে, তারই প্রতিফলন হবে এখানে।

অর্থাৎ এমন কখনোই নয় যে, আমি এমন ভাবলাম যে সমাজ সুন্দর হয়ে যাক, আর আমি এই শ্রেণীতে এসে যাবো। যখন কনো ব্যক্তি নিজের সমস্ত জীবন এই সমস্ত কিছুর ভাবনার মধ্যেই স্থিত থাকেন, তাঁরাই এই শ্রেণীতে উপস্থিত হন। আর যারা ধর সরকারি বা বেসরকারি চাকুরী করেছেন কেবল বা কেবল পরিবারের খরচ চালানোর জন্য বাণিজ্য করেছেন, এবং সেই সমস্ত কিছুতেই মনপ্রান দিয়ে কর্ম করেছেন, তাঁরা এই শ্রেণীতে আসেন না, বরং নিজের জন্য জীবিত থেকেছেন যেই ব্রহ্মাণুরা এবং পরিবারের জন্য জীবনযাপন করেছেন যেই ব্রহ্মাণুরা, তাঁদের শ্রেণীতে আসেন।

এছাড়া যেই মানুষদের জন্য বিশেষ বিচার হয়, তাঁরা হলেন, সাধকের পাতাপিতা, রাজা বা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রধান মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, বা বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, এবং থাকেন

স্বয়ং সাধক। এবার আমি এঁদের ব্যাপারে বিশেষ যেই বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তার কথা তোমাকে বলছি শ্রবণ করো।

সাধকের পিতামাতা বা ভ্রাতাভগিনী যদি সাধকের সাধনায় কনো অবদান করেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য, তাহলে তাঁদের জন্য সেই চেতনাই প্রদত্ত হয়, যেই চেতনায় সাধক নিজেকে স্থিত করেছেন। তবে সাধক যেই চেতনাস্তর লাভ করেছেন, অর্থাৎ অনাহত, বিশুদ্ধ, বা আজ্ঞাচক্র, তা সাধক পরবর্তী জীবনের ৬ বৎসর বয়স থেকে ভোগ করবেন, যতক্ষণ না সেই চেতনাস্তর থেকে তাঁর উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু তাঁর পিতামাতা সেই চেতনাস্তর ভোগ করবেন মাত্র ৬ বৎসর, অর্থাৎ তাঁর ১৮ বৎসর বয়স থেকে ২৪ বৎসর বয়স। সেই সময়কালে যদি সেই ব্রহ্মাণু অর্থাৎ যিনি পূর্বজন্মে সাধকের পিতামাতা ছিলেন, তিনি নিজের চেতনাস্তরের উত্থান করে নেন, তবে তাঁর সাধনজীবন অতিসহজ হয়ে যায়। এইক্ষেত্রে, আরো একটি জিনিস বলা আবশ্যক, আর তা হলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য কি?

প্রত্যক্ষ সাহায্য মানে বচন ভঙ্গি ও ভৌতিক ভাবে সাধনায় সম্মতি প্রদান করা, যা সাধককে সাধনার জগতে উন্নত হতে সাহায্য করে। পুত্রী, এই পিতামাতার মধ্যে সাধকের গুরুও স্থিত থাকেন। আর পরোক্ষ সাহায্যের মধ্যে পরে সাধককে সাধনায় যদি বাঁধা দেন। এটিও সাহায্য সাধকের জন্য, কারণ সাধক এই সাহায্য লাভ করে অধিক দৃঢ়ভাবে সাধনা করেন।

সাধক ও সাধকের পিতামাতার পরে, এবার পরে থাকে শাসক। পুত্রী, শাসক কেবল নিজের কর্মের ফল ভোগ করেন না, বা বলতে পারো তাঁর নিজস্ব কর্মের কনো বিচারই হয়না। তাঁর শাসনের মধ্যে স্থিত সমস্ত প্রজার মধ্যে যারা যারা সাধক হয়েছেন, যারা যারা সিদ্ধলাভ করেছেন, যারা যারা কলাবিদ্যার দ্বারা সমাজকে ও সমাজের সমস্ত মানুষকে উন্নত করেছেন, তাঁদের সুকর্মের ফল ভোগ করেন শাসক প্রথমে। অর্থাৎ যদি এক শাসকের শাসনকালে ১জন ব্যক্তি সিদ্ধলাভ করেন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, তবে শাসক একটি জন্ম লাভ করেন সাধকের সন্তান হয়ে।

এই জন্মে যদি তিনি নিজেকে উন্নীত করতে পারেন, সেই কর্মফল তাঁর জন্য নিশ্চয় করা থাকলেও, যতক্ষণ না শাসকের সমস্ত কর্মফল ভোগ হয়, ততক্ষণ এই কর্মের ফল তিনি লাভ করেন না। এবার যদি তাঁর শাসনকালে ১০জন সাধক সাধনে অগ্রসর হন, অর্থাৎ নিজেদের চেতনাস্তরকে অনাহত বা তার উর্ধ্বে গতি প্রদান করতে পারেন, তবে সেই ব্রহ্মাণু যিনি শাসক ছিলেন, তিনি ১০ সুখসমৃদ্ধিকর জন্ম লাভ করেন, তখনই যখন সেই সাধকরা রাজার গুণগ্রাহী হন, নচেৎ নয়। এই ১০ জন্মেও যা যা তিনি ফল লাভ করেন, তা তাঁর জন্য তোলা থাকে, শাসকের সমস্ত কর্মফল লাভের পরেই তা প্রদান করা হয়।

এরপর যদি ১০জন কলাশিল্পী তাঁর আমলে সমাজকে উন্নত করে থাকে, তাহলে প্রতি ১০ কলাবিদের কারণে একটি করে জন্ম শাসক লাভ করেন, যেখানে তিনি কনো কলা বিদের সন্তান হয়ে, তাঁর চরণতলে উপস্থিত হয়ে কলাশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পান।

আর এই সমস্ত কিছুর পরে, এবার আসে কুফল লাভ। সেই শাসকের অধীনে থাকা যতগুলি প্রজা যতদিন অনাহারে দিন কাটিয়েছেন, শাসককে একটি জন্মে ততদিন অনাহারে থেকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয় একটি জন্মে। যতগুলি প্রজা শাসনের কারণে উদাসীন হয়ে আত্মহত্যা করেছেন, ততগুলি প্রজার জন্য একটি করে হাড় ভাঙে সেই শাসকের। আর যতগুলি জন্ম লাগে সেই হাড় ভাঙতে, ততগুলি জন্ম তাঁকে নিতেই হয়। এরপর যতগুলি প্রজা তস্কর হয়েছে অনাহারের কারণে, ততগুলি প্রহার সহ্য করতে হয় শাসককে, আর তার জন্য যতগুলি জন্ম লাগে, ততগুলি জন্ম শাসককে নিতে হয়।

এরপরে আসে মানব যোনিতে না থাকতে পারার সময়কাল। এরপর আসে ভণ্ড। শাসকের আমলে যতগুলি ভণ্ড নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে, ততবার শাসককে গবাদি পশু হয়ে প্রহৃত হতে হয়। তারজন্য যতগুলি পশুযোনি লাভ করতে হয়, ততগুলি জন্ম নিতে হয় শাসককে। এরপর যতগুলি যন্ত্রসর্বস্ব প্রজা শাসকের শাসনে যন্ত্রমনস্ক হয়েছেন, ততবার কীট পতঙ্গ হয়ে জন্ম নিয়ে, যন্ত্রের আঘাতে মরতে হয় শাসককে। যতগুলি জীবকে শাসকের আমলে কেবলই রাজার বা রাজসমুদয়ের বিলাসিতার কারণে হত্যা করা হয়েছে, ততবার শাসককে

বনজ তৃণ হয়ে জন্ম নিয়ে উৎপাটিত হতে হয়। আর শেষে থাকে পিশাচ। শাসকের রাজ্যে যতগুলি ব্রহ্মাণু পিশাচ হবে, ততবার শাসককে হিংস্র পশুর শিকার হতে হয়।

এরপরেই শাসকের বিচার সমাপ্ত হয়। আর তারপর শুরু হয়, এই সমস্ত জন্মে শাসক যেই যেই কর্ম করেছেন, তার বিচার ও তার ফলদান। অর্থাৎ পুত্রী, এক শাসকের বিচার সর্ববৃহৎ হয়, যা সমাপ্ত হতে কখনো কখনো এক সহস্র থেকে ৫ সহস্র বৎসরও লেগে যায়।

আর শেষে অন্যযোনির ব্যাপারে বলতে গেলে, সমস্ত যোনির নিম্ন থেকে ঊর্ধ্ব অবস্থান এইরূপ- প্রস্তর, তৃণ, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, তরু, ফলাহারী পক্ষী, কীটখাদক পক্ষী, বান্দর, কুকুর, বিড়াল, শিকারি পক্ষী, বৃহতাকার মৎস্য, তৃণখাদক বনজ পশু, গবাদি পশু, বনস্পতি, শিকারি পশু, হস্তি, বটবৃক্ষ, মনুষ্য। এই ধারা অনুসারে যেই ব্রহ্মাণু যেই যোনিতে স্থিত, সেই যোনি সম্বন্ধে সমস্ত শিক্ষা অর্জন করা হয়ে গেলে, তাঁরা পরবর্তী যোনিতে উন্নত হয়।

আর এই ভাবে বিবেক অর্থাৎ কাল, বা স্বয়ং আমি আমার প্রকাশের মাধ্যমে সমস্ত ব্রহ্মাণুদের সমানে সত্যের সকাশে উন্নীত করার জন্য প্রয়াসশীল থাকি, আর এই প্রয়াসের সর্বোত্তম অধ্যায়ই হয়, মৃত্যুর পশ্চাতে, যখন আমার দরবারে ব্রহ্মাণু বিচারাধীন হয়ে উপস্থিত হয়”।

মাতৃ সত্য

দিব্যশ্রী মৃদু হেসে বললেন, “আর কি জানবো মা! ... আর জানতে চাইলে, তুমি আরো জানাবে, তা আমি জানি। তুমি যে স্বয়ং জ্ঞান, তাই তোমার অজ্ঞাত যে কিছুই নেই। ... তবে আর জ্ঞান আমার কাছে বিলাসিতা হয়ে যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে। ... তবে মা, একটি বিষয়ে আমার এবার কিছু বলার ইচ্ছা হচ্ছে। ... যদি অনুমতি দাও, তাহলে বলি!”

ব্রহ্মসনাতন মৃদুহাস্যে সম্মতি দিলে, দিব্যশ্রী বললেন, “মা, ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস কেবলই অহেতুক কালক্ষয়, কারণ ঈশ্বর যে অসীম, অনন্ত, অব্যাক্ত। ... তবে মা, ঈশ্বরকে

আরো এক ভাবে লাভ করা সম্ভব, আর তা হলো মা। ... তিনি যখন ঈশ্বর, তখন অব্যাক্ত, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভাবে ব্যক্ত যখন তিনি মা, কিন্তু তাও সেই মা বেশেও, তাঁর ব্যাখ্যা সেই অসীমই থেকে যায়। ... তবে সন্তানের কাছে অতিপ্রিয় নাম এই শব্দটি, অর্থাৎ মা। সন্তান জানে, এই মা শব্দের ব্যাখ্যা সে কিছুতেই সমাপ্ত করতে পারবে না, কিন্তু সে এই শব্দের ব্যাখ্যা দিতে না পারলে, নিজেকে ধরে রাখতে পারেনা।

তাই মা, আজ আমি এই মা-এর ব্যাখ্যা দিতে চাই, ঈশ্বরের না। আসলে সত্য বলতে, আমি আমার পিতাকে কখনোই পাইনি, কারণ যখন তাঁর পঞ্চভূতের সম্মুখে আমার পঞ্চভূত উপস্থিত হয়েছিল, তখন তাঁর আত্মের আর তো কনো অস্তিত্বই ছিলনা। মা, তুমি স্বয়ং তাঁর গুণগান করেছ , আর যখন যখন তাঁর গুণগান করার সুযোগ পাও, তখন তখন তাঁর গুণগান করো।

মা, আমার তো ধৃষ্টতাও নেই যে, আমি তোমার মা রূপের গুণগান তাঁর মত করে করি। কি করেই বা করবো? তিনি তো তোমাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। এত সামর্থ্য আমার কোথায়? আমি আমার অহমকে সম্পূর্ণ ভাবে তোমাকে কোথায় অর্পণ করতে পেরেছি, তাঁর মত করে? অহম ত্যাগ হয়েও যে আমার মধ্যে অহম রয়ে গেছে মা! ... তাই আমার ধৃষ্টতা নেই, তাঁর মত করে তোমার মাতৃরূপের বর্ণনা করা।

কিন্তু মা, খুব খেদ হয়। যদি তাঁকে কিছু সময়ও পেতাম, তাহলে তাঁর মুখ থেকে তাঁর মাতৃবন্দনা শুনতাম। কিন্তু মা, আমাকে তুমিও তো সেই বর্ণনা শোনাতে পারো। জানি, তাঁর বিবরণ মায়ের সম্বন্ধে হতো, কিন্তু যখন সেই বিবরণ তুমি দেবে, তখন তা তোমার নিজের বিবরণ নিজেকেই দিতে হবে, নিজের প্রশস্তি নিজেকেই গাইতে হবে, আর এই কাজে তুমি সম্পূর্ণ ভাবেই উদাসীন। তাও যদি, একটি বার, তাঁর তোমাকে দেওয়া সম্পূর্ণ বিবরণ শ্রবণ করাও, আমি ধন্য হয়ে যাই।

আসলে মা, আমি ধন্য অনুভব করতে চাই, এমন মানুষের কন্যা হবার জন্য। আমি আমার পিতাকে আমার অঙ্গে অঙ্গে, আমার কণায় কণায় ধারণ করতে চাই। আমি তাঁর গন্ধে মেখে

থাকতে চাই। আমি তাঁর জন্য অশ্রু বিসর্জন করতে চাই। তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তাঁকে বড্ড অনুভব করতে চাই। ... মা, তার তো সম্ভাবনা আর নেই। তাই তাঁর তোমার জন্য যেই ব্যখ্যা ছিল, সেটিই শুনতে চাই। তাঁর সমস্ত জীবন তোমার জন্য ছিল। তাই তাঁর বর্ণনা শোনানো কি যায় আমাকে?"

ব্রহ্মসনাতন অশ্রুসিক্ত নয়নে হেসে বললেন, "পুত্রী, নিজের কথা বলতে সত্যই আমি অপ্রস্তুতই বোধ করি, তবে তোমার পিতার ব্যাপারে বলতে পারা, আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। তাই তাঁর কথা আমি অবশ্যই তোমাকে বলবো। আর আরো বলবো, কারণ তোমার পিতা ছিলেন তিনি, অর্থাৎ তোমার তাঁকে ও তাঁর দর্শনকে জানার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ... তাই অবশ্যই বলবো তোমাকে তাঁর মাতৃবন্দনা। তবে তার আগে, কেন তাঁর বন্দনার বিবরণ দেওয়া আমার জন্য গর্বের, তা বলতে চাই, যদি তোমার অনুমতি হয় তো"।

দিব্যশ্রী উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে বললেন, "মা! এমন বলো না কৃপা করে। এমন কিচ্ছু তো আমি কিছুতেই নই যে, সাখ্যাৎ জগন্মাতাকে তাঁর থেকে অনুমতি নিতে হবে"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তাঁর কথা কেন বলতে চাই, তা বলা অত্যন্ত আবশ্যক পুত্রী, কারণ এ ৭ কোটি বৎসরের মানব ইতিহাসে, এমন নিদর্শন কখনোই আসেনি, তোমার পিতার মত। অদ্ভুত তাঁর প্রেম, অদ্ভুত তাঁর বিশ্বাস, আর অদ্ভুত তাঁর সমর্পণ। পুত্রী, আমার ৪ কলার ভার উঠিয়ে আমার বাহন হয়েছিল মিরা, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কুবির। আমার ৮ কলা ভার উঠিয়ে আমার বাহন হয়েছিল ঈশা, মহম্মদ, বিশ্বামিত্র ও নিমাই অর্থাৎ চৈতন্য। আমার ১৬ কলা ভার উঠিয়ে আমার বাহন হয়েছিল শঙ্কর, পিপলাদ, আর কৃষ্ণ। আমার ৩২ কলা ভার উঠিয়েছিল সিদ্ধার্থ, মার্কণ্ড ও গদাধর।

কিন্তু তোমার পিতা, এই ৭ কোটি বৎসরের মানুষের ইতিহাসে, প্রথমবার আমার ৬৪ কলা ভার উঠিয়ে আমার বাহন হয়েছে। অদ্ভুত তাঁর প্রেম, অদ্ভুত তাঁর বিশ্বাস। ... পুত্রী, আমার ৪ কলা

ভার ওঠাতে হলে, নিজের অহমের ৪ শতাংশ ত্যাগ করে দিতে হয়, যা মিরা, কুবির, রামপ্রসাদ, আনন্দময়ী, কমলাকান্ত করেছিল।

আমার ৮ কলার ভার ওঠানো জীবকটির সামর্থ্যের মধ্যে আসেনা, কারণ জীবকটির মধ্যে পূর্বসংস্কারের ভার তাঁর অহমকে ৫ শতাংশের কমে যেতে দেয়না, আর যদি যায়, তখন সে আমাতে বিলীন হয়ে যায়, মোক্ষ লাভ করে নেয়। ঈশ্বরকটির পক্ষেই আমার ৮ কলা ভার ওঠানো সম্ভব, আর তা ওঠাতেও ৮% অহম ত্যাগ করে দিতে হয়। এমনকি ৩২ কলা ভার ওঠানোর জন্যও, নিজের ৩৩% অহম ত্যাগ করতে হয়।

কিন্তু তোমার পিতাই প্রথম, আর স্বয়ং আমারও বিস্ময় যে, সে কি ভাবে নিজের ১০০ শতাংশ অহম ত্যাগ করে দিলো। সামান্য বলতে সামান্যও আসক্তি না রেখে, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে কি করে ত্যাগ করে দিলো, তা আমার কাছেও অত্যন্ত বিস্ময়ের পুত্রী! অহম ত্যাগ করার জন্য, আমার প্রতি আর আমার সমস্ত সন্তান অর্থাৎ জগতের প্রতি প্রেম আবশ্যক। নিজের অহমকে অর্থাৎ আমিত্বকে অধিক থেকে অধিক ত্যাগ করে, তবেই জগতের উদ্ধারচিন্তা বাস্তবে করা সম্ভব।

কিন্তু এই ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে দেওয়া সম্ভব, তা আমার কাছেও এক বিস্ময়, আর আজও তা এক বিস্ময়। নিজের জন্য শ্বাসগ্রহণ করতেও তাঁর অনীহা, নিজের জন্য আহার গ্রহণ করতেও তাঁর অনীহা, নিজের জন্য নিদ্রা যেতেও তাঁর অনীহা। আমাকে তাঁর অন্তরে আওয়াজ প্রদান করে বলতে হয়েছে যে আমার খিদা লেগেছে, তবেই সে অন্নগ্রহণ করেছে; আমাকে তাঁর অন্তরে শব্দ উচ্চারণ করে বলতে হয়েছে যে আমার নিদ্রা লেগেছে, তবেই সে নিদ্রা গেছে। আমাকে তাঁর হয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে হয়েছে, তবেই তাঁর দেহ শ্বাস গ্রহণ করেছে।

পুত্রী, এমন প্রেম আমি কখনো অনুভব করিনি। এর পূর্বেও আমি বহু প্রেমী পেয়েছি, বহু বাহন পেয়েছি। সকলেই অন্দরে, কন্দরে, ঘরের কোনে স্থিত হয়ে ক্রন্দন করে করে বলতো, আমি

তোমাকে খুব ভালোবাসী, তুমি কি আমার প্রেম দেখতে পাচ্ছ না! ... কিন্তু তোমার পিতাও কোনে বসে কাঁদতেন, কিন্তু কি বলতেন জানো? বলতেন, কোন মুখে আমি তোমাকে কাছে আসতে বলি। তোমার প্রেম এতই অপার যে, সেই প্রেমের লেশ মাত্রও আমার করার সামর্থ্য নেই, তাই কোন মুখে তোমার দর্শন চাই!

আমি হতবাক হয়ে যেতাম! এমন প্রেম আমি এর আগে কখনো অনুভব করিনি। জানো তোমার পিতার প্রেমবল অত্যন্ত শক্তিশালী। আমার মধ্যে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়ে বিলীন হয়ে যাওয়া মিরাকে সে জাগিয়ে তুলেছিল। মিরাকে দিদি বলতো, আর সর্বক্ষণ দিদি দিদি করে যেত। নিদ্রা যেতও আর নিদ্রা থেকে উঠতোও। আর সেই প্রেমের মধ্যে শুধুই দিদি ছিল, আর কনো অন্য ভাব ছিলনা। মিরাকে সেই প্রেম এমনই আকর্ষণ করেছিল যে, সে পুনরায় দেহধারণ করে তার ভাইয়ের কাছে যেতে আগ্রহী হয়ে গেছিল।

ভূতকে আকর্ষণ করতে দেখেছি, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্ত ব্রহ্মাণুকে দেহধারণ করার জন্য ব্যকুল দেখিনি। আর কিই বা বলবো! ব্রুহ্মাণুর কথা আর কি বলবো! স্বয়ং ব্রহ্মকে মা বলে এমন আঁকড়ে ধরলো, পারলামই না কিছুতেই দূরত্ব রাখতে। মায়ের মত করে অনেকে ডেকেছে আমাকে, মা করে মেনেও, গর্ভধারিণী মায়ের উপরে রাখতে পারেনি কেউ। কিন্তু তোমার পিতা! সে তো আমাকেই একমাত্র মা মেনে, আমার জন্যই বেঁচে থাকা শুরু করে দিলো।

সেই টানে, আমি স্বয়ং ব্রহ্মই নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না, মিরা তো আমারই এক অণু! কি ভয়ঙ্কর বিশ্বাস আমার প্রতি! বলে, আমি নাকি তোমার দর্শন পাবার যোগ্যই নই, তাই দর্শন পাচ্ছিনা। যোগ্য হলে, তুমি ঠিকই দর্শন দিতে। ... কি অপরিসীম বিশ্বাস! এই বিশ্বাস যে সে সর্বঅবস্থাতে ভুল, আর আমি সর্বঅবস্থাতে সঠিক! এমন বিশ্বাসের সাথে আমার এই প্রথমবার আলাপ।

জগতের সমস্ত জীব আমার সন্তান, আর এই সমস্ত সন্তানের জন্য, আমি দিবারাত্র কর্ম করে চলি। এই জ্ঞান লাভের পর থেকে, একদণ্ডের জন্যও তোমার পিতা, নিজের চিন্তা করেন নি।

প্রথমে নিজেকে নিয়জিত করেছিল এই জগতকে চেনার জন্য, এই জগতের থেকে আমার আশা কি, তা জানার জন্য, সেই আশা পুড়নের জন্য আমি কি কি ইতিমধ্যে করেছি, তা জানার জন্য, আর কি কারণে আমার আশা পুড়ন হয়নি, তা জানার জন্য।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে সে, সর্বক্ষণ, এই সমস্ত জানার কারণে। আর যখন তা জানা হয়ে গেল, তখন আমার আশা পুড়ন করার মার্গের সন্ধান করতে থাকলো। সেই অনন্ত সন্ধানের কালে, সে আমাকে আরো অধিক অধিক করে কাছে টেনেছে, আমাকে আরো আরো করে ব্যখ্যা দিয়েছে, আর সেই সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সে এই অনুভব করে যে, এই আশা আমি পুড়ন করতে পারছিনা, কারণ আমি নিরাকার, আমার কনো অবয়ব নেই।

সে এই মার্গের সন্ধান করে যে, এক আমি যদি কনো অবয়বকে পূর্ণ রূপে ধারণ করতে সক্ষম হই, তবেই আমি মার্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হবো, যেই মার্গ অনুসারে এই আশা পূর্ণ হবে, অর্থাৎ জগতে মোক্ষের দ্বার স্থাপিত হবে। এই বিচার করে, সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কনো না কনো ভাবে আমাকে একটি পূর্ণ অবয়ব দিতে হবে।

আমার বিভিন্ন অবতাররূপের কাছে সে ভিক্ষাপ্রার্থনা করতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মিরার কাছেও ভিক্ষাপ্রার্থনা করতে থাকে যাতে এই অবয়ব আমাকে কি ভাবে দেওয়া সম্ভব, তা আমি তাঁকে বলি। মিরাকে আমি যেতে দিতে পারিনা, কারণ তা ব্রহ্মসত্ত্বের অবমাননা হবে। একবার যেই ব্রহ্মাণু ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে নিজের সমস্ত জীবনমৃত্যুর চক্রকে কেটে, তাকে পুনরায় সূক্ষ্মদেহপ্রদান করার অর্থও এই যে, তাঁর জীবনচক্রের পুনরায় শুরু হয়ে গেল, পুনরায় তাঁকে কর্মের ফলভোগ করতে হবে।

এই সত্য আমি তোমার পিতাকে বলার জন্য, আমার সেই অবতারের সূক্ষ্মপ্রকাশকে তোমার পিতার সম্মুখে নিয়ে যাই, যার সূক্ষ্মপ্রকাশ তখনও বিনষ্ট হয়নি, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ বা গদাধর। পুত্রী, একটি ৩২ কলার অবতারের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর মৃত্যুর ১৪৪ বৎসর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, আমাতে পূর্ণ ভাবে বিলীন হতে। একটি ৮ কলার অবতারের সূক্ষ্মশরীর ১৯৮বৎসর পর্যন্ত

অবস্থান করে, আমাতে বিলীন হতে। তাই রামকৃষ্ণ সূক্ষ্মশরীরের নাশ তখনও হয়নি। আর তাই তোমার পিতার সমক্ষে আমি তাঁকে প্রকট করে বোঝাই যেন সে মিরাকে ডাকাডাকি না করে।

পুত্রী, সাধকের জেদ সম্বন্ধে আমি পরিচিত। তাঁদের আলবুঝো ভাব সম্বন্ধেও আমি পরিচিত। তাই অবতারকেই প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তোমার পিতার বিশ্বাসের সাথে আমি পরিচিত ছিলাম না। গদাধরের সূক্ষ্মশরীরের মুখ থেকে মিরাকে কেন ডাকা উচিত নয়, তা শুনে, তোমার পিতা ক্রন্দনে ভেঙে পরেছিল। ক্রন্দনে সে এই আর্তনাদ করে উঠলো, এ আমি কি করে ফেললাম! ... যেই মায়ের বেদনা নিয়ে আমি সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকি, আমি তাঁকেই বেদনা দিয়ে ফেললাম! ... যেই মিরাদিদির প্রেমভাব আমাকে বাধ্য করে তাঁকে আপন মানার জন্য, আমি তাঁকেই নতুন করে জীবনচক্রে টেনে আনছিলাম।

ক্রন্দনের ভাবেই সে বলে উঠলো, আমার মা ভুল করেও ভুল করতে পারেনা। আমি তো নির্বোধ, তাই আমার কাছে কনো ধারণাই ছিলনা যে কেন মিরাদিদিকে ডাকা উচিত নয়। কিন্তু তিনি তো মা। মা কি করে সন্তানের সাথে অন্যায় হতে দিতে পারেন! ... মিরাদিদির সাথে যেই অন্যায় আমি অজ্ঞানতা বশত করতে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে সেই অন্যায় করা থেকে আটকে দিলেন, আর মিরাদিদিকে পুনরায় জীবনচক্রের মধ্যে এনে আমি যে তাঁর সাথে অপরাধ করতে চলেছিলাম, সেই অপরাধ করা থেকেও তিনি আমাকে প্রতিহত করে দিলেন। ধন্য আমার মা!

আমি পুনরায় আপ্লুত হলাম। কি অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব! ... নিজেকে সর্বক্ষণ ভুল আর ভ্রান্ত প্রমাণ করতেই যেন সে ব্যস্ত, আর আমাকে সর্বক্ষেত্রে সঠিক প্রমাণ করাই যেন তাঁর লক্ষ্য। ... রামকৃষ্ণকে আটকাতে চাইবে না চাইবেনা, সেই প্রশ্ন স্বয়ং গদাধরকেই সে করে বসলো। সে তাঁর উদ্দেশ্যে বলল, ঠাকুর, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য আটকালে কি মাকে কষ্ট দেওয়া হবে?

গদাধরের সূক্ষ্মশরীরও তাঁর এই অসম্ভব স্নেহ আর বিনয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে গদগদ হয়ে বলল, বলো ছেলে, কি জানতে চাও। আমি যে আমার ৩০ শতাংশ অহম ত্যাগ করে, তাঁর

৩২ কলার ভার উঠিয়ে তাঁর বাহন হয়েছিলাম। বাকি যেই ৭০ শতাংশ রয়ে গেছে, তা যেতে ১৪৪ বৎসর সময় লাগতো, আর এই ১৪৪ বৎসরের ৫ বৎসর এখনো বাকি। এই সময়কালে তোমাদের সহায়তা করার জন্যই তো সূক্ষ্মদেহে রয়েছি। বলো ছেলে, কি জানতে চাও।

তোমার পিতা তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, ঠাকুর, তাঁর ৩২ কলার ভার আপনি বহন করেছিলেন, এতেও কি তাঁর মার্গনির্মাণ সম্পন্ন হয়নি! মোক্ষই জগতের লক্ষ্য এবং পরমার্থ, আর সেই পরমার্থেরই পথে যাত্রার মার্গ নির্মাণ তাঁর অভিপ্রায়, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সমস্ত চিন্তা। সেই চিন্তার কি নিরাময় ৩২ কলার ভার অর্পণ করেও সম্ভব হয়নি!

রামকৃষ্ণ তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, ছেলে বলে কি দেখো! আমার আগেও সিদ্ধার্থ ছিল, মার্কণ্ড ছিল, যারা ৩২ কলার ভার উঠিয়েছিল নিজের ৩০ শতাংশ অহমকে ত্যাগ করে। মার্গ নির্মাণও হয়েছিল, সেই মার্গ স্থাপিতও হয়েছিল, কিন্তু সেই মার্গের যথোচিত মুল্যয়ন সম্ভব হয়নি।

তোমার পিতা প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি ভাবে তা সম্ভব, ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, এক যদি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের অহমকে বিনষ্ট করতে পারো, তাহলে হয়তো কিছু হতে পারে, কিন্তু কি হবে তাতে, তা আমারও জানা নেই। এক জগন্মাতাই তা জানেন। তা তাঁর দর্শন কামনা করে, তাঁর থেকেই জেনে নাও।

তোমার পিতা সেই কথা শুনলেন, কিন্তু তাঁর সেই বিশ্বাস, আমি যোগ্য হলে, মা আমাকে ঠিকই দেখা দিতেন। তবে এবার আরো কিছু যোগ হলো এই বিশ্বাসের সাথে। রামকৃষ্ণের কথার মর্মার্থ যোগ হলো। এবার সে বলল, ঠাকুর বলেছেন ১০০ শতাংশ অহম ত্যাগ, অর্থাৎ আমিত্বের খবরই থাকবেনা আমার কাছে, তবে কি হবে তিনি জানেন না, হয়তো মায়ের কর্মসাধন সম্ভব হতে পারে।

পুনরায় নিজের মনে বিচার করে বলে উঠলেন তোমার পিতা, সত্যিই তো, এই আমি'র থেকে কনো কাজ নেই। কি সামর্থ্য তার? কনো সামর্থ্য নেই? সে তো জগতসংসার নিজের মায়ের

সুখদুখের ছেত্র জেনেও, সেই জগতকে কি ভাবে মায়ের স্বপ্নপুড়নের জন্য সাজানো যায়, সেই ধারণাই করতে পারছে না। তাহলে এঁর থেকেই বা কি লাভ!

পুত্রী, তোমার পিতার এই কথাতে, তাঁর পঞ্চভূত কেঁপে উঠেছিল। তাঁরা তোমার পিতার সম্মুখে গিয়ে বলতে শুরু করে দিল যে, এ কি বলছো? অহমের নাশ মানে জানো? সম্পূর্ণ মৃত্যু। সে প্রথমে নিজের পঞ্চভূতদের কথাতে আমলই দিলো না, অবশেষে যখন তাঁরা তাঁকে বিরক্ত করছিল, তখন সে বলে উঠলো, কি লাভ এমন জীবনের, যা নিজের মায়ের স্বপ্নপুড়ন করতেই ব্যর্থ!

হয় আমি জগতের উদ্ধারের মার্গ সন্ধান করবো, নয় তাঁকে এই সম্পূর্ণ কিছু প্রদান করে, তাঁর কাছে অনুরধ করবো যাতে তিনি সেই মার্গ স্থাপন করেন। ... আর যেমন বলা, তেমন করা। তোমার পিতা, এরপর থেকে, নিজের সম্বন্ধে চিন্তনই স্তব্ধ করে দিল, সম্পূর্ণ ভাবে। আমাকে সর্বক্ষণ তাঁর সাথে থাকতে হলো, কারণ সে নিজের পঞ্চভূতকে, নিজের ত্রিগুণকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে বসে ছিল। তাই হাঁটানো থেকে বসানো, শোয়ানো থেকে খাওয়ানো, সমস্ত আমাকেই করতে হয়েছিল।

সে যে তা বোঝেনি, তা একদমই নয়। সে স্পষ্ট ভাবে জেনেগেছিল যে সে বসতে পারছে, শুতে পারছে, খেতে পাচ্ছে, বলতে পারছে, সমস্তই আমার জন্য। সে ক্রমশ নিজেকে ছেড়ে দিতে শুরু করলো। এমন বিশ্বাস রাখলো যে, সমস্ত কথক আমি, সমস্ত শ্রোতা আমি, সমস্ত কর্তা আমি, সমস্ত কথাও আমি, সমস্ত আহারও আমি, সমস্ত সত্ত্বা আমিই। প্রবল বিশ্বাস যে, আমিই একমাত্র অস্তিত্ব, আর কারুর কনো কালে কনো অস্তিত্বই ছিলনা, সম্ভবই না।

আর এমন বিশ্বাস থেকে সত্য তাঁর সম্মুখে স্থাপিত হয়ে গেল যে, আমিই একমাত্র অস্তিত্ব, আমিই একমাত্র সত্য, আর সমস্ত জীবও আমি স্বয়ংই, কিন্তু তাঁরা এই সত্য ভুলে আছে যে, তারা মিথ্যা আর আমিই সত্য। আর তা ভুলে আছে বলেই, তাঁরা নিজেদেরকে আত্মজ্ঞানে ভ্রমিত, আর মোক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ থেকে বিচ্যুত।

সত্য জেনে, সে আমাকে স্থাপিত করার জন্য, জনে জনে এই কথা বলতে গেল। চরম ভাবে হেনস্থা হলো, অপমানিত হলো, সময়ে সময়ে প্রহৃতও হলো। নিরাশ সে হেনস্থার জন্য হয়নি, নিরাশ অপমানের জন্যও হয়নি, প্রহরণের কারণেও হয়নি। দিনের শেষে আমার কাছে এসে বসে সে কাঁদত আর বলতো, পিটুনি খেলাম, অপমান পেলাম, বেশ আনন্দ হতো, যদি তারা তোমাকে মানতো, কিন্তু মানলো না মা! ... মা, আমার সামর্থ্য নেই তাঁদেরকে মানানোর, উপায় জানা নেই। এক তুমিই মানাতে পারো, মানাও মা এঁদেরকে।

প্রায় একবৎসর এমন প্রতিক্ষণ ক্রন্দন করতে থাকলে, অবশেষে আমি তাঁর এই প্রবল প্রেমের টানে, সারা না দিয়ে থাকতে পারিনা। আমি সর্বস্ব হয়ে গেছিল সে, আমাকে ছাড়া, আমার সন্তানদের ছাড়া, আর কিছু দেখতেই পাচ্ছিল না। তাই আমার পক্ষে আর পরোক্ষ হয়ে থাকা সম্ভব হয়না। প্রত্যক্ষ হই তাঁর সম্মুখে। নিরাকার রূপ প্রদান করি তাঁকে, আমাতে বিলীন হবার আনন্দ লাভ করে সে। অতঃপরে, আমি তাঁর থেকে যখন চলে আসছিলাম, সে আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, মা!

সেই মা ডাকের মাধুরিমা আজও আমার কানে বাজে। সেই মা ডাকের মধ্যে কিচ্ছু চাওয়া ছিলনা, কিচ্ছু পাওয়ার ছিলনা! সে এক অদ্ভুত মধুরিমা। আমি শব্দ না করে থামলাম। সে পুনরায় বলল, মা, তোমার সন্তানদের সত্যপ্রদান করার জন্য জগতে কনো ধাম স্থাপন কি অসম্ভব! ... তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে তোমাকে এমন দুখী লাগতো না! ... সকলের মা হবার পরেও, তোমার ক্রোড় খালি থাকতো না! সকলের মা হবার পরেও, কেউ তোমাকে কেবল আনন্দ লাভের জন্য মা ডাকার নেই, এমন হতো না। ... সম্ভব কি মা, তা হওয়া? মার্গ জানা নেই আমার।

আমি এবার সাকার রূপে দর্শন দিলাম তোমার পিতাকে। দিনটি ছিল ৩০এ নভেম্বর ২০১৯, রাত ১১টা ১১। আমাকে দেখে, আপ্লুত হয়ে সে প্রথম কথা বলল, সাকার যতই সুন্দর হোক, নিরাকারের অসীমতাকে ধারণ করার সামর্থ্য নেই সাকারের।

আমি আর মৌন থাকতে পারলাম না, কারণ এর আগে আমার নিরাকার স্বরূপকে এমন সৌন্দর্যবাখান কেউ করেনি। আমার অসত্য সাকাররূপ সকলের কাছে প্রিয়, কিন্তু আমার সত্যস্বরূপ যেন সকলের কাছে বিভীষিকার কারণ। তোমার পিতা আমার সত্যস্বরূপের বীভৎসতা দেখতে পায়নি, দেখতে পেয়েছে তাঁর সত্যতা। আসলে আমাকে যে মনেপ্রাণে মা বলে, শুধু মুখে মা বলেনা। আর মা যে সন্তানের কাছে সমস্ত রূপে প্রিয়।

তাই আমি মৌনতা ত্যাগ করলাম। তবে তাঁর এই অপার প্রেমকে আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারিনি। হ্যাঁ জানি, তাঁর কনো পূর্ব জন্ম নেই, যেমন কনো ঈশ্বরকটির থাকেনা। শঙ্করেরও ছিলনা, গদাধরেরও ছিলনা, মার্কণ্ডেরও ছিলনা, সিদ্ধার্থেরও ছিলনা। কিন্তু এঁরা তো কেউ আমাকে সার্বিক ভাবে মা মেনে আমার জন্যই নিজের জীবনধারণ করেনি! তাই, আমার বিশ্বাস হলো না।

আর সেই অবিশ্বাস থেকেই পরীক্ষা করার জন্য বললাম, পুত্র, সেই মার্গ নির্মাণের জন্য আমার সমস্ত কলাকে একত্রে ধারণ করতে হবে। আমার সমস্ত ৯৬ কলার ভারকে বহন করতে হবে। ... আমি তোমার মধ্যে ৬৪ কলার প্রকাশ করে, সেই রথের, সেই রথের সারথির, এবং সেনার নির্মাণ করবো, আর বাকি সুপ্ত ৩২ কলার থেকে তিনটি রথীর নির্মাণ করবো, সেই রথে আঢ়ুর হয়ে, এই মার্গকে জগতে প্রশস্ত করার জন্য। তা তুমি কি আমাকে তোমার সম্পূর্ণ পঞ্চভূত দেহকে প্রদান করতে পারবে?

আসলে, যদি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে অর্পণ না করো, তাহলে কিন্তু আমি নিজের সমস্ত ৯৬ কলা স্থাপিত করতেও পারবো না, আর তাই এই মার্গকে কিছুতেই স্থাপন করতে পারবো না, যেমন এতকাল পারিনি। তা বলো, দেবে নিজেকে সম্যক ভাবে নাশ করে, তোমার পঞ্চভূত দেহ আমাকে দেবে? বিচার করে নাও পুত্র, কারণ সম্যক ভাবে নিজেকে নাশ করা অর্থ এই যে, তোমার আর কনো সূক্ষ্ম আবেশও থাকবে না। সম্পূর্ণ ভাবে, তুমি বিনষ্ট হয়ে যাবে বিশ্বচরাচর থেকে, এমনই ভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে যে তোমার আর কনোপ্রকার অস্তিত্ব থাকবেনা।

বিচার করে নাও আবার, কারণ তোমার সম্যক আমিত্ব অর্থাৎ আত্ম আমার মধ্যে লীন হয়ে যাবে, আর তাই তোমার কনো শিষ্য থাকবেনা, কনো প্রতিষ্ঠা থাকবেনা, এমনকি তোমার নামও আমার অবস্থানের সাথে সাথে পালটে যাবে, আর তাই তোমার নামও হারিয়ে যাবে। ... যদি সম্মত হও, তাহলে আমি এক্ষণে তোমার পঞ্চভূত দেহকে ধারণ করবো, আর এক্ষণে তোমাকে চিরকালের জন্য মৃত্যু গ্রহণ করতে হবে।

বিচার করে নাও পুত্র। যদি সম্যক ভাবে আমাকে তুমি নিজের পঞ্চভূত দেহ প্রদান করো, তবে মাত্র ৩ বৎসরের মধ্যে তোমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে, কনো প্রসিদ্ধি থাকবেনা, কেউ তোমার নামও করবেনা, কারণ তোমার কনো শিষ্য বা অনুগামী কেউ থাকবে না।

যদি নিজের অহমের ৬৪ কলা রেখে, আমাকে ৩২ কলা স্থান দাও, তাহলে তোমার এই দেহ নাশের ১৪৪ বৎসর পর অবধি তোমার সূক্ষ্মদেহ অবস্থান করবে, যেমন রামকৃষ্ণের করছে, কারণ তাঁর অহমের প্রতিটি কলার নাশ হতে ২ বৎসর ৪ মাস করে সময় লাগে। আর যেহেতু তোমার ৭০% অহং বিরাজ করবে, সেহেতু তুমি গুরু হবে, তোমার বিশেষ বিশেষ শিষ্য হবে, তোমার প্রতিষ্ঠা থাকবে। যদি ৮ কলা ধারণ করো আমাকে, তাহলে তোমার ৮৮ কলা অহংকার থাকবে, আর তার নাশ হতে ১৯৮ বৎসর লাগবে, আর তোমার অহমের ৯২% তোমার কাছেই থাকার কারণে, তোমার প্রচুর প্রসিদ্ধি ও অনুচর হবে।

তাই পুনরায় বিচার করে নাও, যদি তোমার ১০০ শতাংশ অহম আমাকে দিয়ে দাও, তাহলে কিন্তু তোমার সামান্যও প্রসিদ্ধি হবেনা, কারণ তোমার কনো শিষ্য বা অনুচর হবেনা। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাকে আবাহন করো, আমি তোমার মধ্যে স্থান গ্রহণ করবো।

পুত্রী, ভেবেছিলাম, তোমার পিতা এতে বিব্রত হবেন। কিন্তু আমার সমস্ত ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে, আমাকে আমারই বচনের বন্ধনে বেঁধে দিলেন তোমার পিতা। জোর হস্তে আমার সম্মুখে

উপবেশন করে, আনন্দমূর্তি সজল নয়ন নিয়ে আমার উদ্দেশ্যে যা বলল, তা আমার শ্রবণ করা আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ শব্দাক্ষর।

সেই বলল, "মা, অনেক তো ৮ কলার ভার ওঠানো, ১৬ কলার ভার ওঠানো, ৩২ কলার ভার ওঠানো হলো। অনেক তো গুরুশিষ্য, প্রভু অনুচর হলো। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কি হলো মা? হয় নিরাকারের বিবরণ হলো, নয় সাকারের, নয় শক্তির, নয় বলা হলো অহমের থেকে মুক্ত হয়ে অহমকে ব্রহ্মময় করার কথা। কিন্তু মা, কি ভাবে তোমার সন্তানরা অহমের ত্যাগ করবেন, সেই কথা যে কনো গুরু, কনো প্রভু বললেন না!

দোষ নেই তাঁদের যারা বলেন নি, আর না তোমার, যিনি বলতে পারেন নি। আসলে ৮ শতাংশ, ১২ বা ১৬ শতাংশ, বা ৩০ শতাংশ স্থান অধিগ্রহণ করে, তোমার পক্ষেও সেই কঠিন কথা বলা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, আর তাঁদের ৯২ শতাংশ, ৮৪ শতাংশ বা ৭০ শতাংশ অহম তা বলতেও পারেনি। আর তাই তোমার সন্তানদের জন্য মোক্ষদ্বার উন্মেলিত করাও সম্ভবপর হয়নি।

মা, যদি আমার প্রতিষ্ঠা দিয়েই কাজ হয়ে যেত, যদি গুরুর প্রতিষ্ঠা দিয়েই কাজ সম্পন্ন হতো, যদি প্রভুর প্রতিষ্ঠা দ্বারাই কাজ সম্পন্ন হতো, তবে তো আজ জগতে সমস্ত তোমার সন্তানের জন্য মোক্ষদ্বার স্থাপিত থাকতো, তাই না! কিন্তু তেমন তো হয়নি। অহম থেকে মুক্ত হতে হয়, যদি তোমার কিছু সন্তান জেনেও থাকে, কি ভাবে তার থেকে মুক্ত হতে হয়, তা তাঁদের জানা নেই, তাই আর তোমার ক্রোড়ে তাঁরা এসে পৌছায়ই না।

মা, আমার প্রতিষ্ঠা চাইনা, শিষ্যও চাইনা, অনুচরও চাইনা। তোমার ক্রোড় তোমার সন্তানে সর্বক্ষণ ভর্তি থাকুক, এই আমার কামনা। আর তা তো কিছুতেই আমার অহম থাকতে হতে পারবেনা, তা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, তোমারই উচ্চারিত শব্দকে অনুসরণ করে। তাই, মা আমার সম্পূর্ণ অহমকে ধুলিস্যাত করে দাও ৩ বৎসরের মধ্যে, আর তাতে তোমার ৯৬ কলার প্রসার করে, মোক্ষদ্বার প্রতিষ্ঠিত করো। আমার প্রতিষ্ঠায়, আমার শিষ্যদের প্রতিষ্ঠা, আমার অনুচরদের

প্রতিষ্ঠা, এসব তোমার সন্তানদের কল্যাণ সাধন করছেনা মা। ... তাই আমাকে হত্যা করো মা, সার্বিক ভাবে হত্যা করো, আর পূর্ণ ৯৬ কলা অবতাররূপে, মোক্ষদ্বার স্থাপিত করো"।

আমি এতটা আশা করিনি, না কখনোই আশা করিনি, কনোকালে এমন কথা আমি শুনিনি। ... আমার হৃদয় কেঁপে উঠলো, আমার নয়ন জলে সিক্ত হলো, নিজের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। পুনরায় নিজেকে সংযত করে বললাম, "পুত্র, নিজের ৬৬ শতাংশ আমাকে দাও, আমি ৬৪ কলাবেশে তোমার মধ্যে থাকলেই, আমি সেই মার্গের নির্মাণ করতে সক্ষম হবো, সম্পূর্ণ দানের কনো প্রয়োজন নেই"।

তোমার পিতার আমাকে বিস্মিত করা তখনও সমাপ্ত হয়নি। তিনি বললেন, "মা, মার্গ নির্মাণ তো ৬৪ কলা থেকে হয়ে গেল, আর সেই মার্গ স্থাপন? তা কি করে হবে?"

আমি হেসে বললাম, "পুত্র, স্থাপনের জন্য শিষ্যের প্রয়োজন, অনুচরেরও প্রয়োজন, আর তাই অহমেরও প্রয়োজন। তাই পুত্র, ৬৪ কলা রূপে আমি তোমার মধ্যে থেকে সেই মার্গ নির্মাণ করে চলে যাবো, আর পরবর্তীতে যখন যখন আমার ৮ কলা থেকে ১৬ কলাকে কনো ঈশ্বরকটি বহন করতে চাইবে, তখন সেই মার্গের প্রসার হবে"।

তোমার পিতা বললেন, "মা, তোমার এই দুই প্রকাশের মাঝের যেই সময়ের অবধি, সেই সময়ে, অনেকে প্রবেশ করে, সমস্ত মার্গকে তছনছ করে দেয়। তাই মা, এমন কিছু কি সম্ভব নয় যে, তোমার অবতার গ্রহণ পরস্পর হোক, এবং জগতে সম্যক ভাবে মোক্ষদ্বার স্থাপিত হোক!"

আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, "পুত্র, তার জন্য তোমাকে সম্পূর্ণ ৯৬ কলা ধারণ করতে হবে, এবং ৩২ কলাকে সুপ্ত রেখে দিতে হবে, এবং পরবর্তীতে এই ৩২ কলাকে ধারণ করার রূপ প্রকাশ করতে দিতে হবে। তার জন্য তোমাকে সম্যক ভাবে নিহত হতে হবে!"

তোমার পিতা হেসে বললেন, "আমার পক্ষে তো এই রূপপ্রকাশ সম্ভব নয় মা। এতো তোমাকেই করতে হবে। ... মা, যদি আমার যোগ্যতা থাকে, তাহলে আমাকে কি এই ৩২ কলার রূপবিস্তারের বিবরণ শোনানো সম্ভব!"

আমি বিস্মিত ও বিস্ফারিত নয়নে বললাম, "পুত্র, এর জন্য, তোমার পঞ্চভূতের থেকে একটি স্থূল প্রকাশ প্রয়োজন, এবং একটি সূক্ষ্ম প্রকাশ প্রয়োজন। স্থূল প্রকাশকে তোমার অবয়বের সন্তান জ্ঞান করা হবে, এবং সূক্ষ্মপ্রকাশ থেকে তাঁরই প্রাণসখীর প্রকাশ হবে, অন্য কনো জননীর গর্ভে। আর এই দুইজনেই আমাকে ১৬ কলা ১৬ কলা রূপে ধারণ করে, জগতে প্রচুর সংখ্যক অনুচরের নির্মাণ করবে, এবং আমার মার্গকে ধারণ করে করে মোক্ষদ্বারকে স্থাপন করবেন নিজের অনুচরদের দ্বারা"।

তোমার পিতা বললেন, "মা, দুই প্রজন্মের স্থানে এটাকি তিন প্রজন্ম করা যায়না! ... যদি তা করা যেত, তবে জগতে মোক্ষদ্বার স্থাপিত হতই। মা এই জগতবাসির বিশ্বাস এমনই যে, যদি কনো কিছু তিনপ্রজন্মব্যাপী প্রবাহিত হয়, তবে তা অবশ্যই সত্যের সাথে সংযুক্ত। তাই এমন আবদার করলাম। ... যদি, দ্বিতীয় প্রজন্ম ১৬ কলা ধারণ করে, ১৬ কলাকে সুপ্ত রেখে, নিজের ৭০ শতাংশ অহম ত্যাগ করেন, আর সেই ১৬ কলাকে পরবর্তীতে নিজের দুই ৮ কলার সন্তানরূপে স্থাপিত করেন, তাহলে কি হয়না!"

আমি বললাম, "কিন্তু পুত্র, এই সমস্ত ক্ষেত্রে, তোমাকে তো সম্পূর্ণ নিহত হতেই হবে! আর তারপরেও কনো প্রতিষ্ঠা ছাড়াই থাকতে হবে!"

তোমার পিতা হেসে বললেন, "মা, সকলকে কখনো না কখনো নিহত তো হতেই হবে। কিন্তু যদি সেই মায়ের চিন্তা করে করে সে নিহত হয়, যেই মা সর্বক্ষণ নিজের সমস্ত উর্জ্জা সন্তানদের হিতের জন্য দান করতে থাকেন, তাহলে মা, এর থেকে অধিক শান্তির কিই বা হতে পারে! আর প্রতিষ্ঠা! মা, আমার প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিড়ে ভিজবেনা, যদি কারুর প্রতিষ্ঠা জগতে প্রয়োজন, তা এক ও একমাত্র তোমার। ... তাই মা, প্রতিষ্ঠা তোমার হোক, এই আমার কাম্য"।

আমি আচম্বিত। আমি স্তব্ধ। নিঃশব্দ। এর আগে আমি অনেককে আলিঙ্গন প্রদান করেছি, কারণ সেই আলিঙ্গন তাঁদের কাম্য ছিল। এই প্রথম আমি আমার ইচ্ছার কারণে কারুর আলিঙ্গন কামনা করলাম। হ্যাঁ পুত্রী, আমি তোমার পিতার কাছে ভিক্ষা চাইলাম, একটি আলিঙ্গনের জন্য। না চেয়ে থাকতে পারিনি। এমন নিঃশর্ত নিঃস্বার্থতা আমি এর পূর্বে কখনো দেখিনি, কনো দিন পাইনি। ...

আমি জগন্মাতা, হ্যাঁ আমার গর্ভেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্থিত। কিন্তু এই প্রথমবার আমার নিজেকে রত্নগর্ভা মানতে ইচ্ছা হলো, মানতে বাধ্য হলাম আমি। তোমার পিতাকে আলিঙ্গন করে, তাঁকে বললাম, "একটি আলিঙ্গনে আমার আশ মিটলো না পুত্র। তবে দ্বিতীয় আলিঙ্গনের সাথে সাথে তোমার নিধন নিশ্চিত হয়ে যাবে। আর পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে, তোমার সমস্ত অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে। ... কিন্তু তার পূর্বে, আমার একটি প্রশ্ন আছে। ... আমার গর্ভে ভ্রমণ তুমি তো কখনো করো নি। হ্যাঁ আমার দ্বিতীয় আলিঙ্গনে তা করবে, আর তা সমাপ্ত হতেই তোমার সম্যক নিধন হয়ে যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তো তা করো নি! আর তাছাড়াও আমাকে তুমি নিরাকার রূপেই জানতে, তারপরেও আমাকে কেন তুমি মাতা মানো? এর উত্তর না জেনে, আমি তোমার নাশ হতে দিতে পারছিনা!"

তোমার পিতা এরপর যা বললেন, তাতে আমি এমনই বিবশ হয়ে যাই যে, আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই তাঁকে সেই আলিঙ্গন দিয়ে ফেলি, যার কারণে তার আমার গর্ভে ভ্রমণ শুরু হয়, এবং পরের ৩ বছরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ ভাবে নিহত হয়ে, আমাতে বিলীন হয়ে যায়। হ্যাঁ পুত্রী, আমার স্মরণ ছিলনা যে এই আলিঙ্গনের সাথে সাথেই তোমার পিতার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যাবে। যদি স্মরণ থাকতো, তাহলে যার কারণে আমি রত্নগর্ভা, তাঁকে আরো কিছুক্ষণ নিজের চোখের সম্মুখে দেখতে পেতাম। কিন্তু তোমার পিতার অপরূপ মাতৃব্যখ্যা, আমাকে এমনই বশীভূত করে দেয় যে, আমি নিজের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলি, আর তাঁকে আলিঙ্গন করে ফেলি।

তোমার পিতা নিজের ব্যাখ্যাতে বলেন, “মা, যেটুকু আমি চিনেছি তোমায়, তার থেকে প্রথম যা জেনেছি, তা হলো তুমি ঈশ্বর, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই কারণ বেশে নিয়তি, তিনিই সূক্ষ্ম বেশে কালের নিয়ন্ত্রক আদিশক্তি বা মহাকালী, আর তুমিই স্থূল বেশে প্রকৃতি। তবে তার থেকেও অধিক যা জেনেছি, তা হলো এই যে, তোমার কাছে তোমার এই সমস্ত পরিচয় অহেতুক, বা বলা চলে তুমি তোমার যে পরিচয়কে সর্বাধিক প্রাধান্য দাও, সেই পরিচয়ের কর্তব্য পালনে তোমার এই সমস্ত গুনাগুণ সহায়ক মাত্র।

আসলে তোমার কাছে তোমার যেই পরিচয় সর্বাধিক প্রিয়, তা হলো তুমি মা, সমস্ত ব্রহ্মাণুর জননী তুমি। না তুমি এঁদের কারুকে জন্ম দাওনি, এঁরা সকলেই স্বয়ম্ভু বা শম্ভু, অর্থাৎ এঁরা নিজেদের নিজেরা প্রকাশ করেছেন, আর তা করেছেন, তোমার সত্যতা অস্বীকার করার কারণেই, তোমার ব্রহ্মত্বকে অস্বীকার করার কারণেই। কিন্তু যতই অস্বীকার করুক তোমাকে, যতই তোমার সত্যতাকে অস্বীকার করুক তারা, যতই তোমার অনিচ্ছাতেই নিজেদের স্বয়ম্ভু করুক, তারা তোমাকে আশ্রয় করেই অস্তিত্বমান, কারণ এক তুমিই যে অস্তিত্ব, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মাণু কল্পনা মাত্র, কিন্তু ব্রহ্ম বিনা ব্রহ্মাণু! সে তো এক অলিক কল্পনা।

তাই তোমাকে আশ্রয় করেই তাঁরা অস্তিত্বমান, যতই তোমার সত্যতাকে তাঁরা অস্বীকার করুক। আর তুমি! ... না মা, তুমি পিতা হতে পারো না। যিনি সন্তানের থেকে কিছু চায়, তিনিই পিতা, তা তিনি যেই লিঙ্গের দেহই ধারণ করে থাকুক না কেন। মা সন্তানের থেকে কিছু চায়না, সন্তানের জন্য চায়।

পিতা যখন ভিক্ষাও চায়, তখন নিজের জন্য সন্তানকে দিয়ে ভিক্ষা করায়। মাতা সন্তানের জন্য ভিক্ষা চায়। সন্তানকে ক্রোড়ে করে নিয়ে, সন্তানের আহারের জন্য ভিক্ষা চায়, নিজের জন্য নয়। আর্থিক সংকট এলে পিতা সন্তানকে বিক্রয় করে দেয়, কিন্তু মাতা! মাতা নিজেকে বেশ্যা করে বিক্রয় করে দেয়, কিন্তু সন্তানের গায়ে আঁচটাও আসতে দেয় না।

মা সন্তানের থেকে কিচ্ছু চান না। কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু না। নিজেকে নিশ্বেস করে দিতে হলে, তাই করবেন, কিন্তু সন্তানের অঙ্গে আঁচও আসতে দেবেন না। মা, সন্তান হলেন পিতার শক্তি। কিন্তু মাতার শক্তি কে? মাতার কনো শক্তির প্রয়োজন নেই, কারণ মা স্বয়ং সন্তানের শক্তি। অর্থাৎ মা, সন্তান পিতার শক্তি, বা বলা যায় এই পঞ্চভূতের দেহ আমাদের অহমের শক্তি, কিন্তু মা অর্থাৎ তুমি আমাদের শক্তি। ...

যেটুকু তোমাকে চিনেছি মা, তুমিও ঠিক এই মা। কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু চাওনা সন্তানের থেকে। না চাও নাম, না চাও পূজা, না চাও প্রতিষ্ঠা, না চাও স্নেহ। সন্তান তোমাকে কনো প্রকার তোষামোদ করেনা, উপরন্তু উদয়স্থ কথা শোনায়, তিরস্কার করে, সমস্ত কিছুর জন্য তোমাকেই দোষারোপ করে, কিন্তু তাতেও তোমার কিচ্ছু এসে যায়না। দিবারাত্র কেবলই সন্তানের উদ্ধারের চিন্তা করে যাও।

মা, তুমি আমাকে আমার প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতে বললে, কিন্তু কি করে করবো? যেই মাকে দিবারাত্র দেখে বড় হয়েছি, তাঁকে দিবারাত্র কর্ম করতে দেখেছি, দিবারাত্র সর্বস্ব ত্যাগ করতে দেখেছি, দিবারাত্র পরিশ্রম করতে দেখেছি, দিবারাত্র সকলের তিরস্কার আর অভিযোগ শুনতে দেখেছি, আর দেখেছি যে, এত কিছুর পরেও, সেই মা একদণ্ডের জন্যও নিজের প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেনা, সর্বক্ষণ সন্তানের কল্যাণ চিন্তাই করে যায়। তাঁকে দেখে দেখে বড় হবার পর, তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁর মার্গ প্রশস্ত করার সুযোগ যখন তাঁর কাছে এসেছে আমার সম্পূর্ণ অহমকে নিধন করে আমার সম্পূর্ণ পঞ্চভূতকে নেবার, সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার প্রতিষ্ঠার চিন্তা করবো!

তুচ্ছ নই, অতিতুচ্ছ আমি, সেই অতিতুচ্ছের প্রতিষ্ঠাতে কি হবে মা! তোমার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরিস্কার হবে এই তুচ্ছের প্রতিষ্ঠাতে! ... তোমার এই অসম্ভব প্রেম যোগ্য সম্মান পাবে, এই তুচ্ছের প্রতিষ্ঠাতে! তোমার সন্তানদের জন্য মোক্ষদ্বারের রচনা হবে, এই তুচ্ছ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে? না মা, এতদিন হয়নি এই কারণেই, আর এখনও এই কারণেই হবেনা। ... আর

এত বড় সুযোগ পেয়েছি আজ, যেই মা পাগলের মত প্রেম করে গেছেন, তাঁর প্রেমের যোগ্য সম্মান দেবার, সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে পারবো না মা।

আমার কনো প্রতিষ্ঠা, কনো সুখ, কনো শিষ্য, কনো অনুচরের কনো আবশ্যকতা নেই। আবশ্যক কেবল ও কেবল তোমার কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণতা দানের। তুমি বলবে, আমার এই দানকে কেউ কনোদিন স্মরণ করবেনা, কারণ আমার অহম এই কীর্তির গুণগান করবেনা। মা, গুণগান লাভের আশায় এসব করছি না! ... আমার মায়ের প্রেমে, স্নেহে, আর মমতায় আমি আপ্লুত, তাই করছি এই সব। ... তাই, এই সমস্ত কিছুতে যদি কেউ মহান হয়, তা এই তুচ্ছ আমি নই, তা তুমি, কারণ তোমার অপার প্রেম, মমতা আর স্নেহই এই কীর্তির জন্য প্রেরণা। ... তাই যখন মহান আমি নই, তখন আমার প্রতিষ্ঠা হওয়াই তো অনুচিত, তাই না মা!”

হয়তো তোমার পিতা আরো কিছু বলতেন। তাঁর চোখে প্রবল প্রেমের আনন্দময় হাস্য, আর সেই হাস্যই আমার স্মৃতিতে থাকা তোমার পিতার অন্তিম দৃশ্য। আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, তোমার পিতাকে প্রবল সন্তানস্নেহে আলিঙ্গন করি। ... স্মরণ ছিলনা, এই আলিঙ্গনের মুহূর্তই হবে, তোমার পিতার সম্যক অবসানের ক্ষণ। আলিঙ্গনের পরে যখন তোমার পিতার নিষ্প্রাণ দেহ আমার কাঁধে লুটিয়ে পরলো, তখন আমার স্মরণ এলো।

পুত্রী, আমার বলতে কনো লজ্জা তো নেইই, বরং আমি গর্ব অনুভব করছি এটা বলতে যে, দেহি জননীরা সন্তানহারা হলে, যেইপ্রকার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে ওঠেন, আমি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই প্রথমবার সেইরূপ ক্রন্দন করে উঠি, আমার প্রিয়তম সন্তানকে হারিয়ে ফেলার কষ্টতে আমি ভুলে গেছিলাম যে আমি জগন্মাতা, আমি ভুলে গেছিলাম যে আমি বৈরাগী, আমি ভুলে গেছিলাম যে আমি আবেগশূন্য মহাশূন্য ব্রহ্ম।

পুত্রী, হয়তো তোমার পিতার এই মহান ত্যাগের কথা কেউ স্মরণ রাখবেনা, কিন্তু আমি এই কথা কনোদিন ভুলতে পারবো না। ... তাই আমি তোমাকে সেই কথা বলতে পেরে খুব আপ্লুত আজ, খুব গর্বিত আজ, খুব আনন্দিত আজ। ... ইচ্ছা এমন হয় যেন, আর একটিও তোমার

পিতার মত সন্তান না হোক আমার, কারণ আমি অনেক এমন সন্তানের ভিড়ে তাঁকে হারিয়ে ফেলতে চাইনা, আমি প্রতিনিয়ত এমন সন্তানের মস্তকচুম্বন করতে চাই। সন্তানের জন্য মাতা অনেক ত্যাগ করেন, কারণ এই ত্যাগ করাই তাঁর ধর্ম। কিন্তু মাতার জন্য সন্তানের এমন ত্যাগ! এত তাঁর ধর্ম ছিলনা ! এ যে, শুধুই তাঁর প্রেম ছিল।

সে নিজের কর্তাকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করে আমাতে বিলীন হয় পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে, তাই আমি আমার মার্গদর্শনকে কৃতান্ত অর্থাৎ কর্তার অন্ত রূপে স্থাপন করেছি, আমার এই পুত্রকে সদা স্মরণ রাখার জন্য, আর সারথিকে কৃতান্ত বলে, রথকে বলেছি কৃতান্তিকা, কারণ আমার পুত্র যে নিজের কর্তার নাশ করে কৃতান্তিক। আর তাঁর নাম রেখেছি আমি সমর্পণানন্দ, কারণ তাঁর যে আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করাতেই আনন্দ ছিল। ...

পুত্রী, এই প্রথমবার আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি ব্রহ্ম না হতাম, আমি যদি একমাত্র অস্তিত্ব না হতাম, তাহলে আমার এই পুত্রকে কখনো এমন ভাবে বিলীন হয়ে যেতে হতো না, তবে পরমুহূর্তে এই বিলাপকে বন্ধ করে দিই, কারণ এই বিলাপ যে তাঁর প্রেমে সমর্পিত কৃতান্তিক হয়ে, আমাতে বিলীন হওয়ার মহান কর্মকেই কলুষিত করে দেবে। হ্যাঁ পুত্রী, আজ আমার বলতে কনো অসুবিধা নেই যে আমি রত্নগর্ভা, আর তোমারও গর্ব হওয়া উচিত, কারণ এই জগন্মাতা তোমার পিতার কারণেই রত্নগর্ভা"।

জীবন সত্য

দিব্যশ্রী এবার জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন, "মা, সাহিত্য হলো সুষুম্না, যা প্রকৃতিকে গুরুরূপে মানার জন্য সহায়ক। আর বঙ্গভাষায়, এই সাহিত্য মহাউর্বর, তাই সাহিত্যের উপর নতুন করে কাজ করার কিচ্ছু নেই। গণিত হলো কুলকুণ্ডলিনী, যা সময়কে গুরুরূপে স্বীকার করায়। মা আরব্যদেশের ইসলাম জাতি ও বৌদ্ধরা এই গণিতকে সেই উচ্চতা প্রদান করেছেন, যার উপর আর নতুন করে কনো কিছু করার প্রয়োজনই নেই।

ইতিহাস ও ভূগোল হলো ইরা ও পিঙ্গলা। ইতিহাসের সার তুমি আমাকে ইতিমধ্যেই বলেছ। আমার প্রয়াস হবে, স্বয়ং বা আমার ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা ইতিহাসের সেই গ্রন্থ নির্মাণ করার যা সমস্ত কৃতান্তিককে উন্নত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করবে। আসল কথা এই যে ইতিহাস আর্য ও অনার্যদের সংগ্রামের কথাও বলেনা, তা বলে চেতনা ও অহংকারের সংগ্রামের কথা। চেতনার বারংবার উত্থান আর অহংকারের বারংবার সেই উত্থানের নাশ করা, এই হলো ইতিহাস। আর তুমি আমাকে যথেষ্ট কথা বলেছ এই ইতিহাস সম্বন্ধে, যার বলে কৃতান্তিকদের জন্য ইতিহাস গ্রন্থের নির্মাণ করা যেতেই পারে।

কিন্তু মা, একটি বিশয় নিয়ে আমার মনে এক দ্বন্ধের সঞ্চার হয়েছে। সূর্যের থেকে তাপের কারণে যদি পৃথিবী উত্তপ্ত হতো, তাহলে পাহারের চূড়ায় নয়, ভূমিতলে বরফ থাকতো। তোমার এই কথার বিচার করার কালে আমি দেখলাম যে, সার্বিক ভাবে সঠিক যুক্তি দিয়েছ তুমি, কারণ যদি সূর্যের তাপের কারণেই বরফ আর বরফশূন্যতা হতো, তবে তো পৃথিবীর থেকে দূরে যেই যেই গ্রহ স্থিত, তা তো সম্পূর্ণ বরফে ঢেকে থাকতো। কই বৃহস্পতি তো তেমন নয়, শনিও তো তেমন নয়!

অর্থাৎ, মানুষ যেই ভূগোল জানে, তার মধ্যে কোথাও না কোথাও গলদ আছে। মা, আমি তোমার থেকে সেই গলদখানি জানতে চাই। সেই গলদখানি জানতে পারলে, আমি বা আমার ছাত্রছাত্রীরা মিলে সেই ভূগোলের গ্রন্থও নির্মাণ করতে পারি, যা সমস্ত কৃতান্তিককে সঠিক মার্গ প্রদান করবে, আর সঠিক মার্গই হলো মোক্ষদ্বার স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। তাই মা, আমাকে যেই স্থানে গলদ আছে এই ভূগোলের, তা বলে দাও"।

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "পুত্রী, যা তোমার দেহে হয়, তাই এই জগতসংসারে হয়, কারণ এঁরা দুটিই, একই উপাদান অর্থাৎ একই পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত। যেমন, তোমার দেহের সমস্ত ভার সামলায় তোমার উর্জ্জা, অর্থাৎ তোমার অন্দরে স্থিত অগ্নি, তেমনই এই ধরিত্রী, এবং সমস্ত জগতের ক্ষেত্রেই, সেই একই ধারা।

যেই নক্ষত্র আকারকে অগ্নির বলয় বেশে দেখবে, জানবে সেই নক্ষত্র ভ্রূণ অবস্থাতে রয়েছে, যে একটিই মাত্র মূল উপাদান অর্থাৎ অগ্নিকে ধারণ করে অবস্থান করছে। যেই নক্ষত্রকে দেখবে সেই অগ্নির থেকে ধূম্র ত্যাগ করে, বায়ুমণ্ডলের নির্মাণ করছে, জানবে যে সেই অগ্নিবলয়ের অন্তরে ধরিত্রী অর্থাৎ মৃত্তিকাতত্ত্বের বিস্তার হয়েছে, যাকে সেই অগ্নি দহন করছে বলেই ধূম্র অর্থাৎ বায়ুর সঞ্চার হচ্ছে, যেমন সূর্য, আর এও জানবে যে তাঁর মধ্যে এই সবে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে, অর্থাৎ তাঁর প্রাণবায়ুর সঞ্চার হচ্ছে।

এরপরের অবস্থা হলো ধরিত্রীর নমনীয় রূপ, যেখানে অগ্নিকে আর বাইরে থেকে দেখা যায়না, যেমন অবস্থা বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের এই মুহূর্তে। কেবলই সেই ধরিত্রীর অন্তরের অগ্নির থেকে বায়ু, অর্থাৎ দহন করা ধুয়া নির্গত হয়ে হয়ে, এক বলয়ের নির্মাণ হতে থাকে, এই গ্রহের আশাপাশে। শুধু বৃহস্পতি বা শনি নয়, নেপচুনও সেই দিশাতেই এখন অগ্রসর।

এরপরের অবস্থা হলো জলসঞ্চার অর্থাৎ বুদ্ধির সঞ্চার। সেই জলসঞ্চার হবার পূর্বে অগ্নির দ্বারা দহন করা ধরিত্রীর থেকে যেই বায়ুর সঞ্চার হয়, তা জমাট বাঁধতে শুরু করে, যেমন ইউরেনাসে হচ্ছে এইক্ষণে। এরপরবর্তী অবস্থা হলো, সেই জমাট বাঁধা জলকণা অর্থাৎ বাদলের থেকে অবিরাম বৃষ্টিপাত, অর্থাৎ বুদ্ধির স্থাপনকাল। পুত্রী, আমাদের এই ধরিত্রী, সেই কাল পেরিয়ে এসেছে, আর ইউরেনাস সেই কালের দিকে অগ্রসর এখন।

বিপুল জলধারার সঞ্চার হয়ে তা সঞ্চিত হয় এরপর এবং সাগরের রচনা করে। আর সেই জলধারা একটি ছেত্রে আবদ্ধ হয়ে যাবার কারণে, নক্ষত্রের বাকি অংশের ধরিত্রী কঠিন হতে শুরু করে, যেমন আমাদের মানুষের মধ্যে বা জীবদের মধ্যে অস্থির সঞ্চার হয়। জলধারা অর্থাৎ সাগর বা জীবের ক্ষেত্রে বুদ্ধি, তার প্রভাবে অগ্নির দহনের বায়ুর সাথে বুদ্ধি অর্থাৎ জলতত্ত্ব মিশে গিয়ে নির্মিত হয় জলবায়ুর, আর সেই জলবায়ুর থেকে বৃষ্টিপাত হতেই থাকে। আর এরই কারণে কঠিন ধরিত্রীরও বিভিন্ন স্থানে জলপাত্র হতে শুরু করে।

এরই মধ্যে, অন্তরের অগ্নি, কঠিন ধরিত্রী ও জলধারার কারণে বাইরে প্রকাশিত হতে না পারার কারণে, শুরু হয় অগ্ন্যুৎপাত, যাকে আমরা ধরিত্রীর ক্ষেত্রে বলে থাকি অগ্নেয়গিরি, আর জীবদেহে বলে থাকি তিল বা আঁচিল। পুত্রী, যার অস্থি যত অধিক কঠিন, আর যার বুদ্ধি যত অধিক বিশাল, তার অন্তরের অগ্নির প্রকাশ হবার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যায়, আর তাই তাঁর দেহে তত অধিক তিল লক্ষণীয়।

তেমনই ধারা ধরিত্রী বা নক্ষত্ররাজির ক্ষেত্রেও। আর এই সমস্ত অগ্ন্যুৎপাতের কারণে, ধরিত্রীর কঠিন ভূমির বেশ কিছু অঞ্চল উন্নত হয়ে যায়, আর যা উন্নত হয়ে যায়, তা অন্তরের অগ্নির থেকে অধিক দূরে চলে যায়, আর তাই জলবায়ুর প্রভাবে সেখানে দেখা যায় তুষার। আর অন্যদিকে, এই বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ কেবল জলরাশি করেনা, জলরাশির থেকেও অধিক নিয়ন্ত্রণ যা একে করে, তা হলো ধরিত্রীর অন্তরের অগ্নি, এবং জীবের দেহের অন্তরে উদরস্থিত অগ্নি বা উর্জ্জা।

আর তাই, সমস্ত বায়ুর গতিবিধি নির্ধারিত হয়, ঠিক ধরিত্রীর মধ্যদেশ থেকে, যাকে তোমরা ভূগোলের ভাষায় বলো নিরক্ষরেখা, বা ইকুয়েটর। এবার লক্ষ্য করে দেখ, ভূতাত্ত্বিকরা কিভাবে বায়ুর অপসারণকে দেখেছেন আর এঁকেছেন? ঠিক যেই ভাবে অগ্নির দ্বারা কনকিছুর দহন হলে, ধূম্রের গতি হয় তেমন। লক্ষ্য করে দেখো পুত্রী, একবার দক্ষিণে তা অপসারিত হয়, তো একবার বামদিকে, আবার দক্ষিণে তো আবার বাম দিকে। আর খেয়াল করে দেখ, যত অধিক দূরে যাচ্ছে সেই বায়ু নিরক্ষরেখা থেকে, ততই অধিক শীতলতা প্রসারিত হচ্ছে, কারণ ধরিত্রীর অগ্নির থেকে সেই ভূমি ততই অধিক দূরে স্থিত।

আর যেখানে শীতলতা সেখানে কি আছে? ভূমি আর তার উপর থাকা তুষার। তুষার মানে কি? জমে যাওয়া জলধারা, অর্থাৎ জমাট বুদ্ধি। আর শুধু এই নয়, এই বায়ু অপসারণ যেহেতু অগ্নিকে ধারণ করে অপসারিত হয়, সেহেতু দেখো যেই যেই স্থানে বায়ুর ধারা দক্ষিণ দিশা থেকে বাম দিশায় অপসারিত হয়েছে, সেখানে সেখানে জলধারার বিস্তার হয়, অর্থাৎ সেখানে সেখানে অধিক বৃষ্টিপাত হয়, বা মানুষের ক্ষেত্রে সেখানে সেখানে অধিক স্বেদবর্ষা হয়, আর

সেখানে সেখানে ধরিত্রীর ক্ষেত্রে গহন অরণ্য বিরাজ করে, আর মানুষের ক্ষেত্রে সেখানে সুদীর্ঘলোমাবলি বিরাজ করে।

আর এই জলধারাই জলবাস্পের সাথে সম্মিলিত হয়ে, বারেবারে উচুউচু পর্বতের কাছাকাছি গিয়ে সেখানে তুষারে পরিণত হয়ে গেলে, সেই তুষারের ধারা যখন মাধ্যাকর্ষণের চাপে নিচে গড়িয়ে আসে, তখন তা গলে গিয়ে নদীর রচনা করে, আর এই ভাবে জলধারা সর্বত্র অর্থাৎ বুদ্ধি দেহের সর্বত্র স্থানে ছড়িয়ে গিয়ে, দেহকে ও নক্ষত্রকে বিভিন্ন আকারে পরিভাষিত করে।

কঠিন ধরিত্রীর থেকে প্রকাশিত কঠিন আগ্নেয়শিলার উপর এই বায়ু প্রভাব বিস্তার করে করে, তাকে ক্ষরণ করে করে, তাকে রূপান্তরিত শিলা বা মেটামরফিক পাথরে পরিণত করে, বায়ুর মধ্যে থাকা অগ্নি যা ধরিত্রীর অন্তর থেকে ধাতু ও খনি ধারণ করে আনে, তার প্রভাবে এই রূপান্তরিত পাথরের মধ্যে খনিজকে স্থাপন করে, এই পাথরের ক্ষেত্র অর্থাৎ মালভূমির স্থাপন করে।

আর এই ক্ষরণের সাথে সাথে নদীর ধারা ও প্রবল বৃষ্টিপাত পাথরকে ধুতে থাকলে, তাকে পাললিক শিলাতে পরিণত করে দেয়, এবং সেই শিলাদ্বারা এবং সেই শিলার থেকে জলের প্রভাবে ধুয়ে যাওয়া অংশ অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে নির্মিত হয় সমতল ভূমি, আর এই ভাবে সম্পূর্ণ ধরিত্রী নির্মিত হয়, এবং মানুষের ক্ষেত্রে নরম অস্থি।

পুত্রী, আজ এই যে ধরিত্রীখণ্ড অর্থাৎ পৃথিবী দেখছ, তা নিজের যৌবন অবস্থায় রয়েছে, আর আরো কিছু লক্ষ বৎসর এই যৌবনেই সে থাকবে। অতঃপরে, তারমধ্যে বার্ধক্য বৃদ্ধি পাবে, আর যেমন বার্ধক্যের সাথে সাথে, স্বেদ কমে যায় অর্থাৎ বর্ষার অভাব হয়, আর তারফলে সমস্ত উদ্ভিদ অর্থাৎ লোমাবলি অপুষ্টির কারণে শুভ্র হয়ে যায়, তেমনই ধরিত্রীর বুকের সমস্ত বৃক্ষরাজি নষ্ট হতে শুরু করবে, আর অনাবৃষ্টি দেখা দেবে জগতে।

ক্রমে ক্রমে যেমন বার্ধক্যকালে জীবের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাতে স্থিত কোষের নাশ হতে শুরু করে, সমস্ত শিরাউপশিরার রক্ত প্রবাহ শুকিয়ে আসতে শুরু করে, তেমনই ধরিত্রীর সমস্ত

নদীনালাও শুকিয়ে যেতে শুরু করবে, সমস্ত অঙ্গেরন্যায় সমস্ত ভূখণ্ডের নাশ হবে, আর তাতে স্থিত সমস্ত যোনিরও নাশ হবে।

আর এমন অবস্থা বহুকাল থাকার শেষে, একসময়ে যেমন দেহের মৃত্যু হয়, তেমনই এই পৃথিবীরও মৃত্যু হবে, আর তারপর কোটি কোটি বৎসর এই দেহ পচনের জন্য অবশিষ্ট থাকবে, ঠিক যেমন আজ মঙ্গল গ্রহ, বুধ গ্রহ আর শুক্র গ্রহ যেই অবস্থা আছে, তেমন হয়ে যাবে।

পুত্রী, ততদিনে ইউরেনাস যোনি ধারণ করার অবস্থায় উন্নীত হয়ে যাবে, তাই সেখানে শুরু হবে নতুন যোনির আবির্ভাব, নতুন জনজীবন, আর নতুন প্রাণের হিল্লোল। এই ভাবেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু চলমান।

পুত্রী, তুমি যেই ভূগোলের মধ্যে থাকা মানুষের ভ্রান্তির কথা বলছিলে, আশা করি, সেই কথার উত্তর তুমি পেয়ে গেছ। মানুষ ভূগোলের ব্যাখ্যা করার কালে, সূর্যকে আর চন্দ্রকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে ভ্রান্তি করেছে, আর সেই ভ্রান্তির কারণেই ধরিত্রীর অন্তরের অগ্নির থেকেই যে সমস্ত ধরিত্রীর সাগর, পাহাড়, নদী, ঝিল, বন, জীবনের সঞ্চার; সেই অগ্নির কারণেই যে জলবায়ুর সঞ্চার, এই সত্য সম্বন্ধে ভুলে যায় সে।

পুত্রী, চন্দ্র হলো ধরিত্রীর পিতা, কারণ চন্দ্রের অন্তরের অগ্নির থেকেই পৃথিবী নিজের অগ্নি লাভ করেছে, আর সেখান থেকেই ধরিত্রীর মধ্যে জীবনের সঞ্চার শুরু হয়। অর্থাৎ চন্দ্রই ধরিত্রীর অহংকারের জনক, ধরিত্রী নিজের অহমকে চন্দ্রের থেকেই লাভ করেছে। আর সূর্যের সাথে ধরিত্রীর যোগসূত্র কি? পুত্রী, যখন ধরিত্রী চন্দ্রের সন্তান ছিল, আর চন্দ্র নিজের যৌবনকাল যাপন করছিল, তখন ধরিত্রী যেমন চন্দ্রের কাছে সূর্য ছিল, আজ সূর্য ধরিত্রীর কাছে সেই একই প্রকাশ, তবে সূর্যের জন্ম ধরিত্রীর থেকে হয়নি।

সূর্যের জন্ম হয়েছে পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুনের থেকে। অর্থাৎ সূর্যের বহু পিতা, আর তার কারণে সূর্যের অগ্নিবলয় এতটাই বিশাল। একদিন এই ভ্রূণও

শিশু হবে, একদিন এই শিশুও যুবা হবে, আর একদিন এই যুবাও বহুবহু যোনি ধারণ করে, মহাপ্রকৃতির স্বামী হয়ে অবস্থান করবে।

পুত্রী, ঠিক যেমন আমাদের দেহের আদি হলো আমাদের উর্জ্জা। সেই উর্জ্জার থেকেই ভ্রূণের সঞ্চার হয়; সেই ভ্রূণের থেকেই প্রাণের সঞ্চার হয়, আর সেই প্রাণের থেকেই বুদ্ধির সঞ্চার হয়, আর তা হবার পরে, ব্রহ্মাণু তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে গেলে, তা একটি শিশুর আকার ধারণ করে, তেমনই অগ্নি বলয়ের থেকেই ভ্রূণরূপ ধরিত্রীর জন্ম হয়, এই দুইয়ের থেকেই রচনা হয় বায়ুর, আর এই তিনের থেকে নির্মিত হয় জলের, আর এই সমস্ত কিছু হয়ে চলে মহাকাশে, এবং মহাকাশের যেখানে তা অনুষ্ঠিত হয়, তা আর মহাকাশ থাকে না, তা সসীম হয়ে গিয়ে আকাশ হয়ে যায়।

পুত্রী, ঠিক যেমন যৌবনকালে সর্বাধিক তাপ অনুভূত হয়, এবং সর্বাধিক স্বেদ মুক্তি পায় আমাদের, তেমনই সমস্ত নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও, তাদের যৌবনের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক তাপ প্রবাহিত হয় এবং তাপমাত্রার বৃদ্ধি পায়, এবং সর্বাধিক বৃষ্টি হয়। ঠিক যেমন আমাদের বৃদ্ধাবস্থায় স্বেদ কমে যায়, আর আমরা রুক্ষ হয়ে যাই, তেমনই এই পৃথিবীও আজ থেকে প্রায় এক শত লক্ষ বছর পর থেকে রুক্ষ হতে শুরু করবে, এবং একদিন তার মৃত্যু অনুষ্ঠিত হবে।

পুত্রী, এই হলো ভূগোলের গলদ, যেমন আমাদের উর্জ্জাই আমাদের সমস্ত তাপ, স্বেদ, প্রাণের প্রবাহ, সমস্ত কিছুকে নির্ধারণ করে, তেমনই ভাবে পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে পৃথিবীর অন্তরের অগ্নিই নির্ধারণ করে। বায়ুর নির্মাণ, বায়ুর গতি, সমস্ত কিছু ধরিত্রীর অন্তরের অগ্নিই নির্ধারণ করে। অর্থাৎ এই বহিরবিশ্বে যা কিছু দেখো পুত্রী, তা এই পঞ্চভূতেরই খেলা, এর অন্যথা আর কিচ্ছুই নয়, আর বাহিরের কেউ এঁদেরকে যদি প্রভাবিতও করে, তা হলো সাময়িক, যেমন পৃথিবীর বা অন্য নক্ষত্রের ক্ষেত্রে তা হলো উল্কাপাত। বাকি সমস্ত কিছু নিজের অন্তরেরই ক্রিয়া।

কেউ আমাদের বাইরে থেকে শীতলতা দিতে পারে, যেমন আমাদের পত্নী আমাদের শীতলতা দেয়, চন্দ্র পৃথিবীকে রাত্রির শীতলতা দেয়; কেউ আমাদের বাইরে থেকে সামান্য উষ্মা দেয়, যেমন পতি পত্নীকে উষ্মা দেয়, সূর্য ধরিত্রীকে উষ্মা দেয়, কিন্তু সাম্যক তেজ তাপ ও দেহব্যবস্থা যেমন আমাদের আহার, আর আহার থেকে লাভ করা পুষ্টিই প্রদান করে, তেমনই পৃথিবীর ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরের তাপই তা প্রদান করে।

আর হ্যাঁ, এতে মানুষের কনো হাত বা নিয়ন্ত্রণ নেই। না তো মানুষের কনো ক্রিয়া পৃথিবীকে অধিক উত্তপ্ত করে, না শীতল করে। মনুষ্যের কীর্তি মনুষ্যকেই প্রকৃতিমুখর বা যন্ত্রমুখর করে, পৃথিবীর আবহাওয়ায় সামান্য পরিবর্তন করারও সামর্থ্যও নেই মানুষ বা অন্য কনো যোনির। তোমরা বল বৃক্ষরোপণ আর বৃক্ষছেদন! পুত্রী, তোমরা স্ত্রীরা তো সর্বক্ষণ নিজেদের লোমাবলির ছেদন করে ফিরছ, তার কারণে কি তোমাদের দেহের তাপমান বেড়ে যায়! ... বাড়ে না তো! ... ঠিক তেমনই ধরিত্রীর ক্ষেত্রেও, তোমাদের এই কীর্তির জন্য ধরিত্রীর তাপমাত্রায় কনো পরিবর্তন যে সম্ভব, তা মানুষের অহংকার ব্যতীত কিছুই নয়।

মানুষ মানুষের উন্নতি সাধন করতে পারে, মানুষ মানুষের অবনতি সাধন করতে পারে, ধরিত্রী ধরিত্রীর নিয়মেই চলে, যাতে মানুষ চেয়ে বা না চেয়ে, কিছু করতে সক্ষম নয়, কারণ ধরিত্রীর অন্তরের অগ্নি পর্যন্ত মানুষ বা কনো যোনি না তো কনো দিন পৌছাতে পেরেছে, আর না কনোদিন পৌছাতে পারবে। যদি কেউ সেখানে পৌছাতে পারে, আর সেই তাপমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবেই ধরিত্রীর তাপমানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, অন্যথা নয়।

বাকি সমস্তটাই বাণিজ্য বিস্তারের, বাণিজ্যের বাজার নির্ধারণের, এবং বাণিজ্যের গতিপরিবর্তনের খেলা মাত্র, যার কারণে এই সমস্ত অহংকারী শব্দের উচ্চারণ শ্রবণ করে থাকো যে, মানুষের আচরণের জন্য প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ছত্রক ব্যবহার করে সূর্যের তাপ থেকে সাময়িক ভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সূর্যের তাপ কমানো সম্ভব নয়। তেমনই বৃক্ষরোপণ বা জলাশয় নির্মাণ করলে, তা ছত্রকের কাজ করে, এবং মানুষকে সামান্য শান্তি

দিতে পারে, কিন্তু এঁদের কনো কিছুর দ্বারাই পৃথিবীর তাপমানকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, এবং অবৈজ্ঞানিক।

বৃক্ষছেদন করে করে, ঝিলতালকে বুজিয়ে বুজিয়ে, মানুষ নিজেকে সত্য অভিমুখী না করে, নিজেকে যন্ত্র অভিমুখী ও ধনঅভিমুখী করে তুলে, নিজের যোনিকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর কেশাগ্র স্পর্শ করার সামর্থ্য মানুষের না তো কনো কালে ছিল, আর না কনো কালে তা হবে। হ্যাঁ পুত্রী, যতই মানুষ ধনঅভিমুখী হচ্ছে, যতই মানুষ মোক্ষের উপায় রূপে ভণ্ডামিসুলভ নামকীর্তনকে ধারণ করছে, এবং নিজেদের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনাকে বরণ করতেই থাকছে, ততই মানুষ নিজের অস্তিত্বকে, নিজের যোনির অস্তিত্বকে সঙ্কটের দ্বারে স্থাপন করছে, এর অধিক কিছুই নয়।

হ্যাঁ, মানুষ যাতে নিজের যোনিকে রক্ষা করতে পারে, তার উপায় আমি কৃতান্ত ও কৃতান্তিকাতে ব্যক্ত করে, তোমার কাছে অর্পণ করলাম তা। যদি মানুষ এই সত্যকে ধারণ করতে পারে, সাধন করতে পারে এই সত্যকে, তবে মানুষ নিজের যোনিকে দীর্ঘায়ু করতে সক্ষম হবে, নাহলে, মানুষ যোনির আয়ু আর ১ হাজার বৎসরও নেই"।

সাধন সত্য

দিব্যশ্রী গদগদ হয়ে বললেন, "অন্তিম একটি প্রশ্ন মা। আমি সাধনের ভেদ জানতে চাই। কেন সেই সাধকদের কিচ্ছু হয়না, যারা ৩০ বৎসর, ৫০ বৎসর ধরে গুহাবাসী হয়ে তপস্যায় রত! কি করা আবশ্যক, আর কি ভাবে সাধনা হয় মা? আমি তা জানতে চাই? আমার মনে হয়ে, এর গুহ্য রহস্য আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। তাই এই ব্যপারে আমার ধারণাকে প্রশস্ত করো মা"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, আমাদের আত্মের তিনটি অবস্থা হয়, একটি আসক্তি, একটি বিরক্তি এবং একটি বৈরাগ্য। সাধারণ সংসারী মানুষ আসক্তিময় জীবনে রত থাকেন, তাই

তাঁদের দ্বারা সাধন হয়না। গুহাবাসীরা বিরক্তির মধ্যে নিজেদের স্থাপিত রাখেন, তাই তাঁদেরও সাধন হয়না। আর যারা বৈরাগী, তারাই সদাশিক্ষার্থী, আর সাধন তাদের দ্বারাই সম্ভব হয়।

পুত্রী, প্রথম অবস্থায় আমরা কি করি? যা কিছু আমাদের আমিত্বের সাথে সংযুক্ত, তাই দেখি আমরা, তাই শুনি, আর তাই স্মরণ রাখি। যেমন দেখো, একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে তুমি গেলে। সেখানে অনেক কিছুই দর্শনিয় ছিল, অনেক কিছুই শ্রবণীয় ছিল, কিন্তু তুমি কি কি শুনলে? কি কি দেখলে? যা যা, তোমাকে সম্মান করার জন্য বলা হলো, তোমাকে তিরস্কার করার জন্য বলা হলো, তোমার পছন্দের মানুষের সম্মানে বা অসম্মানে বলা হলো, তোমার অপছন্দের মানুষের সম্মানে বা অসাম্মানে বলা হলো, তাই তুমি দেখলে আর শুনলে।

যা তোমার কামনাকে, মদকে, অহমকে আকর্ষণ করার জন্য সম্মুখে দর্শনিয় বা শ্রবণীয় হলো, তুমি তাই তাই দেখলে, শুনলে, এবং স্মরণ রাখলে। আর অন্য সমস্ত কিছু, অর্থাৎ যা কিছুর সাথে তোমার অহমের কনো সম্পর্কই নেই, তোমার সম্মুখে হয়ে চলা সেই সমস্ত কিছুকে না দেখলে, না শুনলে আর না স্মরণ রাখলে।

এর ফলে কি হলো? তুমি তোমার অহমকে নিয়েই ব্যস্ত রইলে। সম্মান এলে মদাচ্ছন হলে, কটু সত্য সম্মুখে এলে লজ্জান্বিত হলে, অসত্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত হলে, অসম্মানিত হলে দ্বেষ ও শঙ্কায় আচ্ছন্ন হলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই হলো সাধারণ মানুষের ভাব পুত্রী। আর এই ভাবের কারণ হলো অহমচিন্তা। অহম অর্থাৎ আত্ম অর্থাৎ আমি'র চিন্তা। আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার বেদনা, আমার আহ্লাদ, আমার সখ, আমার অপছন্দ, আমার অপমান, আমার নিন্দা, আমার প্রশংসা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অহম, অর্থাৎ আমিত্ব, অর্থাৎ আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যার সুখদুঃখই তা, যা প্রভাবিত করে আমাকে, এই বোধই হলো সাধারণ মানুষের বোধ। আর এই বোধের কারণে সর্বক্ষণ সাধারণ মানুষ নিজের অহমের অর্থাৎ আত্মের প্রতিষ্ঠার চিন্তা করে ফেরে। আর সেই কারণেই

অপমানকর কথাতে বা দৃশ্যতে, কি বলে মানুষ? আমার আত্মায় লেগেছে কথাটা! যতবড় মুখ না ততবড় কথা!

আর কি বলে? আত্মদংশনে মরে যাচ্ছি, অর্থাৎ? সেই দৃশ্য বা কথা, আমাদের আত্ম অর্থাৎ আমিত্বকে দংশন করছে, আঘাত করছে, অর্থাৎ? অর্থাৎ আমাদের প্রতিষ্ঠা চোট প্রাপ্ত হয়েছে। আর কি বলি আমরা? আমাদের আত্মা চেয়েছে, অর্থাৎ? অর্থাৎ সেই চাওয়া আমাদের আত্মার প্রতিষ্ঠাকে সম্মানিত করবে, আর তাই তার কামনা রেখেছে আমাদের আত্ম বা আত্মা।

এই হলো আসক্তির পর্ব পুত্রী, যেখানে আমরা যা কিছু করি, তাতে সর্বক্ষণ আত্মের প্রতিষ্ঠার প্রতি আমরা আসক্ত থাকি, আমার আত্ম যাতে সন্তুষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠিত থাকে, সম্মানিত থাকে, লোকপ্রিয় থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন যখন এই প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমাদের মধ্যে মোহ, মদ, কুল, শিলের জন্ম হয়। আবার যখন যখন এই প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা আমাদের সম্মুখে এসে যায়, তখন লোভ আসে, আর যেই যেই অন্য আত্মরা একই দিশায় চালিত, তাঁদের পতি আসে ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ, শঙ্কা আর চরম অবস্থায় হিংসা। আবার যখন প্রতিষ্ঠা লাভ অসম্ভব হয়ে যায়, তখন আসে হতাশা।

পুত্রী, এঁদের মধ্যেও তারতম্য থাকে। কেমন? যেমন একাক আত্মের প্রতিষ্ঠার ছেত্র একাক রকম হয়। অনেকের হয়, কেবল স্বয়ংকে নিয়ে, অর্থাৎ কেবলই রক্তমাংসের এ আমিকে নিয়েই তাঁর চিন্তা। আবার অন্য কারুর হয়, নিজের পরিবারকে নিয়ে চিন্তা, অর্থাৎ এঁর আমিত্ব কেবল নিজের রক্তমাংসের দেহ নয়, এঁর পরিবারও এঁর আমির মধ্যে এসে যায়। এখানেও ভেদ থাকে। পরিবারের মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তি থাকেন, যারা তাঁর আত্মের প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের আত্মেরই প্রতিষ্ঠা জ্ঞান করেন। এঁরাই হন তাঁর পরিবার।

অর্থাৎ যদি এক পিতার ৪ সন্তান থাকেন, এবং পত্নী থাকেন, আর এঁদের মধ্যে একটি সন্তান ও পত্নী তাঁদের পিতার কর্মকাণ্ডে তৃপ্ত নন, তখন সেই ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে পত্নীর আত্মিক প্রতিষ্ঠা আর সেই সন্তানের আত্মিক প্রতিষ্ঠা অবস্থান করেনা।

আবার কিছু আত্ম হন, যাদের আত্মের চৌহদ্দি আরো একটু বিস্তৃত হয়। এঁরা কিছু কিছু ব্যক্তিকে বা দলকে বেছে নেন, আর তাঁদের প্রতিষ্ঠাকেই নিজের আত্মিক প্রতিষ্ঠা জ্ঞান করেন। আবার অন্য ক্ষেত্রে, এই ব্যপ্তি একটু বড়ও হয়। তাঁরা পরিবারের সাথে সাথে বন্ধুমহলকেও এঁর সাথে সংযুক্ত রাখেন। আবার অনেকে এমনও হন যে পরিবারের স্থানে বন্ধুদের সম্মিলিত রাখেন, এই আত্মিক প্রতিষ্ঠার চৌহদ্দিতে।

কখনো কখনো, এটি সমাজ বা ক্লাব পর্যন্ত যায়, আবার কখনো কর্মক্ষেত্র পর্যন্তও যায়। আরো বৃহৎ অবস্থায়, রাজ্য বা সমুদায় পর্যন্ত ব্যপ্ত হয় এই চৌহদ্দি, অর্থাৎ রাজ্যের বা সমুদায়ের কারুর আত্মিক প্রতিষ্ঠা লাভ হলেই, ইনার আত্ম প্রতিষ্ঠিত হন। আর এর থেকে বৃহৎ ক্ষেত্রে, ইনার আত্ম দেশ বা যোনির ক্ষেত্রেও বিস্তারিত হতে পারে। পুত্রী, অন্য সমস্ত ক্ষেত্রের কথা তো নিশ্চয়ই বুঝে গেছ, কিন্তু এই শেষ দুই, অর্থাৎ জাতির উত্থান বা সমুদয়ের উত্থান, বা রাজ্যের কারুর উত্থান, বা যোনির কারুর উত্থানে নিজের প্রতিষ্ঠাকে চিহ্নিত করেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ দিতে পারো?”

দিব্যশ্রী বললেন, “মা, কবি সাহিত্যিকরা আছেন এই সমুদয়ের বা জাতির বা যোনির উত্থানের ক্ষেত্রে। ... কিন্তু মা, আমি একটি ব্যাপার বুঝতে পারছিনা, অবতারদেরও তো অহমিকা থাকে। কারুর ৯২ শতাংশ, তো কারুর ৭০ শতাংশ, আমার পিতা তো ব্যতিক্রমী, তাঁর কথা না বললামই না, কিন্তু যারা ব্যতিক্রম নন, তাঁদেরও তো অহংকার থাকে, প্রতিষ্ঠার চিন্তা থাকে, তাঁদের অহংকারের ব্যাপ্তি ঠিক কি?”

ব্রহ্মসনাতন বললেন, “ইনাদের কথাতে আমি এখনো আসিনি পুত্রী, প্রথম আমাকে বলো এই আসক্তদের মনোভাবের কথা কি জানলে?”

দিব্যশ্রী বললেন, “মা, এঁদের সম্মুখে যাই দর্শনিয় বা শ্রবণীয় আসুক, এঁরা তাই দেখে, তাই শোনে, যা এঁদের আত্মের প্রতিষ্ঠার সাথে সম্বন্ধনিয়, অর্থাৎ যা তাঁর আত্মের চিন্তা, ইচ্ছা বা কল্পনাকে হয় আঘাত করে, নয় বিস্তার করে, এঁরা তাই শ্রবণ করে, তাই দরশন করে, আর তাই

স্মরণ রাখে, কারণ এঁরা নিজেদের আত্মের প্রতি প্রবল ভাবে আসক্ত। ... আর বুঝলাম যে, এঁদের আত্মের বিভিন্ন প্রকার বিস্তার থাকে, কারুর হয় আত্মসর্বস্ব, তো কারুর কারুর আরো বিস্তৃত, কিন্তু বিস্তৃত যতই হোক, এমন কখনই নয় যে, তিনি আত্মসর্বস্ব নন, অর্থাৎ আত্মসর্বস্বের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে, আরো কিছু জিনিসের সংযোজন থাকে”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “বেশ পুত্রী, এবার আমি দ্বিতীয় প্রকার মানুষের কথা বলবো। এঁরা হলেন বিরক্ত। এঁরা কি করেন? এঁরা হয় গ্রন্থ নয় গুরু নয় এইরূপ কনো বাহ্যিক প্রভাবে এসে আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রতি বিরক্ত। কিন্তু অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি বিরক্তি তো তাঁর পূর্বেই ছিল, অর্থাৎ আত্ম প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কিছু দেখার থেকে সে সর্বক্ষণ বিরতই ছিল, এবার সে আত্ম প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেখতেও বিরক্ত।

সাধারণত গুরু বা গ্রন্থের প্রভাবে এমন হলেও, আরো একটি প্রভাবে এমন হয় ব্যক্তি, আর তো হলো বিফলতা। নিজ কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার প্রসারের প্রয়াসে, যখন ব্যক্তি বারংবার বিফল হতে থাকেন, তখন তিনি যা দেখতেন না, যা শুনতেন না, যা স্মরণ রাখতেন না, তা তো দেখলেনই না, শুনলেনই না, আর স্মরণও রাখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে, নিজের আত্ম সংক্রান্ত যা কিছু দেখতেন, যা কিছু শুনতেন, আর যা কিছু স্মরণ রাখতেন, এবার তাও রাখা বন্ধ করে দেন, বিরক্তির প্রভাবে।

তবে কি করেন তিনি! তিনি যেই কারণেই হোক, তা নিজের অসুস্থতার কারণেই হোক, বা কারুর তিরস্কারের কারণেই হোক, আর যেই কারণেই হোক, নিজের কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছাকে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই কল্পনা চিন্তা ও ইচ্ছাকে স্থাপন করার জন্য উদ্ভ্রান্তের মত আচরণ শুরু করেন। ইনি ভাবতে থাকেন, ইনার আমিত্বের নাশ হয়ে গেছে, কিন্তু ইনার আমিত্ব পূর্বের থেকেও ভয়ানক হয়ে গেছে।

পূর্বের আমিত্ব বা অহংকারে, সে যত অধঃপতনেই যাক না কেন, আমি কখনো তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই না, বরং যাতে তাঁরা আনন্দ পাচ্ছে, তাই দেখতে থাকি, আর শিশুর ক্রিয়া

জেনে হাসি। কিন্তু এই বিরক্তদের থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হই, কারণ এঁরা হট ধারণ করে অবস্থান করে। এঁরা অত্যন্ত একগুয়ে হয়ে, আর অজ্ঞানতাকে আধার করে জেদ ধারণ করে থাকে, তাই আমি এঁদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিই।

সংসারে থাকলেও, এঁরা এঁদের এই একগুয়ে মানসিকতার কারণেই সকলের থেকে নিজেদের আলাদা করে নেন, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এঁরা সংসারের বাকি মানুষ, যারা আসক্ত, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ধারণ করে, সংসার ত্যাগ করে, গুহাবাসী হয়ে যান। কিন্তু একটি জাতি আছে, যেই সম্পূর্ণ জাতিটিই এমন, বলতে পারো, তার নাম কি?”

দিব্যশ্রী খানিক চিন্তা করে বললেন, “সঠিক কিনা জানিনা, তবে ব্যাখ্যা শুনে মনে হচ্ছে যেন আর্য। এঁরা একই মনোভাব নিয়ে নিজেদের বাসস্থান অর্থাৎ পশ্চিম গান্ধার ছেড়ে এখানে এসে সিন্ধুতীরে অবস্থান করে, সেই নিজের জেদকে স্থাপন করারই প্রয়াস করে গেছে, আর তা করার জন্য শতপ্রকার ছলনাকেও গ্রহণ করেছে, আর মনে মনে নিজেদের এই অজ্ঞানতা পূর্ণ, বাচালের ন্যায় কর্মপ্রয়াসকে নিজেরাই কুর্ণিশ করে করে, নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে গেছে”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “হ্যাঁ, সঠিক বলেছ পুত্রী, আর এই কারণেই আমি এঁদের থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছি।.... এঁরা না তো বাহ্যসত্যকে দেখে, শোনে আর না নিজের ব্যাপারে সত্যকে জানে, কেবল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেকোনো প্রকার ছল করতে থাকে এঁরা, নয়তো একস্থানে জেদ ধরে বসে থাকে। আর এঁদের স্বভাব হলো, এঁরা যা কিছু করে, সেই কাজকেই সঠিক বলে মানতে থাকে, বিনা পরামর্শে, বিনা বিচারে এবং বিনা মার্গদর্শনে।

পুত্রী, তুমি প্রশ্ন করলেনা, কেন গুহাবাসীদের বছরে পর বছর চলে যায়, তাও কিছু হয়না, কারণ হলো এই অন্ধত্ব। এঁরা পূর্বে যেমন কনো কিছু দেখতেন না, তেমন দেখেন তো না-ই, উপরন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য যেই লম্ফঝম্প আগে করতেন, তাও করেন না। তাই এঁদের কনো প্রকার উন্নতি হতে পারেনা।

আর এই সমস্ত কিছুর শেষে আসে তাঁরা যারা বৈরাগী। বৈরাগী মানে কি? আর্যরা এঁর বিকৃত অর্থ সমাজে স্থাপিত করে রেখে দিয়েছেন যে, বৈরাগ্য মানে বিরক্তি, কিন্তু এই কথন সম্পূর্ণ ভাবে ভিত্তিহীন ও অসত্য। বৈরাগী তিনি যিনি না তো কিছুর প্রতি আসক্ত আর না কিছুর প্রতি বিরক্ত। অর্থাৎ যিনি আসক্তি ও বিরক্তি, উভয়েরই ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, তিনিই হলেন বৈরাগী।

তুমি অবতারদের কথা বলছিলে না, ইনাদের অহম এই বৈরাগী হয়ে বিরাজ করে। এঁদের বিশেষত্ব কি? এঁরা নিজেদের আত্মের সাথে সংযুক্ত কনো কিছুর দিকে তাকায় না। কনো কিছু দৃশ্য, কথা ইত্যাদি যদি আত্মের সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে যেই মুহূর্তে তাদেরকে আত্মের সাথে সংযুক্ত বলে তাদেরকে চিহ্নিত করে, সেই মুহূর্তে সেই দৃশ্য দেখা থেকে, বা সেই কথা শ্রবণ করা থেকে প্রতিহত হন ইনারা, আর সেই কথন বা দৃশ্যকে নিজেদের স্মৃতিপটে স্থাপিতও হতে দেন না।

অন্যদিকে, আত্মসম্বন্ধনিয় যা কিছু নয়, অর্থাৎ প্রকৃতি তাঁদের সম্মুখে যা কিছু আনেন, তাকে তাঁরা দেখেনও, শোনেনও আর স্মরণও রাখেন। আর এর ফলে কি হয়? এর ফলে, এঁদের কাছে প্রকৃতি তাঁদেরকে যা কিছু শিক্ষা দেন, জীবন সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে, বা ঈশ্বর সম্বন্ধে, এঁরা তাই শেখেন, আর কারুর শেখানো বুলি পাঠ করে, তাকেই সত্য বলে মানেন না, আবার কারুর কথাকে অবমাননাও করেন না, বিনা বিচার করে।

এই তৃতীয় ভাবের কারণে, অবতাররা ও সেই ধারার সাধকরা সম্যক শিক্ষাও গ্রহণ করেন, আর সংসার ত্যাগীও হননা। এঁরা কারুর প্রতি বিরক্ত নন, আবার কারুর প্রতি আসক্তও নন। এঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য কিছু করেন যে, তা নয়। যেহেতু এঁদের অহম ৯২ থেকে ৭০ শতাংশ অবশিষ্ট থাকে, আর আমিও তাঁদের অন্দরে ৮ থেকে ৩২ কলা ধারণ করে অবস্থান করি, তার কারণে এঁরা প্রতিষ্ঠা পান, অর্থাৎ আমার থেকে শিক্ষা লাভ করেন, আর সেই শিক্ষাকে নিজের অহম দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আর আমাকে লাভ করেন কি ভাবে? সর্বক্ষণ নিজের অহম থেকে নিজের মনকে অপসারিত করে, সর্বক্ষণ আমি প্রকৃতি, সময় বা পরিস্থিতি অর্থাৎ নিয়তিবেশে যা কিছু সম্মুখে নিয়ে আসি এঁদের, তাকে বিনা আসক্তি ও বিনা বিরক্তি দ্বারা শিক্ষার্থীর নজর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এঁরা। আর সেই শিক্ষাই যে যথার্থ শিক্ষা। তাই তাঁরা আমাকে ধারণ কর্তে সক্ষম হন।

পুত্রী, পুস্তকের সামর্থ্য নেই সত্যকে ধারণ করে বা ব্যাখ্যা করে, কনো বচনেরও সেই সামর্থ্য নেই। সেই সামর্থ্য কেবল ও কেবল আমার আছে, কারণ আমি স্বয়ং জ্ঞান। আর তাই আমার কারণ রূপ প্রকাশ, অর্থাৎ নিয়তি বা যাকে তোমরা বলে থাকো পরিস্থিতি, সূক্ষ্ম প্রকাশ অর্থাৎ সময়ের নিয়ন্তা অর্থাৎ মহাকালী, এবং স্থূল প্রকাশ অর্থাৎ প্রকৃতিই যথার্থ জ্ঞান প্রদান করে।

যিনি, নিজের অহমের প্রতিষ্ঠা চিন্তা থেকে জাত ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার থেকে মুখ সরিয়ে, আমার এই তিনরূপের দিকে তাকায় ও সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী হয়ে ওঠেন, আর তিনিই আমার সম্পূর্ণ প্রকাশসম্ভব ৯৬ কলার মধ্যে, ৮ থেকে ৩২ কলাকে ধারণ করতে সক্ষম হন, এবং যথার্থ ভাবে সাধক হয়ে মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম।

পুত্রী, যে যতই নামজপ করুক, যে যতই মনঃসংযোগ করুক, যে যতই গ্রন্থ পাঠ করুক, যে আমার থেকে জ্ঞান লাভ করেনা, সে কখনই জ্ঞান লাভ করতে পারেনা, কারণ জ্ঞান আমার থেকে ছাড়া কারুর থেকে লাভ করা সম্ভবই নয়। আর আমার থেকে জ্ঞান ধারণ করার জন্য আমি কখনো কখনো অবতাররূপ ধারণ করে থাকি, কখনো কখনো মিরা, রামপ্রসাদ, আনন্দময়ী, সারদার মত সাধকের অন্তরে কলাবেশে থাকি, আর যখন এই অবস্থাতেও থাকিনা, তখনও সর্বক্ষণ থাকি, প্রকৃতি বেশে, সময়ের চালকের রূপে, আর পরিস্থিতি অর্থাৎ নিয়তি রূপে।

যিনি আমার এই সমস্ত রূপ ত্যাগ করে, গন্থে আমাকে খুঁজতে যায়, নামে আমাকে খুঁজতে যায়, ধামে আমাকে খুঁজতে যায়, গুহায় বসে নিজের অহমের মধ্যে আমাকে খুঁজতে চায়, যেই সাধক আমার কনো কলা লাভ করেন নি, তাঁর বচনে আমাকে খুঁজতে যায়, সে কখনোই আমাকে লাভ

করেনা, কখনোই সত্য লাভ করেনা, কখনোই সত্যজ্ঞান লাভ করেনা, আর কখনোই মোক্ষ লাভ করেনা।

পুত্রী, প্রতিটি অবতারকেই দেখবে তাঁদের কথনে অজস্র উদাহরণ দেন প্রকৃতির, সময়ের ও নিয়তির। কেন এমন করেন? কারণ যখন তাঁরা দেহধারণ করে থাকবেন না, তখন এই তিনই তাঁদেরকে শিক্ষা প্রদান করবেন। সকল অবতার সঙ্গীতের সুরের সাধন করান, কেন? কারণ এই সুরকলা যে আমারই প্রকাশ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, প্রকৃতিকে ভারসাম্যে রেখে পরিস্থিতিকে প্রবাহিত হতে দেওয়াই হলো সঙ্গীত। তাই সঙ্গীতের সুরেই আমার প্রবাহ, সঙ্গীতের শব্দে নয়, শুধুই সুরে।

যিনি এই সমস্ত যথার্থ শিক্ষালাভের স্থান থেকে বিরক্তিসুলভ ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন, তিনি যতই গ্রন্থপাঠ করুন না কেন, যতই মনঃসংযোগ করুন না কেন, যতই নামজপ করুন না কেন, যতই কীর্তনাদিতে নাচানাচি করুন না কেন, আর যতই এইসমস্ত করে, 'আমি', 'আমি' করুক না কেন, কনোকিছুতে কনো ফল লাভ হয়না।

আর অন্যদিকে যিনি এই তিন উপায়-এর দিকে সদা দৃষ্টি রাখেন, এবং প্রকৃতি, নিয়তি তথা সময়ের থেকে সর্বক্ষণ শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছেন, তাঁর এই একাগ্রতাপূর্ণ শিক্ষাগ্রহণের ভাবই বিবেকের জন্ম দেয়, আর বিবেকের জননী আমি, তাই বিবেকের সাথে সাথে আমিও চেতনারূপে তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হতে বাধ্য। আর যেখানে আমার অবস্থান অর্থাৎ যার হৃদয়ে চেতনার ভাবাবেগ ঘটেগেছে, তাঁর তো কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার হাতে হাতকড়া পরে গেছে, কারণ তাঁরা কিছুতেই আমার সম্মুখে আসবে না, আসলেই যে বিচার বিবেক তাঁদের পর্দা ভেদ করে দেবে, আর আমার সম্মুখে পরলেই, সম্পূর্ণ ভাবে ভস্ম হয়ে যাবে তারা।

তাই পুত্রী, যথার্থ সাধক হবার জন্য, নামজপ, কীর্তন, গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি সমস্ত উৎসেচক হলেও, এরা একাকী কিছুই করতে পারেনা, যতক্ষণ না অহমের প্রতিষ্ঠা চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, প্রকৃতি, সময় ও পরিস্থিতি বা নিয়তির থেকে শিক্ষালাভ নিয়ে তার বিচার করা হচ্ছে। তোমার

ছাত্রছাত্রীদেরও যখন সাধনার সাথে পরিচিত করবে, তখন এই সত্যকে স্মরণ রাখবে। দেখবে, একাধিক সাধকের নির্মাণ হবে, আর এও দেখবে যে, এই সত্য সমাজে সাধনসত্য রূপে স্থাপিত করতে পারলে, আমার আর অবতারগ্রহণের প্রয়োজনই পরবে না, কারণ এমনি এমনিই সাধকও নির্মিত হবে, আর এমনি এমনি মোক্ষলাভও হতে থাকবে”।

~সমাপ্ত~

কৃতান্তিকী